১৯৭০ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার-জয়ী

মহান্ জীবনী-গ্রন্থ

BHARATER SADHAK (Vol XII)

By

Sankar Nath Roy.

Rs. 10·00
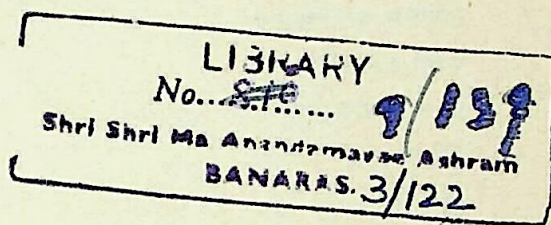
ভারতের সাধক

(১২শ খণ্ড)

শঙ্করনাথ রায়
(প্র. না. ভ)

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

বন্ধুবর ৺হেরম্ব মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

—শঙ্করনাথ
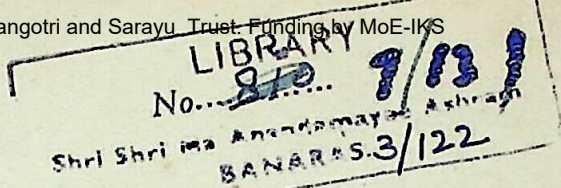
প্রকাশকের নিবেদন

বহুলখ্যাত ভারতের সাধকের দ্বাদশ খণ্ড প্রকাশিত হল। এই মহান্ গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলো বাংলার বিশিষ্ট সমালোচক ও সংবাদপত্রের অভিনন্দন বহুপূর্বেই লাভ করেছে। পাঠক সাধারণও জ্ঞাপন করেছেন তাঁদের আন্তরিক সমর্থন।

সর্বোপরি ১৩৭০ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার-জয়ী হয়ে এই জীবনী-গ্রন্থ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে গণ্য হয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের সাধক-এর হিন্দী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এবং হিন্দী সাহিত্যরসিকেরা এ গ্রন্থকে জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সাধুবাদ ও সংবর্ধনা। বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত আর কোনো বাংলা গ্রন্থ সমকালীন বাংলায় বা বহির্বাংলায় এতটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পেরেছে বলে আমরা জানিনে।

হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাণরস যুগিয়ে আসছেন আমাদের সাধকেরা—অধ্যাত্মজীবনের মহান্ শিল্পীরা। এঁদের ভেতর রয়েছেন যোগী, বেদান্তী, তান্ত্রিক ও মরমীয়া সাধক-গোষ্ঠী। বিচিত্র সাধনা ও বিচিত্র মতবাদের ভেতর দিয়ে তাঁরা গড়ে তুলেছেন শাশ্বত মানবধর্মের ঐকতান। এই সাধকদেরই প্রামাণ্য ও পরম রম্য জীবনী রচনা করেছেন গ্রন্থকার, আর সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন ভারত-সাধনার প্রকৃত পরিচয়। বলা বাহুল্য, এই পরিচয়েরই ভেতর নিহিত রয়েছে ভারতবাসীর সত্যকার আত্ম-পরিচয়।

সাধন-অনুভূতি ও আত্মিক বিশ্লেষণ যেমন লেখকের এই রচনাগুলিতে রয়েছে, তেমনি রয়েছে মনীষা ও সাহিত্যিক প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। ফলে প্রত্যেকটি জীবনী হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত, লোকোত্তর মহাপুরুষেরা ধরা দিয়েছেন আমাদের মতো সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে। 'ভারতের সাধক' তাই হয়ে উঠেছে এমন অনন্যসাধারণ, আর বাংলা সাহিত্যে অধিকার করেছে এক চিরস্থায়ী আসন।

এই কল্যাণকর মহান্ গ্রন্থের প্রকাশনার সুযোগ পেয়ে আমরা গৌরব বোধ করছি, এবং নিজেদের ধন্য মনে করছি।

—প্রকাশক

সূচীপত্র

পরম ভাগবত বেঙ্কটনাথ

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জির লুব্ধ দৃষ্টি এ সময়ে পতিত হইয়াছে দক্ষিণ ভারতের দিকে। এ অঞ্চল জয়ের জন্য বিরাট বাহিনীসহ তিনি প্রেরণ করিয়াছেন মালেক কাফুরকে। তীব্র রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর খল্‌জি সেনাপতি এক একটি হিন্দু রাজ্য ছিনাইয়া নিতেছেন আর ছড়াইতেছেন অগ্নিদাহ, হত্যা, লুণ্ঠন আর হিন্দু-মন্দির ধ্বংসের বিভীষিকা।

মালেক কাফুর সে-বার প্রবল বিক্রমে মাদুরার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিয়াছেন। পথেই পড়ে বহুলখ্যাত শ্রীরঙ্গমের প্রাচীন বিষ্ণু-মন্দির। ঐতিহ্য, মর্যাদা ও ধনগৌরবে সারা দাক্ষিণাত্যে এ মন্দিরের জুড়ি নাই। এমন একটি মন্দির লুণ্ঠনের সুযোগ কাফুর ছাড়িতে রাজী নন, তাই দুর্ধর্ষ সমর বাহিনীকে চালিত করিয়াছেন সেই দিকে। কাবেরীর অপর তীরে, রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া ছাউনি ফেলিয়াছে খল্‌জি বাহিনী। এবার যে কোনো মুহূর্তে তাহারা ঝাঁপাইয়া পড়িবে এই তীর্থনগরের উপর।

কৃষ্ণপক্ষের নিশীথ রাত্রি। ঘন অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। শ্রীমন্দিরে, বাজারে বা পথঘাটে দীপ নির্বাপিত, সর্বত্র বিরাজিত একটা থমথমে ভাব। আতঙ্কে অনেকেই নগর ছাড়িয়া নিরাপদ আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছে। যাহারা আছে, তাহারাও আসন্ন আক্রমণের ভয়ে মুহ্যমান।

নগররক্ষী রাজসেনার সংখ্যা অল্প। এই প্রবল শত্রুর প্রতিরোধ করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব। সংঘর্ষ শুরু হইলেই ঝড়ের মুখে শুষ্ক তৃণের মতো তাহারা কোথায় উড়িয়া যাইবে। তারপরই যথারীতি শুরু হইবে খল্‌জি সেনার নারকীয় তাণ্ডব।

এই সংকটের রাতে একান্তে আপন কুটিরে বসিয়া বৃদ্ধ আচার্য

সুদর্শন ভট্ট একরাশ তালপত্রের পুঁথি গুছাইতে ব্যস্ত। সতর্ক হস্তে এগুলি তিনি ডোরবদ্ধ করিলেন, থরে থরে সাজাইয়া রাখিলেন একটি ঝুলির মধ্যে।

হঠাৎ কুটিরের দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল। আচার্য যেন ইহারই অপেক্ষা এতক্ষণ করিতেছিলেন। ত্রস্তপদে উঠিয়া দরজা খুলিলেন, কহিলেন, "এসো বেঙ্কটনাথ। তোমার প্রতীক্ষায়ই আমি বসে আছি।"

আগন্তুকের বয়স চল্লিশের কিছুটা উর্ধ্বে। দৃঢ় সমুন্নত দেহ, চোখে মুখে অপূর্ব প্রতিভার দীপ্তি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক চিহ্ন, গলায় পবিত্র তুলসীর মালা, দেখিলেই মনে হয়—ভক্তিসাধনায় উৎসর্গীত প্রাণ এক নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব।

বৃদ্ধ আচার্যের চরণে প্রণত হইয়া তিনি কহিলেন, "আমায় স্মরণ করেছেন। কি আদেশ বলুন ?"

"বৎস, তোমাকে আজ আমার বড় প্রয়োজন। স্থির হয়ে আসনে ব'সো, বলছি।"

প্রদীপের আলো স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, সলতেটি বাড়াইয়া দিয়া আচার্য বেঙ্কটনাথকে কাছে ডাকিলেন। নিম্নস্বরে কহিলেন, "এখানকার পরিস্থিতি তো সব দেখছো। ইতিহাসে এমনতর দুর্দৈব আর কখনো আসে নি। খল্‌জি সেনা নদীর ওপারে ঘাঁটি স্থাপন করেছে, যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে এই নগরের ওপর।"

"যে কোনো উপায়ে এ নরপশুদের প্রতিরোধ করতে হবে। রক্ষা করতে হবে শ্রীবিগ্রহকে," দৃঢ় স্বরে বলেন বেঙ্কটনাথ।

"প্রভু রঙ্গনাথজীর জন্য ভাবনা নেই। তাঁর বিগ্রহ ইতিমধ্যেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সুলতানের সেনারা এবার মন্দির ও তীর্থনগর বিধ্বস্ত করবে, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবে হাজার হাজার নিরীহ নরনারীকে। আলাউদ্দীন খল্‌জি খল ও নৃশংস। তার সেনাপতি মালেক কাফুর ততোধিক। মাদুরা অধিকারের জন্য বিরাট সেনাদল নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে, সেই সেনাবাহিনীকে

প্রতিরোধ কে করবে? পাণ্ড্যরাজারা নিজেরা গৃহযুদ্ধে দুর্বল, তাছাড়া, এ নগর রক্ষার জন্য খুব কম সংখ্যক রক্ষী তাঁরা রেখেছেন। এ অবস্থায় খল্‌জি সেনার দুর্বার গতিরোধ করা যাবে না।"

"প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের এই লাঞ্ছনা অপমান, তাঁর ভক্তদের ওপর এই নির্মম অত্যাচার চলবেই? এর কোনো প্রতিবিধান নেই? তবে কি অর্চাবতার রঙ্গনাথজীর এতকালের পূজা অর্চনা সব নিষ্ফল?" উষ্মা ও ক্ষোভ ফুটে উঠে বেঙ্কটনাথের কথায়।

"তুমি শাস্ত্রবিৎ, নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ভক্ত। তোমার এ ক্ষোভ সাজে না বেঙ্কটনাথ। পুরাণ শাস্ত্রে কি দেখতে পাও? বার বার দেবতারা স্বর্গচ্যুত হয়েছেন দানবদের দ্বারা। অবতার পুরুষ শ্রীরামকে সীতা হরণের অপমান সইতে হয়েছে, রাক্ষসদের সঙ্গে যুঝতে গিয়ে কতবার বিপন্ন হতে হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকেও শিশুপাল জরাসন্ধের হাতে কম লাঞ্ছনা সইতে হয় নি। ঈশ্বরের লীলায়, তাঁর মায়ার খেলায়, ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান পতন তো থাকবেই, বৎস।"

"এখন আমাদের কর্তব্য কি তাই বলুন।" ব্যগ্রস্বরে নিবেদন করেন বেঙ্কটনাথ।"

"সব বলছি, মন দিয়ে শোন। তার আগে জানতে চাই তোমার স্ত্রীপুত্রেরা এখন কোথায়?"

"তারা কিছুদিনের জন্য তীর্থদর্শনে বেরিয়ে গেছে।"

"অতি উত্তম কথা। শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। শোন এবার। শত্রুসেনা আজ শেষ রাত্রেই নদী পেরিয়ে আক্রমণ করবে, নৃশংস অত্যাচার শুরু হবে। তার আগে তুমি এ নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হও। তোমায় তিনটি গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে, বেঙ্কটনাথ।"

"আপনার আজ্ঞা সতত শিরোধার্য।"

"তা আমি জানি, বৎস। তোমার বাল্যকাল থেকে আমি তোমায় চিনি। আমার গুরু বরদাচার্যের টোলে যখন আমি যেতাম, তখন তুমি বালক মাত্র, সেই টোলে বসে খেলা করতে। কিন্তু তোমার অমানুষী প্রতিভা ও ভবিষ্যৎ জীবনের মহতী সম্ভাবনা আমার আচার্য-

দেব এবং আমাদের দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। অসামান্য শাস্ত্রবিৎ ও সাধকরূপে ইতিমধ্যে তুমি গড়ে উঠেছ, অর্জন করেছো শ্রীরঙ্গমের ভক্ত ও বুধমণ্ডলীর প্রশংসা। আমার প্রথম নির্দেশ, তুমি অবিলম্বে অন্যত্র চলে যাও। তোমার মূল্যবান প্রাণ রক্ষা করো। দেশের ভক্ত-সমাজ, বিশেষ ক'রে রামানুজ সম্প্রদায় ভবিষ্যতে তোমার সেবায় অশেষভাবে উপকৃত হবে।"

"কিন্তু আচার্যবর, আপনিও তো যাচ্ছেন আমার সঙ্গে ?"

"না বেঙ্কটনাথ, আমি শ্রীধাম ত্যাগ করছিনে। প্রভু রঙ্গনাথের সেবায় একদল ভক্তকে যেমন প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, তেমনি আর একদলকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। ভক্তের মৃত্যুবরণ প্রভুর আসনকে টলিয়ে দেয়, আর ভক্তের কাতর প্রার্থনা ধর্মসংস্থাপনের জন্য তাঁকে করে উদ্দীপিত। দুয়েরই প্রয়োজন আছে, বৎস। প্রাণদানের জন্য আমি সংকল্প গ্রহণ করেছি, সে সংকল্প আর ত্যাগ করার উপায় নেই।"

বৃদ্ধ আচার্যের আনন দিব্যভাবের ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আয়ত নয়ন দুটি অর্ধ নিমীলিত। একদৃষ্টে তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বেঙ্কটনাথ কহিলেন, "আচার্যবর, এখনো সময় আছে, এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর একবার আপনি চিন্তা করুন।"

"শোন বৎস, বৃথা বাক্য ব্যয় করে একটি মুহূর্ত নষ্ট ক'রো না। আমার প্রথম নির্দেশটি তোমায় জানিয়েছি, শ্রীরঙ্গম ত্যাগ ক'রে নিজের প্রাণ রক্ষা করো, নিজেকে নিয়োজিত করো প্রভুর নির্ধারিত সেবাকার্যে। আমার দ্বিতীয় নির্দেশ, আমার রচিত 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপি রয়েছে এই ঝুলিতে। আমার গুরু বরদাচার্যের শ্রীমুখ থেকে প্রভু রামানুজের শ্রীভাষ্যের যে তাৎপর্য শুনেছি, তা থেকেই রচনা করেছি এই টীকা। ভক্তসমাজের কল্যাণের জন্য এটি রক্ষা করা প্রয়োজন।"

"এ গ্রন্থের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি।"

"উত্তম বৎস। আমার তৃতীয় নির্দেশ, তুমি আমার বালক পুত্র দুটিরও ভার নাও। ওরা মাতৃহীন, আমার অবর্তমানে আর কেউ

নেই ওদের দেখবার। পাশের ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে, জানে না যে শিয়রে ওদের শমন দণ্ডায়মান। তুমি আর বিলম্ব ক'রো না, এই টীকা গ্রন্থ ও বালক দুটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।"

শাস্ত্রগ্রন্থের ঝুলি এবং বালক দুটিকে সঙ্গে নিয়া বেঙ্কটনাথ বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রণামান্তে আচার্যকে প্রশ্ন করিলেন, "অর্চাবতার প্রভু রঙ্গনাথজীর প্রিয় তীর্থের এই দুর্ভোগ আর কতদিন চলবে?"

প্রশান্ত কণ্ঠে আচার্য উত্তর দিলেন, "প্রভুর কৃপায় আমি জানতে পেরেছি, বৎস, প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল এ অঞ্চল অত্যাচারী বিধর্মীর কবলে থাকবে, তারপর হবে মুক্তির অরুণোদয়। তোমরা, ভক্ত সাধক ও শাস্ত্রবিদ্ যারা বেঁচে রইলে, তাঁদের নিত্যকার কাজ হবে প্রভুর কাছে সেই মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা।"

ত্রস্তপদে নিঃশব্দে দীর্ঘ অন্ধকারময় পথ চলিয়া কাবেরীর তীরে আসিয়া দাঁড়ান বেঙ্কটনাথ। এক হাতে গ্রন্থের ঝুলি, আর এক হাতে বেষ্টন করিয়া আছেন বালক দুটিকে।

বালুকা সৈকতের সম্মুখেই পারঘাট। ঘাটে পৌঁছিয়াই বেঙ্কটনাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। শত শত মৃতদেহ আশে পাশে ছড়ানো। তীর্থনগরের রক্ষী বাহিনীর একাংশ খল্জি সেনার প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত ও হতাহত।

ঘাটে পারাপারের নৌকা একটিও নাই, সবগুলিই ওপারের দিকে রওনা হইয়াছে। বেঙ্কটনাথ বুঝিলেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ। মালেক কাফুরের সেনার অগ্রাংশ নগররক্ষীদের প্রাথমিক প্রতিরোধ বিধ্বস্ত করিয়া নিঃশব্দে মন্দির বেষ্টন করার জন্য ধাবিত হইয়াছে। আর ঘাটের নৌকাগুলি ওপারে গিয়াছে মূল সেনাবাহিনীকে আনয়নের জন্য।

বালক দুটিকে নিয়া ওপারে পৌঁছিবার কোনো উপায় নাই। নগরে ফিরিয়া গেলেও মৃত্যু অবধারিত। এখন কি করা যায়?

হঠাৎ বেঙ্কটনাথের মাথায় এক চিন্তা খেলিয়া গেল। সংকট হইতে উদ্ধারের এক উপায় তিনি উদ্‌ভাবন করিলেন। হ্যাঁ, চাতুর্যের আশ্রয় ছাড়া বাঁচিবার কোনো পন্থা নাই।

ক্ষিপ্রহস্তে রক্ষীদের মৃতদেহগুলি টানিয়া আনিয়া সেগুলি তিনি স্তূপীকৃত করিলেন। বালকদের কহিলেন, "ভয় পেয়ো না। আজ আমরা একটা নূতন লুকোচুরি খেলা খেলবো। নিহতদের স্তূপের ভেতর এসো আমরা সবাই ঢুকে পড়ি, মৃতের মতোই নিঃসাড়ে পড়ে থাকি। ওপার থেকে আগত খল্‌জি সেনারা সবাই যখন মন্দিরের দিকে চলে যাবে, তখন আমরা চট্‌পট্‌ উঠে পড়বো। ওপারে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবো।"

তাড়াতাড়ি সবাই মৃতের স্তূপের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মূল খল্‌জি বাহিনী এপারে আসিয়া উপস্থিত। তাচ্ছিল্যভরে মৃত শত্রুদের দিকে তাকাইয়া মন্দির আক্রমণের জন্যে সোল্লাসে তাহারা ধাবিত হইল।

ঘাট নীরব নির্জন হইলে বেঙ্কটনাথ বালকদের নিয়া বাহিরে আসিলেন। নৌকাযোগে কাবেরী পার হইয়া প্রবেশ করিলেন গহন অরণ্যে। অতিকষ্টে ক্রমাগত কয়েক দিন পথ চলার পর মহীশূর অঞ্চলে হিন্দু রাজ্যে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলেন, শুরু করিলেন নূতনতর সারস্বত জীবন, সাধনাময় জীবন।

পাণ্ডিত্য ও সাধনার, অমানুষী প্রতিভা ও পরাভক্তির যে বীজ রোপিত হইয়াছিল শ্রীরঙ্গমের নবীন পণ্ডিত বেঙ্কটনাথের আধারে অচিরে তাহা পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া ওঠে।

সমকালীন ভক্তি আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ধারক বাহকরূপে, রামানুজ সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে কীর্তিত হন বেঙ্কটনাথ।

ত্যাগ বৈরাগ্যময় ভক্তিসাধনা, কবিত্ব, দার্শনিকতা, এবং তর্ক-পারঙ্গমতার জন্য শুধু দাক্ষিণাত্যেই নয়, সারা ভারতে এ সময় তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে, বেদান্তদেশিক নামে সর্বত্র তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন।

বেঙ্কটনাথের পিতার নাম অনন্তস্মূরী। ভক্তিমান্, সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। তখনকার দিনে দাক্ষিণাত্যের ধর্মজীবনের মর্মকেন্দ্র ছিল কাঞ্চী। শৈব ও বৈষ্ণব ভক্ত সাধক ও শাস্ত্রবিদ্ আচার্যদের পূজা অর্চনা ও তাত্ত্বিক বিতর্কে সদা মুখরিত থাকিত এই পুণ্যময়ী নগরী। অনন্তস্মূরী এখানকার পল্লীতে বাস করিতেন এবং কাঞ্চীর ভক্ত ও পণ্ডিত মহলে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আচার্য রামানুজ তাঁহার ভক্তিবাদ প্রচারের জন্য চুয়াত্তর জন আদর্শ বৈষ্ণব পণ্ডিতকে নিয়োজিত করেন, ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন অনন্তস্মূরীর পূর্বপুরুষ।

বেঙ্কটনাথের মাতা তোতারম্বার পিতৃগৃহেও ধর্মীয় ঐতিহ্য কম ছিল না। রামানুজের ঐ আদি প্রচারক গোষ্ঠীর অন্যতম আচার্যের বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি ছিলেন আদর্শ বৈষ্ণব সাধিকা আর তাঁহার ভ্রাতা রামানুজ অপ্পুলার ছিলেন সমকালীন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের অন্যতম।

এই ভক্তিপরায়ণ নৈষ্ঠিক পরিবারে বেঙ্কটনাথ ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

বালককাল হইতেই অত্যাশ্চর্য মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায় তাঁহার জীবনে। পুত্রের সারস্বত জীবনের সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া জনক জননী মহা আনন্দিত। অষ্টম বৎসর বয়সে উপনয়ন সংস্কারের পর মাতুল অপ্পুলার তাঁহাদের কাছে প্রস্তাব করেন, "বেঙ্কটনাথের শিক্ষার দায়িত্ব তোমরা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমার টোলের পড়ুয়াদের অনেকেই খ্যাতনামা ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ বলে গণ্য হয়েছে। বেঙ্কটনাথ দৈবী প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে, আমার টোলে পাঠ সমাপ্ত করলে কালে সেও এক প্রখ্যাত আচার্য হয়ে উঠবে।"

অনন্তস্মূরী নিজে বৈরাগ্যবান্ পণ্ডিত। তাই নিজের টোলকে বড় করার জন্য কোনোদিনই তিনি উৎসাহী হন নাই। গুটিকয়েক ছাত্র পড়াইয়া কোনোমতে তাঁহার সংসার চলে। ভাবিলেন, রামানুজ অপ্পুলার নিজে ভক্ত সাধক, তাছাড়া, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্যদের

মধ্যে তাঁহার খ্যাতি সুপ্রচারিত। তাঁহার টোলের ছাত্রেরা অনেকেই কৃতী পুরুষ। সেই টোলে নিজে যাচিয়া ভাগ্নেকে তিনি পড়াইতে চান, এ তো অতি উত্তম কথা।

স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া অপ্পুলারের প্রস্তাবে তিনি সায় দিলেন। মাতুলের প্রসিদ্ধ টোলেই শুরু হইল বেঙ্কটনাথের শাস্ত্র অধ্যয়ন।

কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল, কিশোর বেঙ্কটনাথ তাহার অমানুষী প্রতিভার বলে বেদ বেদান্ত, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যাবত্তাকেও সে হার মানাইয়াছে অনায়াসে।

রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট পণ্ডিত বরদাচার্য এ সময়ে মাঝে মাঝে কাঞ্চীতে আসিয়া বাস করিতেন। সঙ্গে থাকিত শিষ্যপ্রধান সুদর্শন ভট্ট ও অন্যান্য তীক্ষ্ণধী ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ শিষ্য। বরদাচার্যের আলোচনা সভায় কাঞ্চীর অন্যান্য বিদ্যার্থীদের সঙ্গে কিশোর বেঙ্কটনাথও এক একদিন উপস্থিত হইতেন। এই সময়কার আলোচনা ও বিতর্কে তাঁহাকে সোৎসাহে যোগ দিতে দেখা যাইত। তাঁহার প্রতিভার দীপ্তি ও তত্ত্বালোচনার পারদর্শিতা দেখিয়া বরদাচার্য বিস্মিত নয়নে চাহিয়া থাকিতেন।

এই কিশোর ভক্তিবাদী ছাত্রের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল, বরদাচার্যের তাহা বুঝিতে দেরি হয় নাই। একদিন শাস্ত্র বিতর্কের আসরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বেঙ্কটনাথের দিকে তাকাইয়া তিনি বলেন, "বৎস, আমি আশীর্বাদ করি উত্তর জীবনে তুমি বেদান্তের ভক্তিবাদী ব্যাখ্যায় সাফল্য অর্জন করো, প্রতিপক্ষকে করো পর্যুদস্ত। ধর্ম দেশ ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন ক'রে জীবন তোমার ধন্য হোক।"

প্রবীণ শিষ্য সুদর্শন ভট্টও সেদিন সেখানে উপস্থিত। আচার্যের এই আশিস্ যে অপাত্রে বর্ষিত হয় নাই এবং কিশোর বেঙ্কটনাথ যে একদিন দক্ষিণ ভারতের সারস্বত সমাজের অন্যতম স্তম্ভরূপে গণ্য হইবেন, এই বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে চিরদিন জাগরূক ছিল।

পরবর্তী জীবনে শ্রীরঙ্গমে তরুণ আচার্য বেঙ্কটনাথের সহিত

সুদর্শনের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে। বেঙ্কটনাথের জীবনে স্বীয় গুরুর আশিস্‌কে রূপায়িত হইতে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন, দিনের পর দিন তাঁহাকে কাছে টানিয়া নেন।

মুসলমান সেনা শ্রীরঙ্গম আক্রমণ করার প্রাক্‌কালে সুদর্শন ভট্ট তাঁহার এই বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ যুবক বন্ধুটিকে নিজের কুটিরে ডাকিয়া আনেন। তাঁহারই হাতে নিজের শ্রেষ্ঠ অবদান 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপি ও পুত্রদ্বয়কে সঁপিয়া দেন, নিশ্চিন্তে করেন মৃত্যু বরণ।

বেঙ্কটনাথ কাঞ্চীতে প্রায় বিশ বৎসর বাস করেন। এখন তিনি নবীন যুবা, এই বয়সেই নিজের অসাধারণ শক্তি বলে সর্ববিদ্যায় তিনি পারদর্শী হইয়া উঠেন। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাস্ত্র শিক্ষাদানের এক টোল খুলিয়া বসেন। অল্পকাল মধ্যে চারিদিক হইতে তাঁহার এই টোলে বিদ্যার্থীর সমাগম হইতে থাকে।

জননী তোতারম্বার আনন্দের আর অবধি নাই। নবীন অধ্যাপক-রূপে পুত্রের যশ তখন চারিদিকে। দলে দলে ছাত্র আসিয়া জুটিতেছে তাহার টোলে। অর্থাগমও বাড়িতেছে। এবার বেঙ্কটনাথের বিবাহ দিয়া একটি সুলক্ষণা বধূ ঘরে আনা দরকার।

প্রস্তাব শুনিয়াই পুত্র চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আমি আমার জীবনের লক্ষ্য স্থির ক'রে ফেলেছি, মা। প্রভু রামানুজের দার্শনিকতা ও বৈষ্ণবীয় সাধন আমি মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করেছি এবং তা রক্ষা করার জন্য জীবন সঁপে দেবো বলেও স্থির করেছি। কাজেই বিবাহ করার জন্য আমায় তুমি চাপ দিয়ো না।"

ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মা কহিলেন, "সে কিরে, রামানুজপন্থী কত আচার্যই তো দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁরা সবাই আদর্শ গৃহী, ঘরসংসার করে, শাস্ত্রচর্চা আর সাধন ভজন করতে তো তাঁদের বাধে নি। এ তুই কি সব বলছিস্।"

"নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের জীবন যাপন করতে চাই আমি, নইলে

শাস্ত্রচর্চা ও সাধনা কোনোটিতেই আমি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারবো না।" যুক্তি দেখান বেঙ্কটনাথ।

জননী উত্তেজিত হন, যুবক পুত্রকে নানাভাবে বুঝাইতে থাকেন। অবশেষে বলিয়া উঠেন, "তোর বাবা উন্নত বৈষ্ণব সাধকের জীবন যাপন ক'রে গিয়েছেন, টাকাকড়ি উপার্জন বা সঞ্চয়ে কোনোদিনই মন দেন নি। বেশ তো, বাবা, তুইও সেই পথেই চল্‌বি। ইচ্ছে হয়তো নৈষ্ঠিক অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণরূপেই তুই দিনাতিপাত করবি। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা তুই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ কর্‌। বংশ-ধারায় ছেদ পড়তে দিস্‌নে বাবা, দেখিস্‌ পিতৃপুরুষ যেন পিণ্ডজল পায়।"

মাতৃভক্ত বেঙ্কটনাথ জননীর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অচিরে থুপ্পিলের নিকটস্থ গ্রামের এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি সংসারী হন।

পত্নী ছিলেন পতিব্রতা। তাই পতির ত্যাগপূত আদর্শকে তিনিও একান্তভাবে আঁকড়িয়া ধরেন। অযাচক বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া পরম আনন্দে উভয়ে পুত্রকলত্রসহ দীর্ঘ গার্হস্থ্য-জীবন অতিবাহিত করেন।

কাঞ্চীর শাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে আচার্য বেঙ্কটনাথ তখন এক কৃতী পুরুষ রূপে সম্মানিত। শ্রীসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা বলিয়া সবাই যেমন তাঁহাকে জানেন, তেমনি সমাদর করেন ন্যায়, সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্তের মর্মজ্ঞ এবং প্রতিভাধর ব্যাখ্যাতা রূপে। এই অল্প বয়সেই 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' পণ্ডিত বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতে আসেন।

এই সময়ে আচার্য বেঙ্কটনাথ এক নবীন বিদ্যার্থীর সহিত পরিচিত হন। বয়সে কনিষ্ঠতর হইলেও প্রতিভা ও প্রাণশক্তি তাঁহার বিস্ময়কর। এই বিদ্যার্থীর নাম মাধব সায়ন। সেদিনকার এই পরিচয় উত্তরকালে পরিণত হয় দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে।

বেঙ্কটনাথ রামানুজ সম্প্রদায়ের আচার্য, প্রধানত বিষ্ণুকাঞ্চীকে

কেন্দ্র করিয়া তিনি বসবাস করিতেন। আর মাধব ছিলেন অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদী গুরুর ছাত্র, শিবকাঞ্চীতে থাকিয়া তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। উভয়ের মতবাদ ও জীবন পরিবেশে পার্থক্য প্রচুর, তবুও তাঁহাদের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন গড়িয়া উঠিতে দেরি হয় নাই। তখনকার দিনে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু বেঙ্কটনাথ ও মাধব ছিলেন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। উভয়ে উভয়ের ত্যাগবৈরাগ্য ও প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিতেন, সনাতন ধর্ম ও স্বদেশের উজ্জীবনের স্বপ্ন উভয়েই দেখিতেন। এমনি করিয়া দুইটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব একে অন্যকে আকৃষ্ট করিত, গভীরভাবে ভালবাসিত।

উত্তরকালে বেঙ্কটনাথ সারা দাক্ষিণাত্যে রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে খ্যাত হন, শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে অগণিত ভক্তহৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করেন। আর মাধব কীর্তিত হন তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্য মুনি রূপে। শিষ্য হরিহর ও বুক্করায়কে প্রেরণা ও সাহায্য দিয়া তিনি গঠন করেন বিজয়নগরের হিন্দুসাম্রাজ্য, ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া যান। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে, সেই সুপরিণত বয়সেও বেঙ্কটনাথ ও মাধবাচার্য তাঁহাদের পুরাতন বন্ধুত্বকে এতটুকু ম্লান হইতে দেন নাই।

কাঞ্চীর জনতার ভিড় ও বিদ্যা-কোলাহল বেশীদিন বেঙ্কটনাথের ভাল লাগে নাই। কিছুদিনের জন্য নিজের চতুষ্পাঠীটিকে তিনি কুড্ডালোরের অন্তর্গত তিরুবাহিন্দ্রপুরে নিয়া যান, সেখানকার শান্ত নিভৃত পরিবেশে চলিতে থাকে তাঁর সাধনা, শাস্ত্রগবেষণা ও শিক্ষাদান।

অতঃপর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের আহ্বানে আচার্য তিরুক্কইলুর নামক স্থানে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। অবশেষে কাঞ্চীর বন্ধুবান্ধব ও শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব প্রধানদের আহ্বানে আবার তাঁহাকে সেখানে ফিরিয়া আসিতে হয়।

ইতিমধ্যে বেঙ্কটনাথ সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় কতকগুলি দার্শনিক ও স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভক্তিবাদের ব্যাখ্যাতা ও বিচারমল্ল রূপে যেমন তাঁহার প্রসিদ্ধি রটিয়াছে, তেমনি তিনি দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বরণীয় ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহার কাব্য প্রতিভার জন্য। কাঞ্চীর জ্ঞানী-গুণী ও ভক্ত সমাজে তখন তিনি অতিশয় জনপ্রিয়। চরিত্রের শুচিতা ও স্নিগ্ধতার গুণে বিরুদ্ধ মতবাদী পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন।

সনাতন ধর্মের উৎসস্থান উত্তর ভারত। বিশেষ করিয়া পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও যমুনার তীরে তীরে এদেশের শ্রেষ্ঠ তীর্থগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। বেঙ্কটনাথ স্থির করিলেন, এই সব তীর্থ দর্শন করিবেন, প্রাণের আশা মিটাইয়া বিগ্রহসমূহের পূজা অর্চনা করিবেন।

একদল ভক্ত যাত্রী তিরুপতি হইয়া গয়া কাশী বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাদের সহিত বেঙ্কটনাথ ভিড়িয়া পড়িলেন। অর্থের কোনো সঙ্গতি নাই, সারা পথে অবলম্বন করিলেন আকাশ-বৃত্তি। ইষ্টদেব শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তাঁহার এই দীর্ঘ তীর্থ পরিক্রমা কিন্তু সহজে ও নির্বিঘ্নে হয় এবং কয়েক মাসের পরে কাঞ্চীতে তিনি ফিরিয়া আসেন।

এই সময়ে আচার্য বেঙ্কটনাথের জীবনে ঘটে এক বিরাট পট-পরিবর্তন। শ্রীরঙ্গম রামানুজী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কিছুদিন যাবৎ সেখানে এক দিগ্‌বিজয়ী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। শাস্ত্রের তীক্ষ্ণ বিচার বিশ্লেষণে, তর্ক যুদ্ধে বৈষ্ণব পণ্ডিতদের তিনি প্রায়ই কোণঠাসা করিয়া ফেলিতেছেন। এ বিপদে সেখানকার ভক্তিবাদী পণ্ডিতেরা বেঙ্কটনাথের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

বেঙ্কটনাথ সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম, 'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' মহাপণ্ডিত বলিয়া চারিদিকে তাঁহার বিরাট খ্যাতি। অদ্বৈতবাদের যুক্তি তর্কের পদ্ধতি তাঁহার ভালভাবে জানা আছে। সর্বোপরি শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের বিশ্বাস, বেঙ্কটনাথ অমানুষী প্রতিভার অধিকারী এবং রামানুজের মতবাদের পুষ্টি সাধনের জন্যই ঈশ্বরের কৃপায় তিনি আবির্ভূত।

সম্প্রদায়ের আচার্যদের আহ্বান বেঙ্কটনাথ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। অচিরে তিনি শ্রীরঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হন।

প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের দর্শন ও অর্চনার শেষে আসিয়া দাঁড়ান অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর সম্মুখে।

উভয়েই অসামান্য শাস্ত্রবিদ্, তীক্ষ্ণধী ও কুশলী বিচারমল্ল। কিন্তু এই তর্কযুদ্ধে বেঙ্কটনাথই অবশেষে জয়লাভ করেন। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে এই নবীন আচার্য ধন্য হন সর্বজনের অভিনন্দনে।

ভক্তিবাদী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ আচার্য রূপে এবার তিনি বিপুল প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ভক্তসমাজ তাই এখন হইতে তাঁহাকে অভিহিত করিতে থাকেন বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ নামে।[১]

মাত্র কয়েক দিনের জন্য কাঞ্চী ছাড়িয়া আসিয়াছেন বেঙ্কটনাথ। কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথ বিগ্রহ ও শ্রীরঙ্গমের ভক্তিময় পরিবেশ তাঁহার মন কাড়িয়া নিল। স্থির করিলেন, কাঞ্চীর বসবাস তুলিয়া দিবেন, সপরিবারে চিরদিনের জন্য এই তীর্থনগরীতেই গ্রহণ করিবেন আশ্রয়। শ্রীবিগ্রহের অর্চনা, শাস্ত্র রচনা ও বিদ্যাদান নিয়াই কাটাইয়া দিবেন জীবনের অবশিষ্ট কাল।

বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের বয়স তখন মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর। সৃষ্টিধর্মী রচনা ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রেরণা তাঁহার জীবনে অফুরন্ত। সেই সঙ্গে রহিয়াছে দেশ ও ধর্মের কল্যাণ সাধনের প্রবল ইচ্ছা। ভক্তিরসের ধারাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দিবার ব্রতটি তিনি গ্রহণ করিতে চান।

শ্রীরঙ্গমের বৈষ্ণব প্রধানেরাও একাজে তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন। পিলাই লোকাচার্য, সুদর্শন সূরী প্রভৃতি একদিন কহিলেন, "বেঙ্কটনাথ তুমি পরম ভাগ্যবান্। পিতা মাতা উভয় কুল থেকেই শ্রীবৈষ্ণব-

---

১ দক্ষিণী শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্তদের বিশ্বাস, স্বয়ংপ্রভু শ্রীরঙ্গনাথ বেঙ্কটনাথকে বেদান্তদেশিক উপাধিতে ভূষিত করেন। প্রকৃতপক্ষে এই উপাধি তাঁহাকে প্রদান করেন শ্রীরঙ্গমের বুধমণ্ডলী ও বৈষ্ণবমণ্ডলী।

বাদের সংস্কার তুমি পেয়েছো। তদুপরি আবির্ভূত হয়েছো ঈশ্বরদত্ত অলৌকিকী প্রজ্ঞা ও প্রতিভা নিয়ে। আমাদের ইচ্ছা, দুটি মহতী কর্ম তুমি সত্বর উদ্‌যাপন করো। তুমি সর্ববিদ্যায় বিশারদ, জটিল দার্শনিক রহস্যভেদে অদ্বিতীয়। সেই সঙ্গে তুমি অসাধারণ কাব্য প্রতিভারও অধিকারী বটে। আমরা তোমার লেখনী থেকে দুই পর্যায়ের রচনা আশা করি।"

"আদেশ পালনে আমি সতত প্রস্তুত।" জোড়হস্তে সবিনয়ে উত্তর দেন বেঙ্কটনাথ।

"মায়াবাদীরা শ্রীসম্প্রদায়ের উপর চারদিক থেকে প্রবল আঘাত হানছে। অদ্বৈতবাদ নিরসনের জন্য তুমি কয়েকটি তাত্ত্বিক ও যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করো। সহজভাবে ব্যাখ্যা করো প্রভু রামানুজের পরম তত্ত্ব। সেই সঙ্গে ভক্ত জনসাধারণের জন্য লিখতে থাকো ভক্তি-রসাত্মক কাব্য গ্রন্থ এবং সুমধুর শ্লোকরাজী।"

বৃদ্ধ সর্বজনমান্য আচার্যদের নির্দেশ স্মরণ রাখিয়া বেঙ্কটনাথ শুরু করিলেন তাঁহার নূতনতর সারস্বত জীবন। শ্রীরঙ্গনাথের সেবা পূজা, আন্তর সাধনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যানে সর্বতোভাবে নিজেকে তিনি নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু ঐশী বিধানে, অচিরে তাঁহার এই নবতর জীবনসাধনার উপর পতিত হইল এক প্রচণ্ড আঘাত। মালেক কাফুরের হিংস্র আক্রমণের প্রাক্‌কালে পরম প্রিয় ইষ্টস্থান শ্রীরঙ্গম হইতে নিজেকে তিনি সরাইয়া নিতে বাধ্য হইলেন।

কিন্তু শ্রীরঙ্গমের এই বিপর্যয় এবং মুসলমান সেনার নারকীয় তাণ্ডব বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথকে তাঁহার জীবনসাধনা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। দুর্দৈবের দারুণ আঘাত তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি করে এক বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়ার। নিরলস লেখনী চালনা ও জীবন-সাধনার মধ্য দিয়া দক্ষিণভারতের ভক্তিবাদকে বেঙ্কটনাথ আরো প্রাণবন্ত করিয়া তোলেন। চরম দুঃখ, ভীতি ও হতাশার দিনে জনগণকে শোনান তিনি আশা ও আশ্বাসের বাণী, নবতর প্রেরণায় তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

শ্রীরঙ্গম ছাড়িয়া আসার পর বেঙ্কটনাথ কিছুদিনের জন্য মহীশূরের সত্যকালম-এ আসিয়া বাস করিতে থাকেন। মালেক কাফুরের সেনা-বাহিনীর ধ্বংসলীলা ও ঘৃণ্য অত্যাচারের অনেক কাহিনীই ইতিমধ্যে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে। লোকমুখে শুনিয়াছেন—রঙ্গনাথজীর মন্দির শ্রীমন্দির বিধ্বস্ত, শ্রীসম্প্রদায়ের বর্ষীয়ান আচার্য সুদর্শন স্যূরী সহ শত শত ভক্ত নরনারী নিহত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, এবার মাদুরার পতনও আসন্ন।

দীর্ঘ পথশ্রমে দেহ অবসন্ন, অন্তর বিষাদখিন্ন। কিন্তু যে গুরুদায়িত্ব বেঙ্কটনাথের সম্মুখে পড়িয়া আছে তাহা উপেক্ষা করার উপায় নাই।

সর্বপ্রথমে তিনি সুদর্শন স্যূরীর পুত্র দুইটির উপনয়ন সংস্কার করাইলেন। এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর শ্রীসম্প্রদায়ের স্থানীয় আচার্যদের কাছে গচ্ছিত রাখিলেন সুদর্শন ভট্টের রচিত 'শ্রুতপ্রকাশিকা'র পাণ্ডুলিপিটি।

অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গেল, শ্রীরঙ্গমের প্রসিদ্ধ আচার্য বেঙ্কটনাথ মুসলমান সেনার বেষ্টনী এড়াইয়া শ্রীরঙ্গম হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। নবীন ছাত্র ও ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁহার কাছে সমেবত হইতে লাগিলেন।

দেশের সম্মুখে সংকটের ঘন কালো মেঘ ঘনায়মান। একের পর এক হিন্দু রাজ্য সুলতানী সেনার সম্মুখে ভাঙিয়া পড়িতেছে। রাজাদের কোষাগার ও মন্দিরে কোষাগার ও মন্দিরের ধনৈশ্বর্য লুণ্ঠনেই আক্রমণকারীদের তাণ্ডব শেষ হইতেছে না, উন্মত্তের মতো যেখানে যে দেববিগ্রহ দেখিতেছে তাহা ভগ্ন করিতেছে, কলুষিত করিতেছে। সম্মুখে পড়িলে ভক্ত বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও আচার্যদের নিষ্কৃতি নাই, নির্বিচারে করিতেছে তাঁহাদের শিরশ্ছেদ।

এই দুঃসহ অবস্থার প্রতিকার কি করিয়া হইবে? কে করিবে দুর্গতদের পরিত্রাণ?

বিষ্ণুপূজা সমাপন করিয়া সেদিন ধ্যানে বসিয়াছেন বেঙ্কটনাথ।

সাহসা কানে আসিল মৃদু মধুর দিব্য কণ্ঠস্বর, "বৎস, অনাদি অনন্ত কালচক্রের আবর্তন যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, এ সংকটে তাঁর কৃপার জন্য প্রার্থনা জানাও। অন্ধকার যিনি দিয়েছেন, তিনিই যে সম্ভাবিত করবেন নব অরুণোদয়। তাঁর স্তব রচনা করো তুমি, আর তোমার সে স্তব হয়ে উঠুক নির্জিত আতঙ্কিত মানবের কাছে কল্যাণকর অভয়বাণী।"

এ প্রত্যাদেশ পাইয়া নূতনতর আত্মিক বলের সঞ্চার হইল বেঙ্কটনাথের মনে। পূজাকক্ষে বসিয়া, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেই দিনই রচনা করিলেন বরাভয়-ভরা অপরূপ শ্লোকরাজী। এই শ্লোকের নাম দিলেন তিনি 'অভীতিস্তব'। অন্তরের আকুতি জানাইয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভু রঙ্গনাথ, তোমার ভক্তদের মুক্ত করো কলির কলুষ সন্তাপ থেকে, যবন ভয় থেকে। হে করুণাসাগর, তোমার দিব্য করুণার মহাপ্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যাও সেই দনুজদের যারা কলঙ্কিত করছে তোমার সুমহান্ সৃষ্টিকে।"

এই অভীতিস্তব ক্রমে বিস্তার লাভ করে ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে। পরম ভাগবত বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ যেমন প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের চরণে নিবেদন করিতেন এই স্তবমালা, তেমনি সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারীর কণ্ঠেও উচ্চারিত হইত এই আর্তিময় বাণী।

কৌতূহলী বৈষ্ণবেরা বেঙ্কটনাথকে প্রশ্ন করিতেন, "আপনার এই স্তব তো নিত্যই পঠিত হচ্ছে দেশের দিকে দিকে, কিন্তু আপনার ইষ্টস্থান শ্রীরঙ্গম ক্ষেত্রের মুক্ত হবার লক্ষণ তো কই দেখছিনে।"

উত্তরে আশ্বাস দিতেন বেঙ্কটনাথ, "ভগবান্ করুণার উৎস, ভক্তাধীন। তোমাদের আর্তি পোঁছেছে তাঁর কাছে, মুক্তির বীজ অবশ্যই অঙ্কুরিত হচ্ছে। অর্চাবতার প্রভু রঙ্গনাথ তাঁর পুণ্যপীঠকে অবশ্যই কলুষমুক্ত করবেন।"

সমকালীন ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে দেখা যায়, খল্‌জি সেনার আক্রমণের সম্মুখে খণ্ডিত ও দুর্বল হিন্দুরাজ্যগুলি একের পর এক

পদানত হইলেও, খল্‌জি শাসন দক্ষিণ ভারতে স্থায়ী হয় নাই, শিকড়ও গাড়িতে পারে নাই। কিন্তু হত্যা অগ্নিদাহ ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়া মালেক কাফুর দিকে দিকে বর্বর অভিযান চালাইয়াছে। ফলে হিন্দু রাজা এবং জনগণের মনোবল প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

রামগিরির রাজা রামচন্দ্র ইতিপূর্বেই খল্‌জি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। ওয়ারেংগেলের শক্তিমান্ অধিপতি প্রতাপরুদ্রের পক্ষেও যবন সেনাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। বহু সংখ্যক হস্তী, অশ্ব এবং কোষাগারের সমস্ত ধনরত্ন ভেট দিয়া সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জিকে তিনি খুশী করিয়াছেন।[১] হয়শাল-রাজ তৃতীয় বল্লালও খল্‌জি সেনার কাছে পরাস্ত হইয়াছেন, পরিণত হইয়াছেন করদ নৃপতি রূপে।

এই সময়ে দ্বারসমুদ্র রাজ্যের ধনৈশ্বর্যের লোভে মালেক কাফুর বিরাট বাহিনী নিয়া সেখানে উপস্থিত হন এবং রাজ-কোষাগার লুণ্ঠনের পর অগ্রসর হন পাণ্ড্যরাজদের মালাবার ভূখণ্ডের দিকে।

সুন্দর পাণ্ড্য ও বীর পাণ্ড্য এই দুই রাজতনয় তখন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। কাফুরের পক্ষে এ এক পরম সুযোগ। কিন্তু পাণ্ড্যরাজদের ধরা তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না, সেনাদল সহ তাঁহারা অরণ্য অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন, সুচতুর কাফুর তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবনে বৃথা কালক্ষেপ করেন নাই। ব্রহ্মস্থপুরী বা চিদম্বরমের স্বর্ণমন্দির লুণ্ঠন করিয়া এটিকে তিনি ধূলিসাৎ করেন। অতঃপর বিরধূল ও কান্নানুর-এর মন্দিরসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া বিরাট বাহিনীসহ খল্‌জি সেনাপতি ঝাঁপাইয়া পড়েন শ্রীরঙ্গমের তীর্থনগরীর উপর। অবশেষে মাদুরা ও শোক্কনাথের মন্দির তিনি লুণ্ঠন করেন।

কাফুর দক্ষিণ ভারতের যত রাজ্যই পদানত করুন আর যত

---

১ আমীর খুসরব, লিখিয়াছেন, এইসব উপঢৌকনের মধ্যে এমন এক মহার্ঘ রত্ন ছিল, সারা পৃথিবীতে যার জুড়ি নাই। কাফী খান এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে, এই রত্নটিই 'কোহিনূর' বা বাবরের বহুলশ্রুত হীরক এবং মালেক কাফুর এটি দক্ষিণ ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে নিয়া যান।

প্রতাপ ও নৃশংসতাই দেখান না কেন, খল্‌জি প্রাধান্যকে সেখানে তিনি স্থায়ী করতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে দিল্লীর তুঘলক শাহীও এ কার্য সাধনে অসমর্থ হয়।[১]

অতঃপর ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে শুরু হয় হিন্দুশক্তির এক স্বর্ণযুগ। মহারাজা হরিহর রায় তুঙ্গভদ্রার তীরে প্রতিষ্ঠা করেন এক ধর্মরাজ্য। বিজয়নগরের দুর্গশিরে সনাতন ধর্মের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করা হয়। এই সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা, প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের পিছনে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই এক সর্বত্যাগী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে। এই সন্ন্যাসীই বেঙ্কটনাথের যৌবনকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু মাধব সায়ন, শৃঙ্গেরী মঠের বর্ষীয়ান আচার্য এবং ইতিহাসের বহু কীর্তিত পুরুষ বিদ্যারণ্য স্বামী।[২]

বিজয়নগর বাহিনীর প্রতাপে পুণ্যক্ষেত্র শ্রীরঙ্গম মুক্ত হয়। সারা দাক্ষিণাত্যের ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রাণে বহিয়া যায় অনাবিল আনন্দের জোয়ার।

মুসলমান উপদ্রুত স্থান এড়াইয়া বেঙ্কটনাথ এতদিন বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার সাধনকেন্দ্র স্থাপন করিয়া বাস করিতেছিলেন। এবার তাঁহার আনন্দ আর ধরে না। এই শুভলগ্নের প্রতীক্ষায়ই যে তিনি আজো বাঁচিয়া আছেন। শ্রীরঙ্গমের পুণ্যক্ষেত্রে আবার তিনি বাস করিবেন, ইষ্টদেব রঙ্গনাথের নিত্য দর্শন ও পূজা ধ্যানে বাকী জীবনটি তাঁহার মধুময় হইয়া উঠিবে, এই আনন্দে তিনি তখন বিভোর।

খল্‌জি সেনার ভয়ে শ্রীবিগ্রহকে পূর্বেই সরাইয়া নেওয়া হইয়াছিল। নিরাপত্তার জন্য এতদিন কোথাও কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশীদিন রাখা যায় নাই। কখনো কোনো দুর্গম অরণ্যে, কখনো বা জন-মানবহীন কোনো শৈলগুহায় তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখা হইত।

---

১ আরলি মুসলিম এক্সপ্যানশান ইন সাউথ ইণ্ডিয়া : ডঃ বেঙ্কটরামনাইয়া।

২ হিস্ট্রী অ্যাণ্ড কালচার অব দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল (দিল্লী সুলতানেট্) : ডঃ আর. সি. মজুমদার।

শেষ পর্যায়ে প্রভুর বিগ্রহকে রাখা হয় তিরুপতির পবিত্র তীর্থে। কিছুদিন পরে এখান হইতে তাঁহাকে জিন্‌জীতে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজা গোপ্পন তখন দুর্ভেদ্য পার্বত্য দুর্গ জিন্‌জীর শাসক, তাছাড়া এসময়ে রামানুজ সম্প্রদায়ের এক প্রভাবশালী ব্যক্তিরূপেও তিনি অনেকের আস্থাভাজন। রঙ্গনাথ বিগ্রহের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা-পূজার ভার সানন্দে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিগ্রহকে কোথায় কখন লুকাইয়া রাখা হইতেছে, শ্রীরঙ্গমের পরিস্থিতি কিরূপ, লুণ্ঠনকারী খল্‌জি সেনাবাহিনী কখন কোন্ পথে তাহাদের বর্বর অভিযান চালাইতেছে, সব খবরই বেঙ্কটনাথের জানা ছিল। আরও জানা ছিল, শ্রীরঙ্গনাথের মহাপীঠ হইতে যবন নিষ্কাশনের আর বেশী দেরি নাই। কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়নগরের সেনাবাহিনী শ্রীরঙ্গম দখল করিল। এ সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্কটনাথ তাঁহার ভক্ত শিষ্যদের নিয়া পরমানন্দে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

জিন্‌জীর দুর্গ হইতে শ্রীবিগ্রহকে সাড়ম্বরে প্রাচীন মন্দিরে নিয়া আসা হইল। অর্চক ও বৈষ্ণব নেতারা একবাক্যে বেঙ্কটনাথকে অনুরোধ জানাইলেন, "রামানুজের ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা আপনি। আপনার সাধনা ও শাস্ত্রজ্ঞানের গৌরবে সারা দক্ষিণ ভারত গৌরবান্বিত। পণ্ডিত ও ভক্তসমাজের মুখপাত্ররূপে আপনি সদলবলে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত থাকুন। আপনার নির্দেশ নিয়েই আমরা অর্চা বিগ্রহের অভিষেক ও পুনঃস্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন করবো।"

বর্ষীয়ান আচার্য, বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ সেদিন আনন্দে মাতোয়ারা। বুধমণ্ডলী ও ভক্তদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া ভাবাবেগ-কম্পিত দেহে প্রভুর অভিষেক উৎসবে তিনি যোগদান করেন।

মন্দিরের ভট্টার এসময়ে সবিনয়ে অনুরোধ জানান, "বেদান্ত-দেশিক, আজকের দিনের এই মহান্ পুণ্যকর্মে আমরা চাই আপনার কবিকণ্ঠের প্রাণউন্মাদনাকারী স্তবমালা। নিজ নগরে, নিজ বেদীতে

প্রভুজীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলো, এই কাহিনীটি আপনার কণ্ঠনিঃসৃত স্তবের ভেতর দিয়ে কালজয়ী হয়ে থাকুক এই আমরা চাই।"

বেঙ্কটনাথ তখন দিব্য আনন্দরসে বিভোর। পুলকাঞ্চিত দেহে ভাবনিমীলিত নয়নে, যুক্তকরে তিনি গাহিয়া চলিলেন প্রভুর পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জয়গান। সিদ্ধ বৈষ্ণব ও ভক্ত কবির এই স্বতোৎসারিত শ্লোকরাজী প্রভুর সেবকেরা পরম আগ্রহে লিখিয়া নিলেন। তারপর মন্দির পরিচালকদের নির্দেশে উহা খোদিত হইল মন্দিরস্থ শিলাপটে।

আজিও রঙ্গনাথ বিগ্রহ দর্শন করিতে গিয়া ভক্ত বৈষ্ণব ও তীর্থ-চারীরা এই খোদিত স্তবলিপি শ্রদ্ধাভরে পাঠ করেন, হৃদয় তাঁহাদের দিব্য অনুভূতির রসে উদ্বেল হইয়া উঠে।

রামানুজের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিক মতবাদ ছিল বেঙ্কটনাথের প্রিয় পরম বস্তু। সহজ ও সরস ভাষায় এই ধর্মের জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি উহাকে জনমানসে জাগ্রত করিয়া তোলেন, শ্রীসম্প্রদায়ের প্রচার ও পুষ্টি সাধিত হয় তাঁহার রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ, কাব্য ও জীবন সাধনার মধ্য দিয়া।

ন্যায়পরিশুদ্ধি, ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, শতদূষণী, তত্ত্বমুক্তাকলাপ ও রহস্যসার গ্রন্থে বেঙ্কটনাথ তাঁহার দার্শনিক মতবাদ বিস্তারিত করিয়াছেন। এই মতবাদ রামানুজেরই অনুরূপ। চিৎ, অচিৎ ও পুরুষোত্তম এই বস্তুসমূহের স্বরূপ ও তত্ত্বের মীমাংসা তিনি করিয়াছেন। জীব অণু, বিভু নহে, সে শ্রীভগবানের চির দাস—শরণাগতি ও ভগবৎকৃপা ছাড়া তাহার অন্য গতি নাই—রামানুজের এই মতবাদই বেঙ্কটনাথ নানা নূতনতর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়াছেন, পরিবেশন করিয়াছেন সহজবোধ্য ও কবিত্বময় ভাষায়।

১ পরবর্তীকালে দোদ্দয় আচার্য 'বৈভব প্রকাশিকা' নামক পদ্যে রচিত বেঙ্কটনাথের যে জীবনকাহিনী রচনা করেন। তাহাতে এই অপরূপ শ্লোক রচনার কথা বর্ণিত আছে। অয়নের লিখিত 'সপ্ততিরত্নমালিকা' এবং মন্নাপ্পাংগার তামিল ভাষায় রচিত শত-শ্লোকেও এ তথ্য সংক্ষেপে উল্লেখিত।

উপরোক্ত তাত্ত্বিক গ্রন্থ ছাড়া বহু সংখ্যক মূল্যবান ভক্তিরসাত্মক নাটক ও স্তবমালা রচনা করিয়াও তিনি সহস্র সহস্র ভক্তের অন্তরে প্রজ্বলিত করিয়াছেন ঈশ্বরীয় প্রেমভক্তির দীপশিখা। তাঁহার সংকল্প-সূর্যোদয়, যাদবাভ্যুদয়, হংস সন্দেশ প্রভৃতি নাটক ও কাব্য চিরকালের ভক্তসমাজের পরম আদরের ধন। শতশ্লোকী সুমধুর স্তবমালা তির-ভয়মলি আজো শত শত রামানুজপন্থী সাধক ভক্তিভরে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন।[১]

ত্যাগ তিতিক্ষা, শরণাগতি এবং শুদ্ধাভক্তির ঔজ্জ্বল্যে ও তেজস্বিতায় সাধক বেঙ্কটনাথের সমগ্র জীবন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ও মনীষী লেখক প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী তাঁহার জীবন ও রচনার মূল্যায়ন করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"তিনি মূর্তিমান বৈরাগ্য ও ভক্তিস্বরূপ। একাধারে তেজস্বিতা, ও দীনতার অপূর্ব মিলন তাঁহাতে সাধিত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার এই তেজস্বিতাকে অহংকারের ফল বলা যায় না। শ্রীরামানুজের মতের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাই এই তেজস্বিতার মূলে সঞ্চিত ছিল। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত শক্তিই ঈশ্বরদত্ত বলিয়া জানিতেন। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থগুলিও ভগবৎশক্তির বিকাশ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তাকে শ্রীভগবানের দান বলিয়া তিনি মনে করিতেন। অপর দিকে তিনি দার্শনিকতা ও কবিত্বেরও অপূর্ব সমন্বয় দেখাইয়াছেন। দেশিকের গ্রন্থগুলি যদি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়া সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইত সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ মনীষা সচরাচর

---

১ বেঙ্কটনাথের দার্শনিক ও ভক্তিরসাত্মক রচনার সংখ্যা প্রায় ১০৮। তাঁহার ভাবের গাম্ভীর্য ও ভাষার লালিত্য যে কোনো সমালোচকের প্রশস্তি অর্জন করিবে। অপ্পয় দীক্ষিতের মতো অদ্বৈতবাদী আচার্যও তাঁহার রচিত কৃষ্ণজীবনী-মূলক মহাকাব্য যাদবাভ্যুদয়ের ভাষা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার প্রশংসায় মুখর হইয়াছেন।

দৃষ্ট হয় না। ধর্মোপদেষ্টার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তৎসমস্তই তাঁহাতে ছিল[১]।"

সরস্বতী মহারাজ এ প্রসঙ্গে আরও লিখিয়াছেন, "ইতিবৃত্ত বাদ দিলেও কেবল গ্রন্থ বলেই তাঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে একজন মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী, তিনি একাধারে কবি ও দার্শনিক। তাঁহার কবিতার প্রাণ ধর্ম। শ্রীরামানুজের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার দার্শনিক প্রতিভার স্ফূর্তি হইয়াছে। বরদাচার্যের (সুদর্শন সূরীর গুরু) প্রভাবও তাঁহার জীবনে ও দর্শনে পরিস্ফুট। রামানুজ হইতে এক বিষয়ে বেদান্তদেশিকের পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ভাষায়। রামানুজের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল নয়। কিন্তু দেশিকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, বাচস্পতি মিশ্রের ভাষার ন্যায় উদার। বিচারমল্লতায় রামানুজ ও দেশিক উভয়েই সমান। রামানুজের অন্তর্ধানের পরে দেশিকের প্রতিভায়ই শ্রীসম্প্রদায় সজীব রহিয়াছে।"

একদিন রাত্রে রঙ্গনাথ মন্দিরের ভজন পূজন শেষে অর্চক, ভট্টার, আচার্যেরা মিলিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। কথা প্রসঙ্গে একজন হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আজ রাত্রের ভেতর যদি কেউ প্রভু রঙ্গনাথকে উদ্দেশ্য ক'রে ভাব সমৃদ্ধ এক সহস্র শ্লোক রচনা করতে পারেন তবে বুঝবো, তিনিই প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তিনিই উচ্চকোটির ভক্তিসিদ্ধ সাধক।

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ নেতা পিলাই লোকাচার্যের ভাই পেরুমল নায়নার তখন সেখানে উপস্থিত। সুকবি ও ভক্ত-সাধক বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। সবিনয়ে তিনি কহিলেন, "প্রভুর চরণ-পদ্মের প্রশস্তি রচনা সমাপ্ত করতে হবে এক রাত্রের মধ্যে? বেশ তো আমি চেষ্টা ক'রে দেখবো।"

---

১ বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী।

একদল বৈষ্ণব ভক্ত এসময়ে বেঙ্কটনাথকেও চাপিয়া ধরিলেন, "আচার্য, আপনার লেখনীর ভেতর দিয়ে শ্রীরঙ্গনাথ এ যাবৎ সহস্র সহস্র সুমধুর শ্লোক উৎসারিত করেছেন। আমাদের একান্ত ইচ্ছা, ভক্তসমাজের কল্যাণে এ পুণ্যকর্মটি আপনিই সম্পন্ন করুন।"

বেঙ্কটনাথ সম্মতি দিলেন। স্থির হইল, তিনি ও পেরুমল নায়নার দুজনেই নিজ নিজ কবিকল্পনা অনুযায়ী একাজ করিবেন।

সারা রাত্রির মধ্যে পেরুমল পাঁচ শতের বেশী শ্লোক রচনা করিতে পারিলেন না। এদিকে মন্দিরের কোণে বসিয়া ভাবাবিষ্ট সাধক বেঙ্কটনাথ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রভুর চরণকমল উপলক্ষ করিয়া সমাপ্ত করিলেন তাঁহার 'পাদুকা সহস্র'। ভাব মাধুর্যে ভাষার লালিত্যে ও ভক্তিরসের উচ্ছলতায় এই শ্লোকরাজি অতুলনীয়।

পরদিন প্রভাতে শ্রীমন্দিরে প্রভুর মঙ্গলারতির পর সর্বসমক্ষে এই শ্লোকরাজি বেঙ্কটনাথ ভক্তিভরে পাঠ করিলেন। বৈষ্ণব আচার্যদের মধ্যে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সবাই মিলিয়া বৃদ্ধ বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথকে এক নূতন উপাধি দিলেন—কবি তার্কিক-সিংহ।

বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য এসময়ে দাক্ষিণাত্যে আবির্ভূত হইয়াছে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে। শাংকর বেদান্তী, রামানুজী বৈষ্ণব, রামাইৎ, পান্ধারপুরী ভক্ত সবাই সোৎসাহে জড়ো হইতেছেন রাজধানী হাম্পির রাজসভায়। রাজগুরু বিদ্যারণ্য স্বামী সেই রাজসভার প্রাণপুরুষ। রাষ্ট্রীয় জীবন ও ধর্মান্দোলনের শক্তিকে, এই বীর সন্ন্যাসী পরিচালিত করিতেছেন। জনমানসে জাগাইয়া তুলিয়াছেন অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা।

বিদ্যারণ্য অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, শৃঙ্গেরীর মঠাধীশের প্রধান ও প্রবীণ শিষ্য। কিন্তু ধর্ম সংস্কৃতির নব আন্দোলনকে তিনি দেখিতেছেন এক উদার সার্বভৌম দৃষ্টিতে। তাঁহার নির্দেশে রাজকোষের সাহায্য সম্প্রদায় ও মতবাদ নির্বিশেষে আচার্য ও সাধু সন্তদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে। শুধু দক্ষিণ ভারতেরই নয়, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ

সাধক, দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকেরাও আসিয়া ভিড় করিতেছেন হাম্পির রাজসভায়।

বিদ্যারণ্য স্বামীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার শিষ্যদ্বয় রাজা হরিহর এবং তাঁহার ভ্রাতা বুক্ক রায়কে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু ধর্ম ও সাধনার শ্রেষ্ঠ ধারক বাহকেরা বিজয়নগরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকুন। ইহার ফলে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার যেমন বাড়িবে তেমনি বাড়িবে রাজসিংহাসনের গৌরব ও মর্যাদা।

শ্রীরঙ্গমের শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা, বর্ষীয়ান শ্রীবৈষ্ণব আচার্য বেঙ্কটনাথের উপর বিদ্যারণ্যের দৃষ্টি বহু বৎসর যাবৎ নিবদ্ধ। অনেকবারই তিনি ভাবিয়াছেন, বিজয়নগর রাজসভা অলংকৃত করার জন্য তাঁহাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাইবেন। যে মহান্ হিন্দুরাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিদ্যারণ্য করিয়াছেন, যে রাজ্যকে ধর্মসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দুর্গরূপে গড়িয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর, সেখানে বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের মতো দিক্‌পাল আচার্য না থাকিলে মানাইবে কেন? বেঙ্কটনাথ ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষ, ত্যাগ বৈরাগ্য ও চরিত্রনিষ্ঠায়ও তাঁহার সমকক্ষ কেহ আছেন বলিয়া বিদ্যারণ্যের জানা নাই। যৌবনকাল হইতে এই সাধক ও শাস্ত্রবিদ্‌কে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি দেখিয়া আসিতেছেন। নিঃস্পৃহ নিষ্কিঞ্চন এই আচার্যকে কি হাম্পির রাজসভায় আনয়ন করা যায় না? একবার আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিতে দোষ কি?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বিদ্যারণ্য বেঙ্কটনাথের কাছে এক পত্রী পাঠাইলেন। পত্রীর বাহক তাঁহার এক বর্ষীয়ান কৃতবিদ্য সন্ন্যাসী-শিষ্য। বেঙ্কটনাথের সঙ্গে কোন্ কৌশলে কথা বলিতে হইবে, কিভাবে তাঁহাকে আমন্ত্রণের তাৎপর্য বুঝাইতে হইবে, সব কিছু বিশদভাবে এই সন্ন্যাসী দূতকে বলিয়া দিলেন।

বিদ্যারণ্যের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অচিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন শ্রীরঙ্গমে। পত্রীসহ নিবেদন করিলেন স্বামীজীর বক্তব্য।

বেঙ্কটনাথ সসংকোচে কহিলেন, "কিন্তু আমার মতো ব্যক্তি, উঞ্ছবৃত্তি ক'রে যে বেঁচে আছে, কোনো মতে নিজের সংসার

প্রতিপালন করছে, তাঁকে দিয়ে বিজয়নগরের নৃপতির কি কাজ, বলুন তো ?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহাত্মন্, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে ঐশ্বরীয় কৃপায়, ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্মযজ্ঞ উদ্‌যাপনের জন্য। সেই পুণ্য-ভূমিতে আপনার মতো মহাপুরুষ ও শাস্ত্রবিদ্ আচার্যকেই তো চাই।"

"শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের এক কোণে আমি আমার আর্তি নিয়ে পড়ে আছি। আমার সাধনা ও শাস্ত্রচর্চা একান্তভাবে ক'রে যাচ্ছি। রাজসভার কোলাহলের ভেতরে থেকে আমার কি লাভ বলুন তো ?"

"লাভ যথেষ্ট, আচার্য।"

"বেশ তো আমায় বুঝিয়ে বলুন।"

"আপনি রামানুজের পরম ভক্ত এবং তাঁর শ্রীসম্প্রদায়ের কল্যাণ-কামী, এটা তো ঠিক ?"

"তা বটে।"

"তাহলে আমি আপনাকে বলছি, হাম্পির রাজসভায় গেলে, রামানুজীয় তত্ত্বপ্রচারের পাবেন আপনি পরম সুযোগ, সারা ভারতের দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা সেখানে আনাগোনা করছেন। আপনার মতবাদ প্রচারের সেটাই যে উপযুক্ত স্থান। এর ফলে আপনার সম্প্রদায়ের যথেষ্ট কল্যাণও হবে বৈ কি।"

"সন্ন্যাসীবর, পুণ্যপীঠ শ্রীরঙ্গমে থেকে যে সাধনা ও শাস্ত্ররচনা আমি করছি, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে শ্রীসম্প্রদায়ের ভক্ত বৈষ্ণবদের যে সেবা করতে পারছি, তার মূল্য আমার কাছে অনেক বেশী। রাজধানীর বহিরঙ্গ প্রচারের চাইতে আমার এই অন্তরঙ্গ সেবা অনেক বেশী কল্যাণবহ।"

"রাজা ও রাজগুরু বিদ্যারণ্যের সাদর আমন্ত্রণ নিয়ে আমি আপনার দ্বারে এসেছি। অন্তত একটিবারের জন্য আপনি আমার সঙ্গে বিজয়নগরে চলুন, রাজসভার বিরাট কল্যাণকর কর্মোদ্যোগ নিজ চক্ষে দেখে আসুন। স্বামী বিদ্যারণ্য একথাও আপনাকে জানাতে বলেছেন, ভারতের সকল শ্রেষ্ঠ সাধক ও আচার্য বিদ্যানগরের

রাজসভায় উপস্থিত হয়ে তার গৌরব বাড়িয়ে গেছেন, আপনিও সেখানে একবার পদার্পণ করুন।”

“আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় যতিবর। রাজা ও রাজগুরুর সাদর আমন্ত্রণ আপনি নিবেদন করেছেন এজন্য আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এবার আমার পরম বন্ধু বিদ্যারণ্য স্বামীর পত্রীর উত্তর আমি আপনার হাতে দেব।”

পত্রীটি সন্ন্যাসীর হাতে দিয়া বেঙ্কটনাথ কহিলেন, “আমি দীন-হীন কাঙাল বৈষ্ণব, রাজসভার নয়ন ধাঁধানো ঐশ্বর্যে আমার কি প্রয়োজন? স্বামী বিদ্যারণ্যকে বলবেন, তাঁর সদিচ্ছা ও সাদর আহ্বানের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু শ্রীরঙ্গমকেই যে আমি আমার জীবনের পরম আশ্রয়রূপে আঁকড়ে ধরেছি। রাজার রাজা, পরম প্রভু শ্রীরঙ্গনাথের দাস আমি, তেমনি দাস বিদ্যানগরের রাজা হরিহর রায়। তবে শ্রীরঙ্গনাথের এই সান্নিধ্য ও আশ্রয় ছেড়ে, বিদ্যানগর রাজের আশ্রয়ে আমি কেন যাবো, বলুন তো?”

সন্ন্যাসী-দূত বিদ্যানগরে ফিরিয়া গেলেন। পত্রী পড়িয়া এবং সব কথা শুনিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে বিদ্যারণ্য কহিলেন, “বৈরাগ্য ও শরণাগতির সাধনা সার্থক হয়েছে বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথের। জীবনপ্রভু রঙ্গনাথকে প্রাপ্ত হয়েছে সে। তাই তো শ্রীরঙ্গম থেকে অন্যত্র আশ্রয় নেবার প্রশ্ন তাঁর কাছে আজ অবান্তর।”

সিদ্ধবৈষ্ণব বেঙ্কটনাথ ছিলেন দৈন্য, পবিত্রতা ও সরলতার মূর্ত বিগ্রহ। আবার রামানুজীয় মতবাদের প্রতিপক্ষের সম্মুখে, শাস্ত্রীয় বিচার-সভায় দেখা যাইত তাঁহার ভিন্ন রূপ। যুদ্ধরত গাণ্ডীবীর মতো তিনি গর্জিয়া উঠিতেন, শাস্ত্রীয় তথ্য ও তত্ত্বের শরজালে অপর পক্ষের আচার্যদের করিতেন ধরাশায়ী।

আবার দেখা যাইত এই সব বিরুদ্ধ মতবাদী পণ্ডিত ও সাধকদের সঙ্গে সহাবস্থান করিতে বা ঘনিষ্ঠতা করিতে তাঁহার বাধিত না। সারা বিশ্বসৃষ্টি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে নিঃসৃত, এবং সৃষ্ট জীব

তা সে ভক্তিপন্থী হোক বা জ্ঞানপন্থীই হোক, স্বরূপত সেই শ্রীবিষ্ণুরই দাস তো বটে। তাই ইঁহাদের সহিত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বেঙ্কটনাথের দিক হইতে কোনো সংকোচ ছিল না।

শাস্ত্রবিদ্ তর্কশূর বেঙ্কটনাথ আর বৈষ্ণবীয় দীনতার প্রতিমূর্তি বেঙ্কটনাথ, এই দুই চিত্র অনেক সময়ে শ্রীরঙ্গমের কোনো কোনো আচার্যের মনে বিভ্রম জাগাইয়া তুলিত।

সে-বার শ্রীরঙ্গমের কয়েকটি ঈর্ষাপরায়ণ আচার্যের মনে ইচ্ছা জাগিল, সিদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত বেঙ্কটনাথকে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। দেখিবেন সত্য সত্যই তাঁহার জীবন হইতে অহংবোধ দূর হইয়াছে কিনা, ভক্তি ও প্রপত্তির সাধনায় তিনি সফলকাম হইয়াছেন কিনা।

ঐ আচার্যদের একজন বেঙ্কটনাথের কাছে গিয়া যুক্তকরে কহিলেন, “বেদান্তদেশিক, আমার মনের বাসনা, আপনি একদিন আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন। কালই আপনি দয়া ক'রে আসবেন, শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদান্ন গ্রহণ করবেন। আরো কয়েকজন বৈষ্ণব সাধু-পুরুষও আসবেন।”

বেঙ্কটনাথ সানন্দে রাজী হইলেন। কহিলেন, “প্রভুর প্রসাদান্ন পাবো, সে তো পরম সৌভাগ্যের কথা। জানেন তো সংসারে থেকেও, আকাশবৃত্তিই আমার একমাত্র অবলম্বন। ভালই হলো, প্রভু আপনার গৃহে কাল আমার অন্নের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।”

পরদিন মধ্যাহ্নে ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করিতে গিয়া বেঙ্কটনাথ বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, অন্যান্য সাধু ভক্তদের ভোজন শুরু হইয়াছে, শুধু তাঁহার জন্য এক ভিন্ন ব্যবস্থা। ঠাকুরঘর সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র কুটিরে তাঁহার আহারের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, আর সেই কুটিরের প্রবেশ পথে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে কয়েক জোড়া জীর্ণ পাদুকা। যে বৈষ্ণবেরা পাশের ঘরে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন, বুঝা গেল—এ পাদুকাগুলি তাঁহাদেরই।

নির্দিষ্ট কুটিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বেঙ্কটনাথ একে একে প্রত্যেকটি পাদুকা টানিয়া নিয়া ভক্তিভরে নিজের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, "আজ আমার কি সৌভাগ্য। পরম-প্রভুর ভোগপ্রসাদের ব্যবস্থা যেমন হয়েছে আমার জন্য, তেমনি রয়েছে প্রভুর নিজজন বৈষ্ণবদের পদরজ-লিপ্ত এই পাদুকাগুলো।"

নিমন্ত্রণকারী আচার্য এবং তাঁহার কুচক্রী সহযোগীরা এতক্ষণ একদৃষ্টে বেঙ্কটনাথের দিকে চাহিয়া আছেন। ভোজন কুটিরের প্রবেশ পথে পাদুকা ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে বেঙ্কটনাথকে অপমান করার জন্য। সর্বজনমান্য, অশীতিপর বৃদ্ধ বেঙ্কটনাথ এ অপমানের ষড়যন্ত্র মুহূর্তে বুঝিয়া নিবেন এবং তাঁহার রোষবহ্নি তৎক্ষণাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, ইহাই সবাই আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কার্য-কালে দেখা গেল, ভিন্ন চিত্র। শ্রীসম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় পণ্ডিত, প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ বেঙ্কটনাথ আবেগভরে বার বারই পাদুকাগুলি মস্তকে স্পর্শ করাইতেছেন, আর ভক্তি-আবিষ্ট দেহখানি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

চক্রান্তকারী আচার্যের অনুতাপের অবধি রহিল না, জোড়হস্তে মহাপুরুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন তাঁহার চরণে।

ভাবাবেগ প্রশমিত হইলে শান্ত স্নিগ্ধ স্বরে বেঙ্কটনাথ কহিলেন, "যাঁর যেমনতর পথ পরমপ্রভু নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছেন, সেই পথই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। কেউ আছেন কর্মযোগের পথে, কেউ জ্ঞানযোগী বেদান্তী, কেউবা সাধনায় লিপ্ত রয়েছেন শ্রীহরির দাসানুদাস হয়ে। আমার মতো দীনভক্তের পথ হচ্ছে সেই 'দাস-আমি' সাধনার পথ। আপনারা বৈষ্ণব ভক্তদের পদরজ সমন্বিত পাদুকা এখানে আমার জন্য সংগ্রহ ক'রে রেখে আমার পরম কল্যাণ সাধন করেছেন।"

উপস্থিত সকলেই উপলব্ধি করিলেন, রামানুজীয় প্রপত্তির সাধনায় বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ সত্যই অতুলনীয়।

বেঙ্কটনাথের কবিত্ব, দার্শনিকতা ও সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল তাঁহার সমকালীন আচার্যদের কাছে এক পরম বিস্ময়। যাদবাভ্যুদয় নাটকের ভূমিকায় শ্রী এ, ভি, গোপালচারিয়ার তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"বেদান্তাচার্য বেঙ্কটনাথ ছিলেন সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সময়কার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কিছুর উৎসে এই শক্তিধর পুরুষ ছিলেন বিরাজমান। উচ্চস্তরের কবি যেমন তিনি ছিলেন, তেমনি ছিলেন বিতর্কমূলক নানা তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা। প্রাঞ্জল ও সুমধুর কবিতা যেমন তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইত তেমনি পাওয়া যাইত দার্শনিক জটিলতার মীমাংসা। বেঙ্কটনাথের ধর্মীয় ও দার্শনিক রচনার ভিত্তি ছিল ন্যায়ের নিখুঁত বিচারশীলতা, যে কোনো মননশীল গবেষকের দৃষ্টিতে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। তাঁহার প্রত্যেকটি রচনায় বর্তমান রহিয়াছে এক মহান্ প্রতিভাধর পুরুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। কবিত্ব এবং দার্শনিকতা দুই-ই যেন তাঁহার কাছে ছিল খেলার বস্তুর মতো, যে কোনো মুহূর্তে এই সব অবলীলায় তিনি সৃষ্টি করিতে পারিতেন।"

সাধন জীবনে বেঙ্কটনাথ ছিলেন সিদ্ধপুরুষ, প্রকৃত বৈরাগ্য, সত্য-নিষ্ঠা ও সত্যকার প্রেমভক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই দেখা যায়, শতাধিক বৎসরের দীর্ঘ জীবনে এক দিনের তরেও বিরোধী সম্প্রদায় বা ভিন্ন মতবাদী পণ্ডিত ও সাধকদের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধে নাই।

'সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র' মহাপুরুষরূপে তিনি খ্যাত ছিলেন। সর্ব মত ও পথের সন্ধান তিনি জানিতেন, তাই শাস্ত্রের প্রকৃত লক্ষ্য এবং পরম-পুরুষের নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁহার ভুল হইত না। সকল জীবকেই ঈশ্বরের দানরূপে গ্রহণ করিয়া সকলের সহিত একাত্মক হইতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই দেখা যাইত, অদ্বৈতবাদী, ভেদাভেদবাদী বা তেলেঙ্গল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকেরাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন।

শীর্ষস্থানীয় অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিতে বেঙ্কটনাথের স্থান কত উচ্চে ছিল, সমকালীন একটি ঘটনা হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

সেবার বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পিতে এক প্রতিভাধর বৈষ্ণব আচার্যের আগমন হইয়াছে। নাম তাঁহার অক্ষোভ্য মুনি। তর্ককুশল আচার্য ও দার্শনিক বলিয়া দক্ষিণ ভারতে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি।

রাজসভায় পৌঁছিয়া অক্ষোভ্য রাজা হরিহর রায়কে কহিলেন, "মহারাজ, আমি বিষ্ণু উপাসক, দ্বৈত মতবাদের প্রচারক। বিজয়নগর সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দু সাম্রাজ্য, এখানে ভক্তিধর্মের পতাকা আমি উত্তোলন করতে চাই। এজন্য তর্কদ্বন্দ্বে আহ্বান করছি রাজগুরু, শৃঙ্গেরী মঠের প্রবীণ নেতা, অদ্বৈতবাদী বিদ্যারণ্য স্বামীকে।"

বিদ্যারণ্য সভাতে উপস্থিত। অক্ষোভ্যকে সংবর্ধনা জানাইয়া কহিলেন, "আচার্য, সানন্দে আমি আপনার তর্কযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করছি। আমি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদী। যুক্তিতর্ক দিয়ে যদি আপনি আমায় পরাস্ত করতে পারেন, আমি আপনাকে জয়পত্র অবশ্যই লিখে দেবো।"

"তবে বিচার অবিলম্বে শুরু হোক।" দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠেন অক্ষোভ্য মুনি।

"আচার্য, আপনি মধ্বমতের শ্রেষ্ঠ আচার্য, শক্তিমান্ বিচারমল্ল বলেও আপনাকে সবাই জানে। আর আমিও শৃঙ্গেরী মঠের একজন বর্ষীয়ান সন্ন্যাসী, শাংকর বেদান্তের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাতা রূপে আমি দক্ষিণ ভারতে সুপরিচিত। আমাদের এই তর্কযুদ্ধের মধ্যস্থ করা হবে কাকে? বলুন, আপনি কাকে মনোনীত করতে চান?"

দুই জনেই শীর্ষ স্থানীয় দার্শনিক ও বিচারনিপুণ। সমপর্যায়ের কোনো প্রতিভাধর আচার্য ছাড়া কে তাঁহাদের শাস্ত্র বিতর্কের মূল্য নিরূপণ করিবেন? তাছাড়া, যিনি মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিবেন, সততা, নীতিজ্ঞান ও সর্বোপরি নিরপেক্ষতা তাঁহার থাকা চাই।

সহসা এমন কোনো লোকের নাম মনে আসিতেছে না। অক্ষোভ্য তাই সবিনয়ে কহিলেন, "যতিবর, এমন কোনো উপযুক্ত ব্যক্তির নাম

আমার জানা নেই। আপনিই বরং ভেবে দেখুন এজন্য কাউকে পাওয়া যায় কিনা।"

"আমার তো মনে হয় এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য সারা দক্ষিণ ভারতে শুধু একজনেরই নাম করা যায়। তিনি হচ্ছেন বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ। রামানুজীয় ভক্তিবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এবং শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবীণতম নেতা তিনি। সত্যনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যময় সাধনায় তিনি অতুলনীয়। তাছাড়া, সর্বশাস্ত্রে তিনি পারঙ্গম। আপনার সমর্থন থাকলে তাঁকেই একাজের জন্য আহ্বান করা হোক।"

বিদ্যারণ্যের কথা শেষ হইতে না হইতে সভার অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতদের মধ্যে গুঞ্জন ও প্রতিবাদ উঠিল। তাঁহারা কহিলেন, "বেঙ্কটনাথ তাঁহার দীর্ঘ সাধনজীবন কাটিয়েছেন ভক্তি ও প্রপত্তি নিয়ে, ভক্তিবাদী শাস্ত্রচর্চা নিয়ে। শুধু তাই নয়, তাঁহার শতদূষণী গ্রন্থে অজস্র শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ দিয়ে তিনি কি নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ বাতিল করতে চান নি ? কাজেই বিচারে বসে অক্ষোভ্যমুনির বৈষ্ণববাদের সমর্থনেই তিনি বেশী ঝুঁকবেন। এবং এটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।"

বিদ্যারণ্য নিজ আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়ান, দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠেন, "বেঙ্কটনাথকে আমি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে দেখেছি। তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কথা আমি জানি। ন্যায়নীতি ও সত্যনিষ্ঠা থেকে এই মহাপুরুষ কখনো এক চুল বিচ্যুত হন নি। এ তর্কদ্বন্দ্বে বাদী ও প্রতিবাদী যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি তর্ক উপস্থিত করবেন, শুধু তাঁর ভিত্তিতেই বেঙ্কটনাথ স্থির করবেন তাঁর সিদ্ধান্ত। এই তর্ক-বিচারে তাঁর চাইতে সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ আর কাউকে তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনে।"

প্রতিবাদকারী পণ্ডিতেরা চুপ করিয়া গেলেন। অক্ষোভ্যের মত নিয়া বিদ্যারণ্য সেই দিনই এক বিশেষ বার্তাবহকে বেঙ্কটনাথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

এবারও বেঙ্কটনাথকে বিজয়নগরের রাজধানী হাম্পিতে আনয়ন

করা গেল না। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিলেন, উভয় তর্কশূরের আমন্ত্রণে তিনি নিজেকে কৃতজ্ঞ ও অনুগৃহীত মনে করিতেছেন। কিন্তু তাহার মতো কাঙাল বৈষ্ণবের পক্ষে রাজসভার আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের মধ্যে ক্ষণকের তরেও অবস্থান করা সম্ভব নয়।

অগত্যা বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যকে এক নূতন প্রস্তাব দিতে হইল। তাঁহারা লিখিলেন—বেশ, বেঙ্কটনাথ রাজসভায় আসিতে না চান, ভাল কথা, কিন্তু এই তর্কদ্বন্দ্বের মধ্যস্থতা তাঁহাকে করিতেই হইবে। উভয় পক্ষ তাঁহাদের যুক্তি তর্ক ও শাস্ত্র প্রমাণ রাজপুরুষদের মাধ্যমে শ্রীরঙ্গমে প্রেরণ করিবেন। বেঙ্কটনাথ সেখানে বসিয়া তর্ক-যোদ্ধাদের বক্তব্যের মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং নিজ সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবেন পত্রযোগে।

এই বিচারদ্বন্দ্বে বেঙ্কটনাথ কাহাকে জয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সে তথ্য স্পষ্টরূপে জানা যায় না। ভক্তিবাদী অক্ষোভ্য মুনির ভক্ত শিষ্যেরা দাবি করেন, বেঙ্কটনাথ তাঁহাকেই জয়মাল্য দিয়াছিলেন। অপর দিকে অদ্বৈত বেদান্তীরা দাবি করেন, তাঁহাদের প্রতিনিধি বিদ্যারণ্য স্বামীর অনুকূলেই দেওয়া হয় বর্ষীয়ান মধ্যস্থ, মহান্ শাস্ত্রবিদ্, বেঙ্কটনাথের সিদ্ধান্ত।

তর্কযুদ্ধের ফলাফল যাহাই হোক, উপরোক্ত ঘটনা হইতে এই সত্যটিই প্রমাণিত হয় যে, আচার্য বেঙ্কটনাথকে সমকালীন মহাত্মা ও শাস্ত্রবিদেরা এক অনন্যপুরুষ রূপেই দেখিতেন। তাঁহার সততা ও নিরপেক্ষতা ছিল সকল কিছু মতবিরোধ ও নিন্দা সমালোচনার ঊর্ধ্বে।

বেঙ্কটনাথ শতাধিক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। সুপরিণত বয়সের এই সিদ্ধপুরুষ ও অসামান্য শাস্ত্রবিদ্ অদ্বৈতবাদী ও ভক্তিবাদী উভয় দলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তবে বিশেষ করিয়া রামানুজীয় ভক্তিবাদই তাঁহার জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া জনমানসে আরো প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে।

মাদুরার মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করার পর হইতে বিজয়নগর

সাম্রাজের পরিধি ও প্রভাব বিপুলভাবে বাড়িয়া যায়। এসময়ে বিদ্যারণ্য এবং তাঁহার শিষ্য হরিহর ও বুক্ক রায় বাছিয়া বাছিয়া সুশিক্ষিত ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদের নিয়োগ করিতে থাকেন সামন্ত-রাজ ও শাসনকর্তা রূপে।

সাম্রাজ্যের কয়েকটি সামন্ত আচার্য বেঙ্কটনাথেরই অনুরাগী হইয়া পড়েন, কেহ কেহ তাঁহার নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণও করেন। এই সামন্তদের, বিশেষ করিয়া রাজমহেন্দ্রীর সামন্তরাজ সর্বজ্ঞের অনুরোধে বেঙ্কটনাথ তাঁহার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রচনা দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করেন। ফলে সাধারণ ভক্ত নরনারীর মধ্যে তাঁহার বাণী জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং অধ্যাত্ম-প্রভাবও অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়।

দক্ষিণী বৈষ্ণব সমাজের এক ভাস্বর জ্যোতিষ্ক রূপে শ্রীরঙ্গমের অধ্যাত্ম-আকাশে অর্ধ শতকেরও বেশী কাল বেঙ্কটনাথ দীপ্যমান থাকেন। তারপর ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, একশত দুই বৎসরে পদার্পণ করার পর এই মহাপুরুষের জীবনে আসিয়া যায় চির বিরতির পালা।

জীবনদীপ নিভিবার আভাস সেদিন আসিয়া গিয়াছে। সিদ্ধ বৈষ্ণব এবার প্রস্তুত হইয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুত্রদের মধ্যে ভক্তিমান্ ও সুপণ্ডিত—নয়নার আচার্য। তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বেঙ্কটনাথ প্রশান্ত স্বরে কহিলেন, "বৎস, আমার পরম প্রিয় 'পাদুকা সহস্রম' আবৃত্তি কর। পরম প্রভুর চরণাশ্রয় নেবার জন্য এবার আমি যাত্রা করছি এই মরধাম থেকে।"

স্বরচিত প্রভু-প্রশস্তি শুনিতে শুনিতে নয়ন দুটি তাঁহার নিমীলিত হইয়া আসে, তারপর মহাবৈষ্ণব প্রবেশ করেন নিত্যলীলা ধামে।

---

১ সুভাষিত নীতি, রহস্যত্রয়সার প্রভৃতি বেঙ্কটনাথ প্রকাশ করেন দেশীয় ভাষায়।

বল্লভাচার্য

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে এক বৈশিষ্ট্যময় বিবর্তন-যুগরূপে চিহ্নিত। প্রেমভক্তির ভাবপ্রবাহ এ সময়ে দেশের দিকে দিকে উৎসারিত হইয়াছে, ছড়াইয়া পড়িয়াছে সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে। এই ভাবপ্রবাহের উৎসমুখে আবির্ভূত দেখি এমন একদল মহাপুরুষকে, সাধনা ও সিদ্ধির আলোকে জীবন যাঁহাদের সমুজ্জ্বল, আর্ত নিপীড়িত ও ত্রিতাপতাপিত নরনারীর জন্য চিত্ত যাঁহাদের করুণার্দ্র। এই মহাপুরুষদের মধ্যে রহিয়াছেন রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য—আরো রহিয়াছেন একনাথ, তুকারাম প্রভৃতি। প্রেমভক্তি সাধনার নবতর ও সহজতর পন্থা ইঁহারা প্রবর্তন করিয়াছেন, আর অপার করুণাভরে আপামর জনগণকে সেদিকে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছেন।

ভক্তিসাধনার এই নব পথিকৃৎদের অন্যতম মহাত্মা বল্লভাচার্য। আপন জীবনের তপস্যা ও শাস্ত্র-ভাষ্য রচনার মধ্য দিয়া এই দক্ষিণী সাধক উত্তর ভারতের বহুস্থানে বিস্তারিত করেন কৃষ্ণউপাসনার ধারা, রচনা করেন শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদের এক সুমহান্ সৌধ।

বল্লভাচার্যের পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট ছিলেন ভক্তিমান্ দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। আদি নিবাস অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষুদ্র গ্রাম কাঁকড়ওয়াড়। পত্নীর নাম যল্লামাগারু। গার্হস্থ্য জীবনের অধিকাংশ সময় লক্ষ্মণ ভট্ট পূজাপাঠ, শাস্ত্র-চর্চা ও তীর্থদর্শনেই কাটাইয়া দিতেন। সংসারের কোনো কাজেই তাঁহার মন বসিত না। তিনটি পুত্রের জনক হওয়ার পর অন্তরে তাঁহার নির্বেদ জাগিয়া উঠে, ভাবাবেগে হঠাৎ একদিন গৃহ-ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজনে বাহির হন, তারপর প্রেমাকর স্বামী নামক সন্ন্যাসী গুরুর কাছে গ্রহণ করেন মন্ত্রদীক্ষা।[১]

কিছুদিন পরের কথা। লক্ষ্মণ ভট্টের পিতা সপরিবারে বাহির হইয়াছেন তীর্থ পর্যটনে। দেশান্তরী পুত্রের জন্য মন তাঁহার তখনো

---

১ পুষ্টিমার্গণো ইতিহাস।

বেদনায় ভারাক্রান্ত। প্রায়ই ভাবেন, প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণের সঙ্গে হঠাৎ যদি কোথাও দেখা হয়, তবে আবার তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া গৃহে ফিরাইয়া আনিতে পারেন। আকস্মিকভাবে এই যোগাযোগ একদিন সত্যই ঘটিয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে সবাই একদিন প্রেমাকর স্বামীর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত।

ভক্তিমতী যল্লামাগারু স্বামীজীকে প্রণাম করিতেই তিনি আশীর্বাদ করিলেন, "সুখে থাকো মা, আনন্দে থাকো। একটি কুলপাবন পরম ভক্ত পুত্র তুমি লাভ করো।"

যল্লামা কান্নায় ভাঙিয়া পড়েন, দুই চোখ বাহিয়া ঝরিতে থাকে শোকের অশ্রুধারা।

স্বামীজীকে জানানো হয়, আশীর্বাদ তিনি করিয়াছেন বটে কিন্তু এই যুবতীর স্বামী নিরুদ্দেশ, তাহাকে ফিরিয়া পাইবার কোনো আশা নাই।

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রেমাকর স্বামী বলেন, "মা, আমি যে আশীর্বাদ করেছি, তা কখনো বিফল হবার নয়। পুত্ররত্ন লাভ তোমার হবেই। আর তোমার স্বামীও ফিরে আসবে তোমাদের কাছে।"

স্বামীজীর শিষ্য লক্ষ্মণ ভট্ট তখন আশ্রমের কাজে বাহিরে কোথায় গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখেন এক বিস্ময়কর দৃশ্য। তাঁহার বাবা, মা ও স্ত্রী স্বামীজীর সম্মুখে বসিয়া আছেন, তিনিও পরমানন্দে নানা উপদেশ তাঁহাদের দিতেছেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে লক্ষ্মণকে এই আশ্রমে দেখিয়া আত্ম-পরিজনদের আনন্দের অবধি নাই। তৎক্ষণাৎ সবাই তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরেন, আকুতি জানাইতে থাকেন গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য।

এবার প্রেমাকর স্বামী তাঁহার উদ্দেশে বলেন, "বৎস, তুমি ভাবের উচ্ছ্বাসে ঘর-সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছো বটে, কিন্তু ঠিক কাজ করো নি। সংসার বাসনা তোমার ভেতর সূক্ষ্মরূপে যথেষ্ট রয়ে গিয়েছে, তাছাড়া বাকী রয়েছে সংসার-আশ্রমের কিছু কর্তব্য। আমি

নির্দেশ দিচ্ছি তুমি আবার গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করো। আরও একটা কথা জেনে রাখো, তোমার ঘরেই অনতিকাল মধ্যে জন্ম গ্রহণ করবেন এক ভক্তিমান্ মহাপুরুষ।”

লক্ষ্মণ ভট্টকে আবার ঘর-সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। এ সময়ে তাঁহার নিজ গ্রাম কাঁকড়ওয়াড় ও সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁহার সন্ন্যাস-আশ্রম ত্যাগ নিয়া নানা নিন্দা সমালোচনাও হইতে থাকে। তাই সপরিবারে তিনি চলিয়া আসেন কাশীধামে। সেখানে একটি ছোট-খাটো টোল তিনি খুলিয়া বসেন। এই বৃত্তির মাধ্যমে পরিবারের ভরণপোষণ চলিতে থাকে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাশীতে সোরগোল পড়িয়া যায়, একদল মুসলমান সেনা এই প্রসিদ্ধ তীর্থনগরী লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। সর্বত্র প্রবল আতঙ্কের ভাব, বহু নরনারী ঘরবাড়ি ছাড়িয়া দূরে গ্রামাঞ্চলে চলিয়া যাইতেছে।

লক্ষ্মণ ভট্টের স্ত্রী তখন পূর্ণগর্ভা, এ অবস্থায় কোথায় কোন্ নিরাপদ আশ্রয়ে তাঁহাকে সরাইয়া নেওয়া যায়? আচার্য ভাবিয়া কোনো কূলকিনারা পান না। অবশেষে সবাই মিলিয়া স্থির করিলেন, মধ্য-প্রদেশের রায়পুর অঞ্চলে চম্পারণ্যে গিয়া তাঁহারা কিছুদিন বাস করিবেন। স্থানটি অনেকাংশে নিরাপদ, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব বা যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা সেখানে মোটেই নাই।

আরও একটি কারণ ছিল সেখানে আশ্রয় নিবার। চম্পারণ্যের রাজমন্ত্রী লক্ষ্মণ ভট্টের পূর্ব পরিচিত। ভট্টের আশীর্বাদে কিছুদিন আগে তাঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। এজন্য ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রাজমন্ত্রী তাঁহাকে এক পত্রীও দিয়াছেন। কাশীর বাস উঠাইয়া দিয়া ভট্ট তাই রওনা হইলেন মধ্যপ্রদেশের দিকে।

সপরিবারে ঐ স্থানে যাইবার কালে ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে[১] ভট্টের পত্নী

---

১ মতান্তরে, অর্থাৎ বল্লভের পৌত্র যদুনাথজীর সম্প্রদায়ের মতে এই জন্মসাল—১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। অন্যান্য পৌত্র এবং শিষ্যগণ ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দকেই সমর্থন করিয়া থাকেন। দ্রঃ শ্রীবল্লভাচার্য (ইং)—ভাই মণিলাল পারেখ।

চম্পারণ্যের প্রান্তে, এক চম্পকবনে, একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্রই ভারত বিখ্যাত ভক্তিসিদ্ধ সাধক বল্লভাচার্য।

শ্রীভগবানের মাধুর্যতত্ত্বের প্রচার, পুষ্টিমার্গীয় সাধনা ও শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদের শাস্ত্রীয় ভিত্তি নির্মাণ, এই তিনটি মহতী কর্মের মধ্য দিয়া বল্লভ এদেশের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। রুদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য রূপেও সারা ভারতে হইয়াছেন তিনি অভিনন্দিত।

কিছুদিন পরে লক্ষ্মণ ভট্ট সংবাদ পাইলেন, মুসলমান সেনা কাশীর দিকে আর অগ্রসর হয় নাই। সেখানকার সমাজ-জীবন আবার স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। মঠ-মন্দিরে শোনা যাইতেছে কাঁসর ঘণ্টার মধুর নিক্বণ ও স্তবগুঞ্জন। পূজার্চনায় ভক্ত নরনারী মাতিয়া উঠিয়াছে, গঙ্গার ঘাটে চলিতেছে তীর্থকামীদের স্নান-তর্পণ।

পলায়িত অন্যান্য কাশীবাসীর মতো লক্ষ্মণ ভট্টও সপরিবারে ফিরিয়া আসেন তাঁহার প্রিয় তীর্থে। এখানে আসিয়া পূর্ববৎ শুরু করেন, চতুষ্পাঠীর কাজ, বিগ্রহ-সেবা আর সাধন ভজন।

পুত্র বল্লভ অষ্টম বয়সে পদার্পণ করিলে ভট্ট তাঁহার উপনয়ন সংস্কার করান। কিছুদিন নিজের টোলে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিবার পর প্রেরণ করেন বিষ্ণুচিত্ত নামক এক অধ্যাপকের কাছে।

বালক বল্লভ অতিশয় মেধাবী এবং তীক্ষ্ণধী। অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি পুরাণে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া সবাই চমৎকৃত হইয়া যান। অতঃপর কৈশোরে উপনীত হইলে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য বল্লভ তিরুম্মল নামক দক্ষিণ দেশীয় এক প্রখ্যাত পণ্ডিতের শরণ নেন।

নারায়ণ দীক্ষিত ছিলেন সমকালীন বারাণসীর অন্যতম দিক্‌পাল পণ্ডিত। ইহার কাছেও বল্লভ ভট্ট জটিল দার্শনিক-তত্ত্বের মীমাংসা শ্রবণ করিতেন।

পিতা লক্ষ্মণ ভট্ট ছিলেন সত্যকার নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধক।

বালগোপাল বিগ্রহ নিত্য তাঁহার গৃহে পূজিত হইতেন এবং এই বালগোপালের ধ্যান মননের ফলে তাঁহার অশেষ কৃপাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ ভট্ট ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। একদিন পুত্রকে নিজ সকাশে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস বল্লভ, শাস্ত্রচর্চায় তোমার নিষ্ঠা ও কুশলতা দেখে আমি তৃপ্ত। তুমি আমাদের বংশের কৃষ্ণভক্তির শুভ-সংস্কার নিয়ে জন্মেছো। কৃষ্ণ উপাসনায় তুমি আগ্রহী, এটাও আমি সানন্দে লক্ষ্য ক'রে আসছি। এবার তুমি আমার কাছ থেকে কৃষ্ণমন্ত্র নাও, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণের সাধন ভজন শুরু করো, এই আমি চাই।"

ভক্তিভরে পিতার চরণে প্রণাম জানাইয়া বল্লভ কহিলেন, "এতো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আমায় আপনি দীক্ষা দিন, আর আশীর্বাদ করুন কৃষ্ণচরণে চিরদিন যেন আমার মতি থাকে, আর কৃষ্ণলাভ যেন আমার হয়।"

কিশোর পুত্রকে লক্ষ্মণ ভট্ট দীক্ষা দিলেন, আর দিলেন বিগ্রহের সমস্ত কিছু সেবা পূজার ভার।

পুত্রকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন ভট্ট, তারপর কহিলেন, "বৎস, তুমি অসামান্য প্রতিভাধর ছাত্র। বেদ বেদান্ত সাংখ্য ন্যায় অনেক কিছুই ইতিমধ্যে আয়ত্ত ক'রে ফেলেছো। এবার হতে একনিষ্ঠ হয়ে ভক্তিশাস্ত্রের চর্চা শুরু ক'রে দাও। বর্তমান কালে মাধবেন্দ্র যতি হচ্ছেন বৈষ্ণবশাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং কৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ। তুমি তাঁর কাছ থেকে বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র ও সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে নাও, তারপর নিজের জীবনে তা প্রতিফলিত ক'রে তোল। আরো একটা কথা শুনে রাখো, আমি শীঘ্রই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো।"

"একি মর্মান্তিক কথা বলছেন, পিতা?" কিশোর পুত্র বল্লভের নয়ন দুটি অশ্রু সজল হইয়া উঠে।

"হ্যাঁ বৎস। আমার জীবন-প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে।

এবার স্বাভাবিক নিয়মেই তা হবে নির্বাপিত।" প্রশান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন লক্ষ্মণ ভট্ট।

অতঃপর আর বেশী দিন তিনি মরদেহে অবস্থান করেন নাই। পুণ্যময় কাশীধামে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে ত্যাগ করেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস।

লক্ষ্মণ ভট্টের মৃত্যুর পর পত্নী যল্লামাগারু দিশাহারা হইয়া পড়েন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন সবাই বাস করেন সুদূর দাক্ষিণাত্যে। কাশীতে বাস করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে কোনো সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, পুত্র-কন্যাদের নিয়া বিজয়নগরে গিয়াই বাস করিবেন। সেখানে তাঁহার এক ভ্রাতা একজন উচ্চ রাজকর্মচারী, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিলে সন্তানদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান কোনোমতে চলিতে পারিবে। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই বল্লভ ও তাঁহার মাতা সবাইকে নিয়া বিজয়নগরে আসিয়া উপস্থিত হন।

পরিবারের সবাই স্থায়ীভাবে বিজয়নগরে বসবাস করিতে থাকেন বটে, কিন্তু বল্লভ এখানে কয়েক বৎসরের বেশী অবস্থান করেন নাই। তবে এইটুকু সময়ের মধ্যে শাস্ত্রচর্চার, বিশেষত বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়নের যে সুযোগ তিনি পান তাহা তাঁহার জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়।

কাশীতে বল্লভ বড় বড় অধ্যাপকের কাছে বেদ বেদান্ত, ষড়দর্শন প্রভৃতি পাঠ করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠের তেমন সুযোগ পান নাই। বিজয়নগরে আসার পর সে সুযোগ মিলিয়া গেল। রামানুজ, মধ্ব ও নিম্বার্কের মতবাদী বহু বৈষ্ণব আচার্যের বাস ছিল এই শহরে। হরিহর ও বুক্ক রায়ের রাজধানী ছিল তখনকার দিনে সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের আশ্রয়স্থল। এখানে শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদীরা যেমন পৃষ্ঠপোষকতা পাইতেন, তেমনি পাইতেন বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়। সব সম্প্রদায়ের সাধক ও আচার্যেরা ভারতের নানা অঞ্চল হইতে এখানে আসিয়া জুটিতেন,

শাস্ত্রচর্চাও তর্ক বিচারের ধূম পড়িয়া যাইত। দর্শন ও শাস্ত্রচর্চার তরুণ ছাত্র বল্লভ এই পরিবেশে বাস করিয়া অশেষভাবে উপকৃত হইলেন। নিজের জীবনে কিশোর বয়সে পিতার নিকট হইতে বৈষ্ণব সাধনার দীক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন ও অন্যান্য দর্শনের জটিল তত্ত্ব আয়ত্ত করার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। এবার বিজয়নগরের সারস্বত জীবনে সে সুযোগ তাঁহার উপস্থিত হইল।

রামানুজ, মধ্ব ও নিম্বার্কের মতবাদ দ্বারা এই সময়ে কিছুটা প্রভাবিত হইলেও বেশী পরিমাণে তিনি ঝুঁকিয়া পড়েন বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদের দিকে। কিন্তু দার্শনিকতার দিক হইতে বল্লভ ভট্ট বিষ্ণুস্বামীকে অনুসরণ করেন নাই, বরং নিজস্ব শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদকেই করিয়াছেন প্রতিষ্ঠিত।

লক্ষণীয় যে, বল্লভাচার্য তাঁহার নিজের কোনো গ্রন্থে বিষ্ণুস্বামীকে সম্প্রদায় প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বরং ভাগবত পুরাণের টীকায় নিজের ব্যাখ্যাকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছেন।[১]

কয়েক বৎসরের মধ্যেই বল্লভ ভট্ট বৈষ্ণবশাস্ত্রের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিচিত হইয়া উঠেন। তাঁহার সৌম্য সুন্দর মূর্তি, ভগবৎ-নিষ্ঠা ও ভক্তিবাদের মধুর ব্যাখ্যানে বহু নরনারী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ধীরে ধীরে এই তরুণ আচার্যকে কেন্দ্র করিয়া একটি কৃষ্ণভক্ত মণ্ডলী গড়িয়া উঠে।

উত্তর ভারতের নানা তীর্থে, বিশেষ করিয়া কাশী, প্রয়াগ, ব্রজমণ্ডল, পুষ্কর, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে বল্লভ ভট্ট কয়েকবার পরিব্রাজন করেন, বিস্তারিত করেন তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি।

দক্ষিণী বৈষ্ণব তীর্থসমূহ পুরী, তিরুপতি, শ্রীরঙ্গম, কাঞ্চী, মাদুরাই প্রভৃতি বল্লভ ভট্ট একাধিকবার দর্শন করিয়া বেড়ান। ভক্তিবাদী

---

১ অনেকের ধারণা বিষ্ণুস্বামী রুদ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণববাদের প্রবর্তক। আর বল্লভাচার্য তাঁহার মতবাদের পুনরুজ্জীবন সাধন করেন। এই ধারণার মূলে কোনো ভিত্তি নাই।

শাস্ত্রবিদ্ ও কৃষ্ণউপাসকরূপে এই নবীন আচার্যের খ্যাতি তখন চারিদিকে। এই সময়ে, বিশ বৎসর বয়সে বল্লভ ভট্ট বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কাশীর দক্ষিণী-পণ্ডিত দেব ভট্টের কন্যা মহালক্ষ্মী দেবীকে তিনি গ্রহণ করেন ধর্মপত্নী রূপে।

বিবাহের পর ছয়মাস বল্লভ কাশীধামে অবস্থান করেন, তারপর পূর্ব অভ্যাস মতো আবার বাহির হইয়া পড়েন পরিব্রাজন ও তীর্থ-পরিক্রমায়।

কুশলী শাস্ত্রবিদ্ ও তর্কযোদ্ধা ছিলেন বল্লভ ভট্ট, আবার মাধুর্যময় ভগবৎ-সাধনার উপর তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। এই আস্থা ক্রমে আরো দৃঢ় হইয়া উঠে এবং পূর্বসূরী বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বের বৈষ্ণবীয় মতবাদের কিছুটা বর্জন ও কিছুটা গ্রহণ করিয়া নিজস্ব এক বৈষ্ণববাদ তিনি গড়িয়া তোলেন।

এই মতবাদের প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে নবীন তাত্ত্বিক বল্লভ ভট্টের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি ছিল না। দূর দূরান্তের মঠে মন্দিরে, রাজসভা বা বিদ্বানমণ্ডলীতে যখন যেখানে শাস্ত্রবিচার বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হইত সদলবলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন। নিজস্ব ভক্তিবাদের প্রাধান্য স্থাপনে উৎসাহী হইয়া উঠিতেন।

ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ। নূতন হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরের বিজয়কেতন তখন সগর্বে উড্ডীন রহিয়াছে। মহারাজ কৃষ্ণদেব রায়ের প্রতাপ ও যশ-সৌরভ তখন শুধু দাক্ষিণাত্যেই নয়, সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত। রাজধানী বিদ্যানগরে মহারাজ এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করিয়াছেন। কৃষ্ণদেব নিজে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু তাঁহার পূর্বগামী রাজারা, হরিহর ও বুক্করায়, ছিলেন শৃঙ্গেরী মঠের অদ্বৈতবেদান্তী বীর সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যের শিষ্য। সামন্তরাজদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন শ্রীবৈষ্ণব আচার্যদের দ্বারা দীক্ষিত। কাজেই কৃষ্ণদেবের ধর্মসভায় সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না। দল মত নির্বিশেষে সকল শাস্ত্রবিদ্ ও সাধুসন্তকে তিনি আহ্বান জানাইতেন,

ধর্মীয় আলোচনা ও বিচারের মধ্য দিয়া জনগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চাহিতেন সত্যের আদর্শ ও নিহিতার্থ।

এই সময়ে বিদ্যানগরে ছয় মাসব্যাপী এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। উত্তর ভারতে কাশীর পণ্ডিত মহলেও এ সংবাদ পৌঁছে। নবীন আচার্য বল্লভ ভট্ট এই সভায় যোগদানের জন্য অতিমাত্রায় উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। প্রভাবশালী শিষ্যেরা তাঁহার যাত্রার সব ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে চলিল কয়েকজন ভক্ত ও সেবক, আর রহিল পবিত্র শালগ্রাম শিলা, শ্রীমুকুন্দ বিগ্রহ এবং পবিত্র ভাগবত।

দক্ষিণের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লভ অবশেষে বিজয়নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই রাজধানীতে পূর্বে তিনি বাস করিয়াছেন, উচ্চতর শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। মহারাজার দান-শালার অধ্যক্ষ সম্পর্কে তাঁহার মাতুল। এই মাতুলের গৃহেই দলবল নিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন বল্লভ ভট্ট।

কৃষ্ণদেব রায় তখন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি। শৌর্যে বীর্যে, ধনৈশ্বর্যে ও দাক্ষিণ্যে তাঁহার তুলনীয় তখন কেহ নাই।

এই হিন্দু রাজার সামরিক শক্তির গৌরব সম্পর্কে সিউএল লিখিয়াছেন, "নুয়েঁজ ছিলেন বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবের (অভ্যুদয় ষোড়শ শতক ১৯০৯-৩০) সমকালীন ঐতিহাসিক, তিনি সুস্পষ্ট লিখেছেন,—রায়চূড় দখলের যুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল সাতলক্ষ তিন হাজার পদাতিক সেনা। বত্রিশ হাজার ছয়শত অশ্ব এবং পাঁচশত একান্নটি সুশিক্ষিত হস্তী।[১]

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডঃ বেঙ্কটরমনাইয়া বিজয়নগর-রাজের বিদ্যোৎসাহ এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিভা সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন :

---

১ সিউএল : এ ফরগটন্ এম্পায়ার

২ ডঃ রমেশ মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত : হিস্ট্রী এণ্ড কালচার অব দ্য ইণ্ডিয়ান পিপল্ (ভল্যু ৬, দিল্লী, সুলতানেট্)

"কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিদ্যাবত্তার এক মহান্ পৃষ্ঠপোষক, তাঁর এই খ্যাতি সুপ্রচারিত ছিল দেশের দূরদূরান্তে। উৎসাহী জনসাধারণ তাঁর নামকরণ করেছিল—অন্ধ্র ভোজরাজ। আর তাঁর এই নাম-করণের সঙ্গে সংগতি রেখে তিনিও উদার দাক্ষিণ্যভরে মর্যাদা ও অর্থ দান করতেন তাঁর রাজসভায় সমাগত প্রখ্যাত পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক ও শাস্ত্রবিদ্‌দের। সংস্কৃত ও অন্যান্য সকল ভাষার লেখকদের সদাই তিনি পুরস্কৃত করতেন, কিন্তু তাঁর বদান্য হস্ত সদা উন্মুখ থাকতো বিশেষভাবে তাঁর অন্ধ্রদেশের তেলেগু ভাষী লেখকদের পৃষ্ঠপোষকতা দেবার জন্য। এর ফলে তাঁর সময়ে তেলেগু সাহিত্যের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছিল। রাজা সালুভ নরসিংহম্-এর সময় থেকে তেলেগু সাহিত্যের যে উন্নতি শুরু হয়েছিল, তা বিস্ময়কর বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন কৃতী কবি—অমুক্ত-মাল্যদ নামক কাব্যগ্রন্থ তাঁরই রচিত। বিদ্যোৎসাহী কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভার এক বড় বৈশিষ্ট্য তাঁহার 'অষ্টদিগ্‌গজ' মণ্ডলী। আটজন শীর্ষস্থানীয় কবি-সদস্য সগৌরবে বিরাজ করতেন এই মণ্ডলীতে।"

সারা ভারতের দার্শনিক, ধর্মনেতা সাহিত্যিক প্রভৃতি দ্বারা অলংকৃত ছিল বিজয়নগরের রাজসভা। আচার্য বল্লভ ভট্ট তাঁহার ভক্তিবাদী-দার্শনিক মতবাদ এই সভায় উপস্থাপিত করিলেন। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সহিত দীর্ঘদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইল তাঁহার তর্কযুদ্ধ। ব্যক্তিত্বের প্রখরতা, প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য এবং বৈষ্ণব দর্শনের পারঙ্গতায় বল্লভের তুল্য ব্যক্তি তৎকালে কমই ছিল। ফলে রাজসভায় তিনি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। তত্ত্ববিচারে উৎ-সাহী, ধর্মপরায়ণ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। নবীন আচার্যকে খুশী করিলেন প্রচুর সম্মান ও অর্থাদি দিয়া।

বল্লভ-দিগ্বিজয়ম-এ এবং ভক্তমালে লেখা আছে, আচার্য বল্লভ এসময়ে বিজয়নগর রাজসভার পণ্ডিতদের পরাস্ত করেন এবং সেখানকার বৈষ্ণব আচার্যের পদে বৃত হন।

বল্লভ দিগ্বিজয়ম্ গ্রন্থের এই উক্তি তেমন যুক্তিসহ নয়।[১] কারণ, বিজয়নগরের রাজসভায় তৎকালে আসিয়া জড়ো হইয়াছেন সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ এবং প্রবীণ দার্শনিক ও ধর্মাচার্যের দল। বিশেযত ভারতবিশ্রুত অদ্বৈতবেদান্তী অপ্পয় দীক্ষিতের পিতা রঙ্গরাজাধ্বরি এবং পিতামহ অচ্চান দীক্ষিত তখনো জীবিত। শুধু জীবিতই নন, তাঁহারা বরেণ্য সভাপণ্ডিত এবং রাজা ও সামন্তদের কাছে তাঁহারা অপরিসীম মর্যাদার অধিকারী।

সর্বোপরি কথা, অচ্চান দীক্ষিতকে কৃষ্ণদেব রায় দেবমানব জ্ঞানে পূজা করিতেন। সুকবি ও সুপণ্ডিত অচ্চানকে রাজা ভক্তিভরে নাম দিয়াছিলেন—বক্ষস্থল আচার্য। এই নামকরণের পশ্চাতে রহিয়াছে একটি মনোরম কাহিনী।

সেবার এক যুদ্ধ জয়ের পর কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার প্রিয় রাজ-মহিষীকে সঙ্গে নিয়া কাঞ্চীতে তীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছেন। কাঞ্চীর নিকটস্থ অড়য়প্পন পল্লীতে রাজপণ্ডিত অচ্চান দীক্ষিতের বাস। রাজা রানী ভক্তিভরে শ্রীবরদরাজের পূজা সম্পন্ন করিতে আসিয়াছেন, তাই পণ্ডিতবর অচ্চানও সেদিন সেখানে উপস্থিত।

রানী সৌন্দর্যে যেমন অতুলনীয়, আবার তেমনি ভক্তিপরায়ণা। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রভু বরদরাজের চরণে বার বার তিনি পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, এমন সময়ে রানীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবাবিষ্ট রাজপণ্ডিত অচ্চান রচনা করিলেন একটি অপরূপ শ্লোক[২]। এই শ্লোকের মর্মার্থ: কাঞ্চনবর্ণা লক্ষ্মীসদৃশা এক রমণীকে তাঁর নয়ন সমক্ষে আবির্ভূতা দেখে সংশয় জেগে উঠলো প্রভু

---

১ বল্লভ দিগ্‌বিজয়ম্-এর রচনা বল্লভ ভট্টের পৌত্র যদুনাথজীর নামে আরোপিত। কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা একথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে বহু অলীক কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে।

২ কাঞ্চিৎ কাঞ্চনগৌরাঙ্গীং বীক্ষ্য সাক্ষাদিবশ্রিয়ম্।
বরদঃ সংশয়াপন্নো বক্ষস্থল মবৈক্ষত॥

শ্রীবরদরাজের মনে। দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন নিজের বক্ষস্থলে, লক্ষ্মী সেখানে বিরাজিত রয়েছেন তো ?

রানী লক্ষ্মীর মতো দিব্যই সৌন্দর্যের অধিকারিণী—শ্লোকটিতে রহিয়াছে এই তত্ত্বেরই আভাস। অপূর্ব কাব্যরসাশ্রিত এই শ্লোক শুনিয়া রাজা কৃষ্ণদেব আনন্দে উৎফুল্ল। তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধেয় রাজপণ্ডিতকে পুরস্কৃত করিলেন, দান করলেন এক নূতন উপাধি—বক্ষস্থল-আচার্য। প্রভু বরদরাজের বক্ষলগ্না লক্ষ্মীদেবীর তত্ত্বকে আচার্য আভাসিত করিয়াছেন তাঁহার অনুপম ঐ শ্লোকে, তাই রাজার আনন্দের যেন অবধি নাই।

অপ্পান দীক্ষিত, রঙ্গরাজাধ্বরি ছাড়া আরো বহু কেবলাদ্বৈতবাদী পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী বিজয়নগরে সগৌরবে বাস করিতেন। তাছাড়া, সেখানে রামানুজী এবং মাধ্ব দার্শনিক ও সাধক যেমন প্রচুর সংখ্যায় বাস করিতেন, তেমনি ছিলেন ন্যায় ও সাংখ্যমতবাদী পণ্ডিতবর্গ। এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া তরুণ পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট তর্কযুদ্ধে জয়ী হন এবং তাঁহার প্রেমভক্তি রসাশ্রিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন, একথা মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়।[১] তবে বল্লভ যে নিজের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের বলে রাজসভায় পুরস্কার ও অভিনন্দন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই অনুমান করা যায়।

বিজয়নগরের বিদ্যাবিতর্কের পরিবেশে কিছুদিন অতিবাহিত করার পরে বল্লভ ভট্ট শিষ্যগণসহ উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে পুণ্যতোয়া শিপ্রানদীর তটে কিছুকাল অবস্থান করিয়া নিজস্ব ভক্তিবাদ তিনি প্রচার করেন। এই স্থানটি তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ের কাছে বৈঠক নামে পরিচিত। আচার্য এখানে উপদেশ দান ও তত্ত্বালোচনায় ব্রতী হন, তাই তাঁহাদের চোখে এ স্থানটি অতি পবিত্র ও দর্শনীয়।

উত্তর ভারতে চুনারের কাছেও আচার্য এমনি আরেকটি বৈঠক

১ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী : বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

স্থাপন করেন এবং এই প্রচার কেন্দ্রে বসিয়া বহু নরনারীকে তিনি তাঁহার ভক্তিপথের সন্ধান জ্ঞাপন করেন। এ স্থানের একটি প্রাচীন মঠ এবং আচার্যকুঁয়া এখনো বল্লভ ভট্টের পুরাতন স্মৃতির সংবাহক রূপে দণ্ডায়মান।

ত্রিবেণী অঞ্চলে এক সময়ে বহু নরনারী বল্লভের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহাদের অনুরোধে পবিত্র সঙ্গমের নিকটে আড়েল নামক গ্রামে আসিয়া তিনি সপরিবারে বাস করিতে থাকেন।

দুইটি প্রধান সংকল্প সাধনের জন্য বল্লভ ভট্ট এতকাল ধরিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতেছেন। প্রথমত শংকরের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া নিজস্ব শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ তিনি স্থাপন করিবেন। দ্বিতীয়ত শ্রীশ্রীবালগোপালের উপাসনার এক প্রকৃষ্ট প্রণালী তিনি প্রবর্তন করিবেন ভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব নরনারীর কাছে। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে দার্শনিক মহলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দরকার। তাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার না করিলে সাধারণ মানুষ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিতে আসিবে কেন? তাই স্থির করিলেন, প্রচুর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়া ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য তিনি রচনা করিবেন। আর করিবেন শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভক্তিরসাশ্রিত একটি নিজস্ব টীকা রচনা। এই দুইটি কর্মকে বল্লভ ভট্ট জ্ঞান করিতেন ঈশ্বরীয় কর্ম বলিয়া তাই অচিরে এই দুরূহ ব্রত সাধনে তিনি তৎপর হইয়া উঠিলেন।

আড়েলের নিভৃত পরিবেশে বসিয়া আচার্য তাঁহার শাস্ত্র ভাষ্য রচনায় ব্যাপৃত, এমন সময়ে অনতিদূরে প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন এক নবীন সন্ন্যাসী। যেমন তাঁহার নয়ন-ভোলানো দিব্যরূপ তেমনি তাঁহার কীর্তনের মোহিনী শক্তি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া এই প্রেমিক পুরুষ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠেন, হাজার হাজার ভক্ত নরনারী তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরে, হরিনামে সবাই উন্মত্ত হইয়া উঠে।

সন্ন্যাসী যখন ভাবাবেশে অচেতন হইয়া পড়েন তখন দেখা

যায় এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অশ্রু, স্বেদ, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্ট-সাত্ত্বিক প্রেমবিকার জাগিয়া উঠে তাঁহার সারা দেহে। কৃষ্ণার্তি আর কৃষ্ণরতির এই বৈভব দেখিয়া জনসাধারণ মুগ্ধ হয়, প্রেমে উদ্বেল হয়। ঘন ঘন শোনা যায় হরিধ্বনি, আর প্রেমিক সন্ন্যাসীর জয়গানে আকাশ বাতাস হয় মুখরিত।

প্রয়াগে সন্ন্যাসীর এই অপরূপ প্রেমভক্তির কথা, সম্মোহনকারী উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তনের কথা, বল্লভ ভট্ট লোকমুখে শুনিয়াছেন। একদিন শিষ্যগণ সহ প্রেমিক সন্ন্যাসীটিকে দর্শন করিলেন। পরিচয়ে জানিলেন, নাম তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পরম ভাগবত মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়াছেন, আর সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়াছেন কেশব ভারতী।

ত্রিবেণীর তীরে এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণের গৃহে শ্রীচৈতন্য তখন অবস্থান করিতেছেন। গৌড় বাদশাহের কোষাধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়া দিয়া মুমুক্ষু রূপ তখন প্রয়াগে আসিয়াছেন, আশ্রয় নিয়াছেন তাঁহার চরণতলে। সঙ্গে আছেন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ দেব। দুই ভাই প্রভুর সম্মুখে দৈন্যভরে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভুকে দর্শন করিতেছেন আর ভাবসিন্ধু হৃদয়ে উথলিয়া উঠিতেছে, নয়নের নীরে ভিজিয়া নিরন্তর জপিয়া চলিয়াছেন কৃষ্ণনাম।

শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইবার পর বল্লভ ভট্ট তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান, "সন্ন্যাসীবর, একবার আড়েল গ্রামে আমার গৃহে পদধূলি দিন, সেখানেই গ্রহণ করুন বালগোপালজীর ভোগ প্রসাদ।"

সানন্দে সম্মতি দিলেন শ্রীচৈতন্য। সম্মুখে দণ্ডায়মান দুই দীন বৈষ্ণব রূপ ও তাঁহার অনুজের সঙ্গে ভট্টজীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। কহিলেন, "ভট্টজী, এরা আমার পরম স্নেহের পাত্র। কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য উন্মত্ত হয়ে, ধনৈশ্বর্য ও রাজপদ ছেড়ে এরা আমার এখানে ছুটে এসেছেন। এরা দু'জনেও যাবেন আমার সঙ্গে, প্রসাদ পাবেন আপনার গৃহে।"

বল্লভ ভট্ট মহা আনন্দিত। দুই বাহু প্রসারণ করিয়া রূপকে

আলিঙ্গন দিতে গিয়াছেন, তিনি কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভট্টজী, আপনি দূরে থাকুন আমাদের দু' ভাইকে যেন স্পর্শ করবেন না। আমরা অস্পৃশ্য, অতি দুরাচার।"

প্রভু শ্রীচৈতন্য কপট হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ভট্টজী, ওরা হয়তো ঠিক কথাই বলেছে। ওরা হীন জাতি, আর আপনি হচ্ছেন উচ্চ বর্ণের যজুর্বিদ্ বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্তান। তাছাড়া, আচার্য হিসাবেও আপনি বহুজনের শ্রদ্ধাভাজন। তবে, ওদের সম্বন্ধে একটা কথা অবশ্যই বলতে পারি, ওরা দু' ভাই নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছে, আর ভাগ্যবলে আমি তা শুনে তৃপ্ত হচ্ছি।"

ভট্ট স্মিত হাস্যে উত্তর দিলেন, "যতিবর, তা হলে আপনি এদের অধম বা হীন বলছেন কি ক'রে? যাদের মুখ থেকে সদাই ঝরে পড়ছে কৃষ্ণনামের সুধা, তারা যে সর্বোত্তম।"

প্রভু ও তাঁহার সঙ্গীদের নিয়া ভট্ট নৌকায় উঠিয়াছেন, গৃহে নিয়া তাঁহাদের ভোজন করাইবেন। কিন্তু কৃষ্ণনামরসে উন্মত্তপ্রায় প্রভুকে নিয়া বড় বিপদে পড়া গেল।

শ্রীচৈতন্যের এসময়কার ভাববিকারের চিত্রটি ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে অমর হইয়া আছে :

> যজুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল।
> প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
> হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ।
> প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ॥
> অ্যস্তেব্যস্তে সবে ধরি প্রভুরে উঠাইলা।
> নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
> মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
> ডুবিতে লাগিল নৌকা ঝলকে ভরে জল॥
> যদি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য হইল মন।
> দুর্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥

দেশ কাল পাত্র দেখি মহাপ্রভুর ধৈর্য হইল।
আড়েলের ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল ॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া।
নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গেতে লইয়া ॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনি করিল প্রভুর পাদ প্রক্ষালন ॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন বহির্বাস পরাইল ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্যের মান্য করি পাক করাইল ॥
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে।
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাইর করাইল ভোজনে।

(চৈ-চরিতামৃত)

'দুর্বার উদ্ভট' এই কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণার্তির এই বিচিত্র প্রকাশ সেদিন আচার্য বল্লভ ভট্টের হৃদয়মূলে নাড়া দেয়, তাঁহাকে প্রভাবিত করে অশেষভাবে।

প্রসাদান্ন ভোজনের শেষে শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময়ে সেখানে ত্রিহুতের পরম বৈষ্ণব পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত।

প্রভুর চরণ বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর আদেশ হইল, "উপাধ্যায়, কৃষ্ণ যখন কৃপা ক'রে তোমায় এখানে এনে দিয়েছেন তো তোমার রচিত কৃষ্ণের বর্ণনা আমায় শোনাও, এ জীবন সার্থক করি।

কৃষ্ণলীলার সুমধুর শ্লোক রচনা করিয়াছেন রঘুপতি উপাধ্যায়। সানন্দে প্রভুকে তাহা শুনাইতে লাগিলেন। এ শ্লোকের মর্ম :

সংসার ভয়ে ভীত হয়েছেন যাঁরা, তাঁরা কেউ বা শ্রুতি, কেউ বা স্মৃতি, আর কেউ বা মহাভারতের উপদেশ অনুসারে চলতে থাকুন।

আমি কিন্তু একান্ত মনে বন্দনা জানাই নন্দকে, যাঁর অলিন্দে বাঁধা রয়েছেন স্বয়ং পরব্রহ্ম!

প্রভু প্রেমের উচ্ছ্বাসে উদ্বেল। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "ধন্য ধন্য তুমি উপাধ্যায়। কি পরম তৃপ্তিকর শ্লোক আমায় আজ শোনালে। উপাধ্যায়, আরো, আরো লীলাকথা আমায় শোনাও।" বলিতে বলিতে প্রভুর সারা দেহে জাগিয়া উঠিল সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। প্রেমের এই ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দেখিয়া রঘুপতি উপাধ্যায় তো বিস্ময়ে হতবাক্। বল্লভ ভট্টও কৃষ্ণরতির এই প্রকাশ ও ভাবশাবল্য দেখিয়া নির্নিমেষে শ্রীচৈতন্যের দিকে চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-উন্মাদনা তো কত বৈষ্ণব আসরেই দেখি—কিন্তু এমন দেবদুর্লভ দৃশ্য তো কোথাও দেখি নাই!

একটু স্থির হইয়া উপাধ্যায়ের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন শুরু করিলেন:

প্রভু কহে উপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধ্যায়॥
শ্যাম রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'বয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়ং' কহে উপাধ্যায়॥
রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায়।
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥
প্রভু কহে ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি শ্লোক পড়ে গদ্‌গদ স্বরে॥

প্রভু শ্রীচৈতন্যের মুখে এবার উচ্চারিত হইল তাঁহার ধ্যেয় পরমবস্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত তত্ত্ব:

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥

বল্লভ ভট্টের উপাস্য বালগোপাল। সন্ন্যাসীর মুখে ব্রজকিশোর

নটবর কৃষ্ণের মাধুর্য ও শৃঙ্গার রসের প্রশস্তি শুনিয়া তিনি তখন চমৎকৃত, আত্মবিস্মৃত।

এ সময়ে প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দিব্য আনন্দধারা উথলিয়া উঠিল বল্লভ ভট্টের দেহে মনে। ভাববিহ্বল হইয়া তিনিও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীচৈতন্যের দিব্য মূর্তি ও প্রেমোচ্ছ্বাস ইতিমধ্যে সারা গ্রামের লোককে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। বল্লভ ভট্টের গৃহে বসিয়া গিয়াছে আনন্দের হাট। অনেকেই চাহিতেছেন, এই আনন্দঘন প্রেমোন্মত্ত সন্ন্যাসী আরো কয়েকদিন এখানে অবস্থান করুন তাঁহাদের গৃহে কৃপা করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

বল্লভ ভট্ট প্রমাদ গণিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার নিমন্ত্রিত অতিথি, ইহার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁহারই। প্রেমোন্মত্ত হইয়া কখন কোথায় তিনি পড়িয়া যান, যমুনার জলে কখন ঝাঁপ দেন, তাহার কোনো স্থিরতা নাই। ভট্ট সবাইকে সানুনয়ে কহিলেন, "সন্ন্যাসীকে আগে আমি তাঁর প্রয়াগের আবাসে ফিরিয়ে দিয়ে আসি, নিশ্চিন্ত হই, তারপর তোমরা সেখানে গিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ দাও।"

সেই দিনই তাড়াতাড়ি শ্রীচৈতন্যকে নিয়া ভট্ট প্রয়াগে উপস্থিত হন, তাঁহাকে স্বস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

আড়েল গ্রামে এক সাধারণ গৃহস্থ ও ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করিতেন বল্লভাচার্য। গ্রামে তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তের সংখ্যা কম ছিল না। ইহাদের সম্মুখে প্রতিদিন তিনি ভাগবত পুরাণ পাঠ করিতেন, তাঁহার নিজস্ব মতবাদ অনুযায়ী করিতেন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। নূতন একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠনের ইচ্ছা তাঁহার মনে দীর্ঘদিন যাবৎ জাগিয়া আছে। ঐ ইচ্ছাকে রূপায়িত করার প্রস্তুতি পর্ব এবার অগ্রসর হয়।

তীর্থ দর্শন ও পরিব্রাজনে বল্লভ ভট্ট ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। সুযোগ পাইলেই ভক্তবৃন্দসহ তিনি বৈষ্ণব তীর্থগুলি দর্শন করিতেন,

বিভিন্ন পন্থী বৈষ্ণব আচার্য ও সাধকদের জীবন্ সাধনা এবং দার্শনিকতার তাৎপর্য অনুধাবন করিতেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি তিনি কয়েকবার দর্শন করেন এবং সে সব স্থানের অভিজ্ঞতা ও সাধু সন্তদের অধ্যাত্ম সাধনার আলোকে নিজের মতবাদকে ক্রমে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলেন।

নানা স্থানে পরিব্রাজন করিতে করিতে বল্লভ ভট্ট সেবার মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরে আসিয়াছেন। এখানকার বিঠোবা মন্দিরে উপস্থিত হইবার পর তাঁহার মানসিকতা ও জীবনদর্শনে এক নব রূপান্তর ঘটিয়া গেল।

পান্ধারপুরের বিঠ্ঠলজী এক জাগ্রত বিগ্রহ। এই বিগ্রহের আবির্ভাবরহস্য প্রাচীন সাধকদের মুখে শ্রবণ করেন বল্লভ ভট্ট।

প্রাচীনকালে পাণ্ডুরঙ্গ নামে এক যুবক ব্রাহ্মণ পান্ধারপুরে বাস করিত। একদিন শোনা গেল, একদল তীর্থকামী ভক্ত গঙ্গাতীরে কাশীধামে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছে। পাণ্ডুরঙ্গ এই দলের সহিত ভিড়িয়া যায়।

আসলে ধর্মলাভ বা পুণ্যসঞ্চয়ের কোনো ইচ্ছা তাহার নাই, তীর্থচারীদের দলে আসিয়া জুটিয়াছে তাহার কুকার্য সিদ্ধির জন্য। সে জানে, দূরগামী সব যাত্রীর সঙ্গেই যথেষ্ট টাকাকড়ি থাকে, তাই মনে মনে অভিসন্ধি আঁটিল, পথে কোনো সুযোগে ঐ টাকাকড়ি সে অপহরণ করিবে।

যাত্রীদল কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাত্রে এক জায়গায় বিশ্রাম নিতেছে, এ সময়ে পাণ্ডুরঙ্গ সেখান হইতে সরিয়া পড়ে, নিকটস্থ এক অরণ্যে করে আত্মগোপন। উদ্দেশ্য, রাত্রির অন্ধকারে ছদ্মবেশে হঠাৎ সে মারণাস্ত্র নিয়া তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করিবে, উধাও হইবে টাকাকড়ি ছিনাইয়া নিয়া। সঙ্গীরা ভাবিবে, স্থানীয় কোনো ডাকাত তাহাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া নিল।

ঘন অরণ্যের এক পাশে পাণ্ডুরঙ্গ লুকাইয়া আছে, হঠাৎ দেখা গেল, সুবেশ ধারিণী দুই রমণী বনপথ দিয়া সেদিকে আসিতেছে।

হাতে তাহাদের জ্বলন্ত মশাল, আর মাথায় একটি করিয়া সুদৃশ্য মৃৎভাণ্ড।

পাণ্ডুরঙ্গ বড় কৌতূহলী হইয়া উঠে। এই দুর্গম বিপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া দুইটি নারী কোথায় চলিয়াছে ?

সম্মুখে আসিয়া প্রশ্ন করে, "তোমরা কে গো ? এসময়ে এপথ দিয়ে কোথায় চলেছো ? মাথায়ই বা কি বয়ে নিয়ে চলেছো ?"

প্রথমা রমণী উত্তর দেয়, "আমরা যে রোজই এসময়ে এ বনপথ দিয়ে যাইগো। আমার নাম গঙ্গা, আর আমার সঙ্গিনী—যমুনা। আমাদের যেতে হয় পান্ধারপুরে। সেখানে এক ভক্তিসিদ্ধ ব্রাহ্মণ তনয় রয়েছেন, তাঁকে এই দু' ভাঁড় জল দিয়ে আসতে হয়।"

"কেন ?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে পাণ্ডুরঙ্গ।

"সে যে মহা পুণ্যবান্ গো। সারা জীবন ধরে একনিষ্ঠ হয়ে তার বৃদ্ধ বাবা-মার সেবায় প্রাণপাত করছে। শ্রীভগবানকে জানিয়ে দিয়েছে, তীর্থস্নানে যাবার অবসর নেই, পিতামাতার চরণই তাঁর কাছে সর্বতীর্থের তুল্য। শ্রীভগবানও মেনে নিয়েছেন ভক্তের এই সঙ্কল্প। আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে, ব্রাহ্মণ তনয়কে আমরা যেন প্রতি রাতে দু' ভাঁড় ক'রে গঙ্গা যমুনার পুণ্যবারি পৌছে দিয়ে আসি। তাই তো রোজ আমাদের এই জল বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে।"

"পিতামাতার সেবা কি এমনিতর পুণ্যকর্ম ? এমনি সর্বসিদ্ধিপ্রদ ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে পাণ্ডুরঙ্গ।

"হ্যাঁ গো তাই। রাম অবতারে ভগবান নিজেই তো তা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন চোখে আঙুল দিয়ে। বাপ মায়ের সেবাতেই শ্রীভগবান তুষ্ট হন, সফল করেন সর্ব অভীষ্ট।"

কথা কয়টি বলিতে বলিতে গঙ্গা যমুনা রূপিণী নারীদ্বয় বনের ভিতরে ঢুকিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

দৈবী উপদেশের ফল ফলিতে দেরি হয় নাই। পাণ্ডুরঙ্গের জীবনে ঘটিয়া যায় এক অভাবনীয় পটপরিবর্তন। এতকালের পাষণ্ডী এবার রূপান্তরিত হয় পরম ভক্তিমান্ পুত্ররূপে।

সেই রাত্রেই পান্ধারপুরে সে ফিরিয়া আসে। অনুশোচনার তীব্র দহন চলিতে থাকে তাহার অন্তরে। পিতামাতার কোনো সেবা করা দূরে থাকুক, সারা জীবন সে তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়াছে, চৌর্য দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি কোনো পাপানুষ্ঠানই সে বাকী রাখে নাই, নিজের জীবনকে নিক্ষেপ করিয়াছে নরকের কুণ্ডে।

এবার হইতে পরম নিষ্ঠাভরে পিতামাতার সেবায় সে ব্রতী হয়। তাঁহার দৃষ্টিতে পিতামাতাই সর্ব দেবদেবীর মূর্ত বিগ্রহ, তাঁহাদের চরণেই সব তীর্থের পুণ্যফল।

বারো বৎসর ধরিয়া চলে তাঁহার এই একনিষ্ঠ তপস্যা। তারপর নয়ন সমক্ষে উন্মোচিত হয় দিব্য চৈতন্যের আলো। এই আলোর সরণি বাহিয়া একদিন পাণ্ডুরঙ্গের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান প্রভু নারায়ণ। কুটির দুয়ারে আসিয়া করেন করাঘাত।

পাণ্ডুরঙ্গ তখন নিবিষ্ট মনে পিতৃদেবের পাদ সম্বাহন করিতেছেন। একটি হাত সেবাকার্যে লিপ্ত রাখিয়া অপর হাতে কুটিরের দ্বার কিছুটা উন্মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "প্রভু, আমি দুঃখিত, আপনাকে যে কিছুকাল বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। পিতা আপনারই মূর্ত বিগ্রহ, তাঁর চরণসেবা এখনও শেষ হয় নি। শেষ হলেই আপনার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করবো, জ্ঞাপন করবো যথাযোগ্য সম্বর্ধনা।"

স্নিগ্ধ মধুর হাসি ছড়াইয়া নারায়ণ তাঁহার প্রিয় ভক্তকে কহিলেন, "বৎস পাণ্ডুরঙ্গ, তুমি তোমার সেবাকর্ম আগে শেষ করো, আমি বাইরেই তোমার প্রতীক্ষায় রইলাম।"

পাদ সম্বাহন শেষ হইলে পাণ্ডুরঙ্গ কুটিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর শুরু করেন প্রভুর স্তুতি গান, দুই কপোল বাহিয়া ঝরিতে থাকে আনন্দাশ্রু।

প্রভু নারায়ণ প্রেমভরে কহেন, "পাণ্ডুরঙ্গ পিতৃসেবা আর ঈশ্বর-সেবাকে একীভূত ক'রে তুমি তপস্যার যে মহান্ পথ দেখিয়েছো, তা আমার ভক্তদের পথ দেখাবে চিরকাল। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন। বল, তুমি কি বর চাও।"

করজোড়ে নিবেদন করেন পাণ্ডুরঙ্গ, “প্রভু, যদি বর দিতেই চাও, তবে আমার এই পিতৃসেবার ধর্মকেই তুমি জীবন্ত ক'রে রাখো। আমার এই সেবা-তপস্থার ফলস্বরূপ তুমি চির আবির্ভূত থাকো আমার গৃহে। আর তোমার শ্রীবিগ্রহ ধারণ করুক আমার মতো দীন পিতৃভক্ত পাণ্ডুরঙ্গেরই নাম।”

সানন্দে প্রভু কহিলেন, “তথাস্তু”।

সেইদিন হইতে পান্ধারপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রভুর শ্রীবিগ্রহ, তাঁহার নামকরণ হয়—পাণ্ডুরঙ্গ বিঠ্‌ঠলনাথ।

বিঠ্‌ঠলনাথজীর এই লীলাকাহিনী আচার্য বল্লভ ভট্টের জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। গার্হস্থ্য জীবনকে দিব্য জীবনে, কৃষ্ণময় জীবনে পরিণত করা—এই তত্ত্বকেই তিনি তাঁহার সাধনজীবন ও দার্শনিকতায় আঁকড়িয়া ধরেন।

জনশ্রুতি আছে, পান্ধারপুরে অবস্থান করার কালে বল্লভ ভট্ট বিঠ্‌ঠলনাথজীর প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন—“এবার বিবাহ ক'রে তোমায় সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে হবে, সংসারকে ক'রে তুলতে হবে শ্রীভগবানের সংসার।”

বিবাহের পর বল্লভ কিছুদিন কাশীধামে বাস করেন। ভাগবতের নূতনতর ব্যাখ্যা, এবং তাঁহার নিজস্ব ভক্তিবাদ এসময়ে বহু লোককে আকৃষ্ট করিতে থাকে। এই সব ভক্তদের মিলনে বল্লভ ভট্টের গৃহ-প্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠে।

কিন্তু বল্লভের প্রচারিত বৈষ্ণবীয় মতবাদ কাশীর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের মনঃপূত হয় নাই। নানাভাবে তাঁহারা এই নূতন মতবাদী আচার্যের বিরোধিতা করিতে থাকেন।

বল্লভ বুঝিলেন, আর বেশীদিন তাঁহার কাশীধামে থাকা সম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে প্রয়াগের নিকটবর্তী আড়েল গ্রামের কয়েকটি ভক্ত গৃহস্থ তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের আমন্ত্রণে বল্লভ ভট্ট স্থায়ীভাবে সেখানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এসময়ে তাঁহার আচার্য জীবনের প্রধান কাজ ছিল, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভাগবত পুরাণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা এবং ভাগবতের একটি নূতন টীকা রচনা করা। এই টীকাই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সুবোধিনী টীকা। কালক্রমে ইহাই পরিণত হয় তাঁহার সম্প্রদায়ের দার্শনিক ভিত্তিরূপে।

ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার পবিত্র স্থানগুলি দর্শনের জন্য বল্লভ ভট্ট আড়েল হইতে প্রায়ই বাহির হইয়া পড়িতেন। বিশেষ করিয়া ব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলগুলিই এসময়ে হইয়া দাঁড়ায় তাঁহার জীবনের প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু।

সে-বার বল্লভ ভট্ট কয়েকজন ভক্তসহ গোবর্ধন পরিক্রম করিতে আসিয়াছেন। এখানে আসার পর দৈবযোগে এমন এক ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহা বল্লভ ভট্টের সাধনজীবনে ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়াছে।

এবারকার তীর্থ পরিক্রমাকালে বল্লভ ভট্ট গোবর্ধননাথজীর শ্রীবিগ্রহের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এবং এই শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজার সুবিধার জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। বল্লভ সম্প্রদায়ের মতে, দেববিগ্রহ দেবতারই স্বরূপ, এবং এই স্বরূপের সেবা ও অর্চনার মধ্য দিয়াই ভক্ত সাধকেরা কৃষ্ণের কৃপা ও সাযুজ্য লাভ করেন। ঐতিহাসিক দিক হইতে দেখা যায়, গোবর্ধননাথজীর প্রাকট্য ও সেবার্চনার পর হইতেই বল্লভ সম্প্রদায়ের প্রচার ও প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ধর্ম-জীবনে ইহা এক বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া বসে।

গোবর্ধননাথজীর আত্মপ্রকাশ ঘটে তাঁহার এক অত্যাশ্চর্য দৈবী-লীলার মাধ্যমে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে আজিও এ সম্পর্কে এক জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে।

গোবর্ধননাথের মূর্তিটি শ্রীকৃষ্ণের। দিব্য লাবণ্যে মণ্ডিত এই অপরূপ মূর্তির দক্ষিণ হাতটি বরাভয় দানের ভঙ্গিতে উত্তোলিত। দেবরাজ ইন্দ্রের রোষ হইতে ব্রজবাসীদের বাঁচানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হস্ত

দ্বারা অবলীলায় গিরিগোবর্ধনকে শূন্যে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ধ্বংসকর বর্ষণ ও বজ্রের হাত হইতে গোপ-গোপীরা রক্ষা পাইয়াছিল। ভক্ত বৈষ্ণবেরা মনে করেন, গোবর্ধননাথজীর হস্ত উত্তোলনের মধ্যে ভক্ত-সংরক্ষণের সেই চিহ্নটি প্রকটিত।

জনশ্রুতি আছে, গিরিগোবর্ধনের গাত্র ভেদ করিয়া প্রথমে এই শিলাময় শ্রীবিগ্রহের একটি হস্ত প্রকাশিত হয়। তারপর ক্রমে শিলা-শরীরের অন্যান্য অংশ দৃশ্যমান হয়।

গোবর্ধন পাহাড়ের আড়ালে এই মূর্তি দীর্ঘকাল পড়িয়াছিল। নিকটেই আনিওরা গ্রাম। এই গ্রামের মানেকচাঁদ ও সদু পাণ্ডে নামক দুই ভক্তিমান্ গোয়ালা বাস করিত। ইহাদের একটি গাভী প্রতিদিন গোপনে আসিয়া নব প্রকাশিত বিগ্রহের মাথার কাছে দাঁড়াইত এবং কিছুটা পরিমাণ দুগ্ধ বাঁট হইতে ক্ষরিত হইলে নিজের গোয়ালে ফিরিয়া যাইত।

ঐ গাভীর দুগ্ধ হ্রাস পাইতে দেখিয়া গোয়ালাদের মনে সন্দেহ জাগিয়া উঠে। তবে কি গোপনে কেহ দুগ্ধ চুরি করিতেছে?

একদিন দূর হইতে তাহারা দুই ভাই গাভীটিকে অনুসরণ করিতে থাকে, উপস্থিত হয় শিলা বিগ্রহের কাছে। গাভীর দুগ্ধদানের এই দৃশ্য দেখিয়া উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যায়।

সেই দিনই রাত্রে প্রভু গোবর্ধননাথ মানেকচাঁদ ও সদু পাণ্ডেকে স্বপ্নযোগে আদেশ দেন, "তোদের ঐ গাভী নন্দরাজের গোয়ালার গাভীর বংশ থেকে উদ্ভূত। ওর দুধই আমার প্রিয়। তোরা প্রতিদিন নিজহাতে দুধ দুইয়ে আমার ভোগ দিলে আমি প্রসন্ন হবো।"

আদেশ মতো গোপভ্রাতৃদ্বয় প্রতিদিন এই শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতে থাকে।

অতঃপর গোবর্ধন অঞ্চলে আবির্ভূত হন মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্র পুরী। গোপ-ভ্রাতাদের সেবিত শ্রীবিগ্রহের জন্য তিনি একটি কুটির নির্মাণ করান, বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠানযুক্ত সেবা পূজার প্রবর্তন করেন।

এই পবিত্র শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া বল্লভ ভট্ট আনন্দে আত্মহারা হইয়া যান। নিজ ভক্তদের মাধ্যমে গোবর্ধননাথজীর মাহাত্ম্য সর্বত্র তিনি প্রচার করেন এবং একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ঠাকুরকে করেন সংস্থাপন।

শ্রীবিগ্রহের পূজার ভার দেওয়া হয় গৌড়ীয়া ভক্ত ব্রাহ্মণদের উপর, আর বল্লভ ভট্টের দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য, কৃষ্ণদাস ও কুম্ভনদাস নিয়োজিত হন ঠাকুর এবং তাঁহার মন্দিরের সেবাকর্মে।

কয়েক বৎসর পরে পূরণমল নামক এক ধনী ব্যবসায়ীর উপর গোবর্ধননাথজীর স্বপ্নাদেশ হয়, "দেশ দেশান্তর থেকে এত ভক্ত আসছে আমার দর্শনে, অথচ তোমরা আজ অবধি আমার সেবা পূজার জন্য একটা বড় মন্দির নির্মাণ করতে পারলে না! তুমিই এ কাজের ভার নাও, আমায় একটা নূতন বড় মন্দিরে স্থাপন করো।"

এ প্রত্যাদেশ পূরণমল সানন্দে গ্রহণ করে। এবং বহু অর্থব্যয় ক'রে সুদৃশ্য ও বৃহৎ এক মন্দির সে নির্মাণ ক'রে গিরিগোবর্ধনের উপর। এই মন্দিরের কাজ পূর্ণ হয় প্রায় বিশ বৎসরের ব্যবধানে। ততদিন শ্রীবিগ্রহের সেবা পূজা বল্লভ ভট্টের নির্মিত মন্দিরেই সুসম্পন্ন হইতে থাকে।

ডঃ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের মতে, গোবর্ধননাথজীর আত্মপ্রকাশ ও শ্রীমন্দিরে সংস্থাপনের পর হইতেই বল্লভাচার্যের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়; বিশেষত ব্রজমণ্ডল, রাজপুতানা ও গুজরাটে তাঁহার মতবাদের প্রসার ঘটে।

পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণের ভয়ে গোবর্ধননাথজীর এই বিগ্রহ ব্রজমণ্ডলে রাখা সম্ভব হয় নাই। এটিকে সরাইয়া নিয়া স্থাপন করা হয় উদয়পুরের নিকটস্থ নাথদ্বারার নূতন মন্দিরে। আচার্য বল্লভ ভট্টের জীবিত কালেই ইহা করা হয়।

---

১ ডঃ আর. জি. ভাণ্ডারকর: বৈষ্ণবিজম্, শৈবিজম্ অ্যাণ্ড মাইনর রিলিজিয়াস সিস্টেমস্।

বল্লভের সাধনায় ও দার্শনিকতায় ভাগবত পুরাণ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভাগবতের মধ্য দিয়াই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যেকার অচ্ছেদ্য জন্ম-সম্বন্ধের তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, বেদ বেদান্ত সংকলন করার পরও ব্যাসদেব তৃপ্ত হন নাই, তাই ভাগবত রচনা করিয়া, কৃষ্ণলীলারসের বিস্তার সাধন করিয়া, জীবকে তিনি প্রকৃত পরম পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

ভাগবত সপ্তাহ বা ভাগবত পুরাণের সপ্তাহব্যাপী ব্যাখ্যান বল্লভাচার্যের সম্প্রদায়ের এক অতি অবশ্য কর্তব্য। এই 'সপ্তাহ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই বল্লভ ভট্ট এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে এক নিবিড় যোগসাধন ঘটিতে দেখা গিয়াছিল।

ভাগবত সপ্তাহ অনুষ্ঠানের নিয়ম ছিল—প্রবক্তা, তা তিনি বল্লভ ভট্ট নিজেই হোন বা তাঁহার যে কোনো ভক্ত শিষ্যই হোন, এই ঐশ্বরীয় কর্ম নির্বাহের জন্য কোনো অর্থাদি নিতে পারিবেন না।

বল্লভ ভট্ট সেবার একদল ভক্ত শিষ্য নিয়া কনৌজে গিয়াছেন। স্থানীয় এক ভক্তের গৃহে সাড়ম্বরে তিনি ভাগবত পাঠ শুরু করিলেন। কথা প্রসঙ্গে কহিলেন, ভাগবতের তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের পরম তত্ত্ব, ইহা ব্যাখ্যান করিতে গিয়া কেহ যদি কোনো অর্থ গ্রহণ করে, তবে তাহা তিনি গুরুতর অপরাধ ও পাপ বলিয়া গণ্য করেন। কারণ, কৃষ্ণকথা বিক্রয় করা চলে না।

শ্রোতাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন পদ্মনাভদাস নামে এক বর্ষীয়ান্ পুরাণ-পাঠক। কনৌজের বিভিন্ন পল্লীতে পুরাণ পাঠ করিয়া কোনো-মতে তিনি তাঁহার সংসারের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। বল্লভ ভট্টের কথা কয়টি তাঁহার অন্তরে গ্রথিত হইয়া গেল। এইসঙ্গে বল্লভের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, যোগ দিলেন তাঁহার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে। অতঃপর পদ্মনাভদাস স্থির করিলেন, পূর্ববৎ পুরাণ পাঠ করিবেন বটে, কিন্তু এজন্য কখনো কোনো অর্থাদি শ্রোতাদের নিকট গ্রহণ করিবেন না।

পদ্মনাভ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ঘরে কোনো সঞ্চিত অর্থ নাই, আবার নিত্যকার পুরাণ পাঠের আসরে কোনো অর্থও তিনি গ্রহণ করিতেছেন না। এ অবস্থায় সংসার ও বিগ্রহ সেবা চালানো যায় কিরূপে ?

পত্নী এবং বন্ধু বান্ধবেরা কেহই পদ্মনাভকে তাঁহার সংকল্প হইতে টলাইতে পারিলেন না। দীন ভিক্ষুকের জীবনই তিনি বরণ করিয়া নিলেন। অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ সপরিবারে উপবাসী আছেন জানিয়া কেহ যদি কখনো দু' এক মুষ্টি চাল দিয়া যাইত, তাহাতেই চলিত দেবসেবা ও স্বামী স্ত্রীর উদরপূর্তি। এক একদিন ঘরে এক মুষ্টি তণ্ডুলও জুটিত না। সেদিন পদ্মনাভদাস তেলিদের কাছে গিয়া তিলের খোসা সংগ্রহ করিতেন। পূজার ঘরে বসিয়া ঠাকুরকে এই বস্তুই নিবেদন করিতেন পরম ভক্তিভরে। পতি ও পত্নী সেদিন অতিবাহিত করিতেন অনাহারে।

কিছুদিন পরে পদ্মনাভদাস তাঁহার নব উপদেষ্টা বল্লভ ভট্টের স্বগ্রাম অড়ৈল-এ আসিয়া বাস করিতে থাকেন। আচার্যের মুখে নিত্য কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন আর বর্ষীয়ান্ পুরাণ পাঠকের গণ্ড বহিয়া ঝরিতে থাকে আনন্দাশ্রু। অথচ ঘরে পত্নীসহ প্রায়ই তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হয়।

সেবার এক ভক্ত পদ্মনাভের এই চরম দারিদ্র্য বরণের কথা বল্লভাচার্যের কানে তুলিলেন। বল্লভের জননী কাছেই দণ্ডায়মানা। এ সংবাদে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ কিছুটা খাদ্য সামগ্রী পদ্মনাভের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু পদ্মনাভকে ঐ খাদ্য গ্রহণে রাজী করানো যায় কই ? তিনি কহিলেন, "আমি তো জানি শিষ্যই দেবে তার গুরুকে, গুরুর গৃহ হতে তো তার কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়। এ খাদ্যবস্তু আমি নিতে পারিনে।"

অনশনে অর্ধাশনে দিনের পর দিন কাটিতেছে, শেষটায় পদ্মনাভ গৃহিণীর ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভাঙিয়া গেল। স্বামীকে তীব্র ভৎসনা

করিয়া কহিলেন, "পুরাণশাস্ত্র পাঠ ক'রে তার পরিবর্তে টাকাকড়ি নেবে না। বেশ তো, একথা মেনে নিলাম। কিন্তু ঘরে ছেলেমেয়েরা উপবাসী থাকবে, এটাই বা কেমন কথা? তুমি বরং কোনো মন্দিরে পূজারীর কাজ নাও। তাহলে যদিবা অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে সবাইকে বাঁচানো যায়।"

পদ্মনাভদাস উত্তরে বলেন, "তা কি ক'রে হয় গো? আজ আমি যদি পুরাণ পাঠ ছেড়ে দিয়ে কোনো মন্দিরে গিয়ে পূজারীর কাজ নিই, লোকে বলবে বল্লভ ভট্টের ভক্তদলে ভাঙন ধরেছে। ভট্টজীর শিষ্য হয়ে তা আমি কি ক'রে করবো?"

ফলে সপরিবারে আকাশবৃত্তি গ্রহণই হইল পদ্মনাভদাসের একমাত্র অবলম্বন। খোঁজখবর নিয়া কেহ কখনো দুই মুষ্টি তণ্ডুল দিলে তবেই সেদিন এই তিতিক্ষাবান্ পুরাণ পাঠকের গৃহে রন্ধনের হাঁড়ি উনুনে চাপানো হইত।

পদ্মনাভদাসের কৃচ্ছ্রসাধন ও আকাশবৃত্তির এই কাহিনী আজো, প্রয়াগ অঞ্চলের এক সুপ্রচারিত জনশ্রুতি।

বল্লভ ভট্টের প্রথম ও প্রধান শিষ্য দামোদরদাস। এই দামোদর গোড়া হইতেই একাধারে ছিলেন তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত, তীর্থসঙ্গী এবং একান্ত সেবক।

সাধন-জীবনে বল্লভ কয়েকবার সর্বভারতের তীর্থ পরিক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সব তীর্থের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিতেন ব্রজমণ্ডলকে। এই ব্রজমণ্ডলে তাঁহার প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক ও অলৌকিক কত লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাই এখানকার অরণ্য প্রান্তর যমুনা ও গিরিগোবর্ধন সর্ব স্থানই ছিল তাঁহার কাছে পরম পবিত্র এবং কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপক।

বল্লভ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে লেখা আছে, ইষ্টদেবের লীলাভূমি এই ব্রজমণ্ডলেই বল্লভ ভট্টের আচার্য জীবন শুরু হয়। এখানে তিনি দীক্ষা প্রদান করেন তাঁহার প্রধান শিষ্য দামোদরদাসকে।

সে-বার বল্লভ গোকুলের এক নির্জন অরণ্যে নিভৃতে কিছুদিন বাস করিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন একান্ত ভক্ত এবং সর্বসময়ের সাথী দামোদরদাস।

হঠাৎ একদিন রাত্রে ধ্যান জপ করার সময় ইষ্টদেবের কণ্ঠস্বর ও সুস্পষ্ট আদেশ তিনি শুনিতে পান। পাশেই আর এক কুটিরে অবস্থান করিতেছেন দামোদরদাস। বল্লভ তাঁহাকে কহিলেন, "দামোদর, তুমি কি দৈবী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে?"

"হ্যাঁ, শুনেছি, প্রভু, কিন্তু স্পষ্টভাবে সবটা কথা আমি ধরতে পারি নি।" উত্তর দিলেন দামোদর।

"কৃষ্ণের আদেশ হয়েছে,—তোমায় দীক্ষা দিতে হবে। হ্যাঁ, দামোদর এই আদেশের প্রতীক্ষায়ই আমি এতদিন ছিলাম। প্রভুর ব্রত উদ্‌যাপন করার যে সংকল্প গ্রহণ করেছি, আমার মনোমত বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠন করতে না পারলে সে সংকল্প সিদ্ধ হবে না। এই সম্প্রদায় গঠনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজ আমি পেলাম। দেখছি, তোমাকে দিয়েই শুরু হতে যাচ্ছে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের নির্ধারিত কর্মযজ্ঞ।"

দামোদরদাসের দীক্ষা সম্পন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণ-শরণাগতির মন্ত্র তিনি গ্রহণ করিলেন। দামোদর ছিলেন বল্লভ ভট্টের আদর্শ আত্মত্যাগী শিষ্য। পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান তাঁহার তেমন ছিল না, কিন্তু গুরুর প্রতি একনিষ্ঠা ভক্তি ও প্রপত্তির দিক দিয়া তিনি ছিলেন অতুলনীয়। পরবর্তীকালে বল্লভ সম্প্রদায়ে শাস্ত্রবিদ্ এবং প্রতিভাধর ব্যক্তি অনেক আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু গুরুভক্তি গুরু-সেবা ও ত্যাগ তিতিক্ষার দিক দিয়া দামোদরকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বল্লভ নিজমুখে তাঁহার এই প্রিয়তম শিষ্যকে অনেক সময় বলিতেন, "দামোদর তোমার জন্যই উদ্ভব ঘটেছে আমার এই নূতন কৃষ্ণসেবী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের।"

গুরুর মুখে শিষ্যের এই প্রশস্তি-বাণী শুনিয়া বল্লভ ভট্টের ভক্ত শিষ্যদের অনেকেরই বিস্ময়ের সীমা থাকিত না।

ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারা বল্লভের অতিশয় প্রিয় কর্মসঙ্গী বলিয়া গণ্য হইতেন তাঁহাদের তিনি ডাকিতেন সখা বলিয়া। এই 'সখা' কথাটির তাৎপর্য ছিল অতি গভীর। এই সব ভক্ত বা শিষ্য আচার্য বল্লভের সহধর্মী এবং সহকর্মীই শুধু নন, কৃষ্ণের মহান্ ঐশ্বরীয় কর্ম সাধনেরও তাঁহারা অংশীদার। তাই তাঁহারা বল্লভ ভট্টের জীবন সখা।

এই সখা তত্ত্বটি বল্লভ ভট্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আখ্যান হইতে। ইন্দ্রের রোষ, বজ্রপাত ও ঝটিকার তাণ্ডব হইতে গোপগোপীদের অলৌকিক উপায়ে রক্ষা করেন বালক শ্রীকৃষ্ণ। অবলীলায় গিরিগোবর্ধনকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া ইন্দ্রের অত্যাচারের করেন প্রতিরোধ। এসময়ে গোপগোপীরা বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করেন, "হে অতুলনীয় প্রতাপবান্ কৃষ্ণ, সত্য ক'রে বল তোমার প্রকৃত স্বরূপ কি? অবলীলায় যে অত্যাশ্চর্য কর্ম তুমি সম্পন্ন করলে, তা যে দেবতাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। যখন তোমার অলৌকিকী শক্তির কথা ভাবি, তখন আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যাই, ভাবতে থাকি, তুমি কি কোনো পরাক্রমশালী মহান্ দেবতারূপে আমাদের মতো নিম্নবর্ণের গোপদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছ? অথবা তুমি আমাদেরই একজন, আমাদেরই একান্ত আপনজন? হে কৃষ্ণ দয়া ক'রে উদ্‌ঘাটন করো তোমার প্রকৃত স্বরূপ।"

কৃষ্ণ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আমার স্বরূপ সম্বন্ধে কেন তোমরা ঔৎসুক্য প্রকাশ করছো? যদি তোমরা আমায় ভালবেসে থাকো, আমার কার্যকে প্রশংসার্হ বলে মনে করো, তাহলে আমাকে গণ্য ক'রে নাও তোমাদেরই একজন ভাই বলে, সখা বলে। আমি কোনো দেবতা নই, তোমাদের চাইতে বেশী শক্তিমান্ও নই আমি। কাজেই আমার ওপর ঐ সব অলৌকিকত্বের আরোপ তোমরা ক'রো না।"

বালক শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রজসখার সহজ ভাব, ভ্রাতৃত্বের সহজ ভাবটিই বল্লভাচার্য তাঁহার ভক্ত শিষ্য ও অনুরাগীদের সম্পর্কে গ্রহণ

করিতে চাহিয়াছিলেন। একদল শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্যকে তিনি চিহ্নিত করিয়াছিলেন সখা রূপে, বন্ধু রূপে।

তাঁহার এই 'সখা'দের মধ্যে ছিলেন, সুরদাস, পরমানন্দ, কুম্ভন, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি।

সুরদাস ছিলেন জন্মান্ধ। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সংগীত সদা উৎসারিত ছিল তাঁহার কণ্ঠে। ভাবময় সংগীতগুলি তিনি নিজেই রচনা করিতেন, নিজেই সুর তাল সহযোগে গান করিতেন সহজ আনন্দে মত্ত হইয়া।

সুরদাসের ভক্তি সংগীত সারা উত্তরভারতে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আজো দেখা যায়, কোনো অন্ধ ব্যক্তি যদি ভক্তি-সংগীত গাহিয়া বেড়ায়, তাহাকে ডাকা হয় সুরদাস নামে।

বল্লভ-সখা সুরদাসের জন্ম আগরা ও মথুরার মধ্যবর্তী গৌঘাটা নামক এক গ্রামে। সেখানেই এই জন্মান্ধ ভক্ত গায়ক আপন মনে তাঁহার স্বরচিত গান গাহিয়া বেড়াইতেন।

তীর্থ পরিব্রাজন করিতে করিতে বল্লভ ভট্ট সেবার গৌঘাটায় পদার্পণ করিয়াছেন। বহু দর্শনার্থীর সঙ্গে সুরদাসও সেদিন তাঁহার সমীপে উপস্থিত। স্থানীয় প্রধানেরা বল্লভ ভট্টের সহিত সুরদাসের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বল্লভ তাঁহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "সুরদাস, তুমি ধন্য। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যসূচক গান তোমার কণ্ঠ দিয়ে সতত নিঃসৃত হচ্ছে। সখা, আমায় একবার তোমার সুমধুর গান শুনিয়ে ধন্য করো।"

সুরদাস গাহিলেন এক আর্তিমূলক গান। তাহার মর্ম: হে প্রভু, আমার প্রধান বৈশিষ্ট্য, আমি পাপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এমন পাপীকে কে আর তরাবে তোমার মতো কৃপালু ছাড়া?

পরম প্রভুর কাছে বার বার আর্তি জানাইয়া সুরদাস একান্ত মনে এ গান গাহিতেছেন আর অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

প্রেমপূর্ণ স্বরে বল্লভাচার্য কহিলেন, "সুরদাস, এই বিষাদের গান, আর্তিময় গান কেন শুনছি তোমার মুখে? আমাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যে

মাধুর্যের প্রভু, আনন্দের প্রভু। তাঁর প্রশস্তি গাও প্রাণভরে, দিব্য আনন্দের ধারা উথলে উঠুক তোমার সারা দেহে মনে আত্মায়।"

"আচার্য প্রভু, আনন্দে উৎসারিত সেই গান তখনই গাইতে পারবো, যখন কৃপাময়ের কৃপা পেয়ে ধন্য হবে এ জীবন। আপনি কৃপাময়ের নিজ জন, আমায় আপনার আনন্দ-মন্ত্রে দীক্ষা দিন, প্রভুর লীলারস উপভোগ করতে দিন, তবেই তো আনন্দের গান বেরুবে আমার কণ্ঠ দিয়ে।"

পরম ভক্ত সুরদাসকে দীক্ষা দান করেন বল্লভাচার্য। আনন্দময় অনুভূতিতে পরিপ্লাবিত হন সুরদাস। তারপর তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় শ্রীকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য জ্ঞাপক অপরূপ সংগীত-লহরী। সুরদাসের রচনার আবেগ ও আনন্দ-স্পর্শ অচিরে ছড়াইয়া পড়ে অগণিত কৃষ্ণভক্তের কণ্ঠে। বল্লভ সম্প্রদায় ভক্ত-সুরদাসের নব নামকরণ করেন সুরসাগর। ব্রজভাষায় রচিত সুরদাসের সংগীতমালা ভক্ত-হৃদয়ে আজো অক্ষমালার মতো আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

কনৌজী ব্রাহ্মণ পরমানন্দদাস ছিলেন একজন ভক্ত কবি। ভক্তি-সংগীতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল যথেষ্ট। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া কনৌজে একটি ক্ষুদ্র ভক্ত গোষ্ঠী এ সময়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

একবার পরমানন্দদাস ত্রিবেণী সংগমে স্নান করিতে আসিয়াছেন। স্থির করিলেন, এই সুযোগে কিছুদিন প্রয়াগতীর্থে অবস্থান করিবেন। এই সময়ে প্রতিদিন নিজ বাসস্থানে বসিয়া তিনি ভক্তি সংগীত পরিবেশন করিতেন। তাঁহার প্রেমাবেশ এবং মনোহর সংগীতে আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই সেখানে আসিয়া জুটিতেন।

পরমানন্দদাসের খ্যাতির কথা শুনিয়া বল্লভ ভট্টের অন্যতম শিষ্য কাপুর একদিন প্রয়াগে তাঁহার সংগীত সভায় উপস্থিত হন।

ভক্ত কবির হৃদয়ে সেদিন দিব্য ভাবের উদ্দীপনা জাগিয়াছে। পরম প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া সুরেলা কণ্ঠে একটির পর একটি গান তিনি গাহিয়া চলিয়াছেন। সবাই মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই সংগীতের সুধা

পান করিতেছেন। রাত্রি কখন গভীর হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে কাহারো হুঁশ নাই।

কাপুর ভক্তকবির সম্মুখে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্য-জ্ঞানের কোনো লক্ষণ তাঁহার দেহে নাই। পরমানন্দদাস শুনিয়াছেন, কাপুর আচার্য বল্লভ ভট্টের একজন বিশিষ্ট শিষ্য, তাই তিনি সংগীত পরিবেশনের ফাঁকে ফাঁকে বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছেন।

রাত্রির শেষ যামে সংগীত সভা সমাপ্ত হইল, কাপুর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার সঙ্গীগণসহ নদীর ওপারে অড়েলে চলিয়া গেলেন।

শ্রান্ত দেহে পরমানন্দ এবার আপন কুটিরে শয়ন করিতে যান এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় হন অভিভূত। এ সময়ে তিনি এক মনোহর স্বপ্ন দর্শন করেন। আচার্য বল্লভ ভট্টের শিষ্য পরমানন্দ দাসের ভাবময় মূর্তিটি তাঁহার অন্তরপটে ভাসিয়া উঠে। সবিস্ময়ে আরো লক্ষ্য করেন, ভক্তপ্রবর কাপুরজীর কোলে বসিয়া ইষ্টদেব বাল-শ্রীকৃষ্ণ এক মনে পরমানন্দদাসের ভক্তিরসাত্মক সংগীত শ্রবণ করিতেছেন। আর তাঁহার বদনকমলে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রসন্নমধুর হাসির আভা। ক্ষণপরে ইষ্টদেব কহিলেন, 'বৎস পরমানন্দ, তোমার ভাবময় সংগীত শুনে আজ আমি বড়ই তৃপ্তি লাভ করেছি।'

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন টুটিয়া গেল, ভক্ত পরমানন্দ ত্রস্তব্যস্ত হইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন।

অন্তরে তাঁর খেলিয়া গেল চিন্তার ঝলক। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ এই অদ্ভুত স্বপ্নের মাধ্যমে কোন্ গূঢ় ইঙ্গিত আজ দিয়া গেলেন? তবে কি কাপুর পরম প্রভুর একজন চিহ্নিত ভক্ত এবং তাঁহার মাধ্যমেই পরমানন্দকে তিনি কৃপা করিতে চান?

আর কালবিলম্ব না করিয়া পরমানন্দদাস কাপুরের সন্ধানে ওপারে অড়েল গ্রামের দিকে ধাবিত হন। নদী পার হইবার পর দেখেন, প্রভাতের স্নান তর্পণ সারিয়া আচার্য বল্লভ ভট্ট বালুতটে বসিয়া কাপুর প্রভৃতি ভক্তদের কাছে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন।

পরমানন্দ মনে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন, এই মহাত্মাই তাঁহার সাধনজীবনের আলোকদিশারী। প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দর্শন যদি তাঁহার ভাগ্যে থাকে তবে তাহা ঘটিবে ইঁহারই কৃপাবলে। ভাবকম্পিত দেহে তখনি ছুটিয়া গিয়া তিনি আচার্য বল্লভের চরণ বন্দনা করিলেন, গ্রহণ করিলেন তাঁহার আশ্রয়।

উত্তরকালে সাধক পরমানন্দদাস বহুতর অনুভূতিলব্ধ ভক্তি-সংগীত রচনা করেন। বল্লভ ভট্টের ভক্ত সমাজে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন পরমানন্দ-সাগর নামে। সুরদাসের তুল্য দিব্য অনুভূতি ও কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তা হয়তো পরমানন্দের রচনায় নাই, কিন্তু তাঁহার ভক্তি-সংগীতও উত্তর ভারতের ভক্ত সমাজে জনপ্রিয়।

কুম্ভনদাস ছিলেন বল্লভ আচার্যের অপর এক বিশিষ্ট শিষ্য এবং 'সখা'। যমুনাবন্ত নামক গ্রামে তিনি বাস করিতেন। জাতিতে ছিলেন কুন্‌বি, এই কুনবিরা বৃত্তিতে ছিল চাষী। পারসোলি অঞ্চলে কুম্ভনদাসের পিতৃপুরুষের কিছু জমি ছিল, তাহা চাষ করিয়াই কোনোমতে তাঁহার পরিবারের দিন চলিত।

গোবর্ধননাথজীর বিগ্রহ স্থাপনের কিছুদিন পরেই কুম্ভন আচার্য বল্লভ ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং নিয়োজিত হন শ্রীবিগ্রহের সেবাকর্মে।

স্বভাবভক্ত কুম্ভনদাস গোবর্ধননাথজীর সঙ্গে এক সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বসেন। জনশ্রুতি আছে, চিন্ময় ঠাকুর কুম্ভনকে তাঁহার অন্তরঙ্গ সখারূপে জ্ঞান করিতেন, সখার মতোই পরমানন্দে তাঁহার সহিত খেলাধূলা এবং আনন্দরঙ্গে রত হইতেন।

সে-বার একদল মুসলমান সেনা ব্রজমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হয়। সবাই জানে, তাহারা মন্দির ও জনপদ লুণ্ঠন করিতেই আসিয়াছে, তাই দিকে দিকে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। শ্রীবিগ্রহ কি শেষটায় বিধর্মীদের দ্বারা কলুষিত হইবে? মন্দিরের পুরোহিতেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, এটিকে পার্শ্ববর্তী অরণ্যে নিয়া লুকাইয়া রাখা হইবে।

কুম্ভনদাস এবং অন্যান্য ভক্তেরা তাড়াতাড়ি একটি মহিষ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং উহার পিঠে চাপানো হইল গোবর্ধননাথ বিগ্রহটিকে। তারপর তাড়াহুড়া করিয়া এই বিগ্রহকে দুর্গম বনের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হইল। বনাঞ্চলটি কণ্টকবৃক্ষে পূর্ণ। পথ চলিতে সেবকদের অনেকেই কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইলেন, বিগ্রহের শরীরেও বার বার লাগিল কণ্টকের আঘাত।

পরদিন প্রভাতে মঙ্গল-আরতির পর ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করা হইল। এবার ঠাকুর চিন্ময় রূপ ধরিয়া তাঁহার সখা কুম্ভনদাসের হস্ত ধারণ করিলেন। আবদার ধরিলেন, "কুম্ভন এবার আমায় একটা নূতন গান শোনাও।"

আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই একটি গান বাঁধিয়া ফেলিলেন কুম্ভনদাস। এ-গানে ফুটিয়া উঠিল সখা গোবর্ধননাথজীর প্রতি বিদ্রূপের সুর। যে গানটি তিনি গাহিলেন তাহার মর্ম: কিরকমের ঠাকুর তুমি, বলতো? ষাঁড়ের পিঠে চেপে ছুটে এসেছো এই বনে, চারদিক রয়েছে কণ্টকে আবৃত। এই কণ্টকের খোঁচা দেওয়া আর খোঁচা খাওয়াই বুঝি তোমার ভাল লাগে? ক্ষুদ্র এক সেনাদল ঢুকে পড়েছে ব্রজমণ্ডলে। আর জগতের নাথ হয়ে তারই ভয়ে তুমি ভীত। আশ্রয় নিয়েছো এই অরণ্যে! বলিহারি ঠাকুর তোমার সাহস ও শক্তির।

কথিত আছে, কুম্ভনদাসের এই বিদ্রূপাত্মক গান রচনার অব্যবহিত পরেই মুসলমান সেনা লুণ্ঠনের লোভ ছাড়িয়া কি এক অজ্ঞাত কারণে ব্রজভূমি পরিত্যাগ করে। অতঃপর শ্রীবিগ্রহকে পুনরায় গোবর্ধন পাহাড়ের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ভক্ত কুম্ভনদাসের কাজ ছিল শ্রীবিগ্রহকে দুইবেলা সঙ্গ দেওয়া, তাঁহার জন্য পুষ্প উপচার সংগ্রহ করা আর নূতন নূতন প্রেমরসাত্মক গান গাহিয়া শোনানো।

তাঁহার নিবেদিত গানের সংবেদন ও আন্তরিকতা ভক্ত-মাত্রেরই প্রাণমন কাড়িয়া নেয়। নূতন নূতন যে সব গান প্রতিদিন তিনি

রচনা করিতেন, তাহা তড়িৎবেগে ছড়াইয়া পড়িত বৃন্দাবন ও মথুরার মন্দিরে মন্দিরে, ভক্ত সাধকদের মণ্ডলীতে।

কথিত আছে, কুম্ভনদাসের ভক্তিসংগীতের খ্যাতি শুনিয়া সম্রাট আকবর একবার দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান এবং রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে আনয়ন করেন।

আকবর কহিলেন, "শুনেছি আপনি একজন সত্যকার ভক্ত এবং কবি। আমায় আপনার সত্তরচিত একটি ভক্তিসংগীত গেয়ে শুনিয়ে দিন।"

কুম্ভনদাস নূতন এক গান বাঁধিলেন, সম্রাটের সকাশে তাহা সুরতাল লয় যোগে গাহিয়াও দিলেন। এ গানের মর্ম : শ্রীভগবানের ভক্ত বলে চিহ্নিত যে জন, সিক্রির জৌলুসময় দরবারে তার কি কাজ, বলতো ? দূর পথের আসা যাওয়ায় পাদুকা দুটো আমার ছিঁড়ে গেছে। আর দরবারে যে মুখের দিকে চাইতে হচ্ছে, তাতে নেই কোনো আনন্দের লেশ। হে কুম্ভনদাস, জেনে রেখো, প্রভু গিরিধারী ছাড়া আর কোনো কিছুতেই নেই কোনো সারবস্তু, নেই কোনো কল্যাণ।

আকবর বুদ্ধিমান এবং কৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট। ভক্তের অন্তরের কথা ও তাহার তাৎপর্য তিনি বুঝিলেন, সাদর অভিনন্দনের পর কুম্ভনদাসকে পাঠাইয়া দিলেন তাহার স্বস্থানে।

ব্রজভূমিতে কিছুদিন অনুপস্থিত ছিলেন কুম্ভনদাস, প্রভু গোবর্ধন-নাথজীর সঙ্গে এ-কয়দিন আনন্দরঙ্গ করিতে পারেন নাই। দিন কাটাইয়াছেন বিরহখিন্ন হৃদয়ে। তাঁহার এসময়কার রচিত সংগীতে বিরহের আর্তি পরিস্ফুট। আচার্য বল্লভের সম্প্রদায়ে কুম্ভনদাসের এই বিরহ সংগীতগুলি আজো অত্যন্ত জনপ্রিয়।

সম্রাটের অন্যতম সেনাপতি, রাজা মানসিংহ সে-বার ব্রজমণ্ডলে তীর্থদর্শন করিতে আসিয়াছেন। গোবর্ধননাথজীর সম্মুখে বসিয়া কুম্ভনদাস সেদিন তাঁহার নিত্যকার কর্মে ব্যাপৃত। নানা রঙের ফুলের মালা প্রভুর জন্য গাঁথিতেছেন, আর আপন মনে নিবেদন

করিতেছেন স্বরচিত ভক্তিসংগীত। মানসিংহ প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইলেন এই ভক্তকবির প্রতি।

পরদিনই কুম্ভনদাসের কুটিরে গিয়া তিনি উপস্থিত। মনের অভিলাষ, ভক্তপ্রবরকে কিছু অর্থ দান করিবেন।

কুম্ভনদাস তখন তাঁহার পর্ণকুটিরে বসিয়া ঠাকুরের নাম কীর্তন করিতেছেন আর মালা গাঁথিতেছেন। বাড়ির লোকেরা পরম সমাদরে মানসিংহকে কুটিরের বারান্দায় বসিতে দিলেন। কুম্ভন কিন্তু তাঁহার সেবা নিয়াই ব্যস্ত। হাতি ঘোড়া লোক লস্কর নিয়া মহামান্য অতিথি মানসিংহ তাঁহাদের কাছে উপস্থিত, কিন্তু সেদিকে তাঁহার দৃক্পাতই নাই। বহুক্ষণ পরে কুটির হইতে বাহিরে আসিয়া করজোড়ে রাজাকে জানাইলেন সাদর সম্ভাষণ। কহিলেন, "মহারাজ আপনাকে আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে। প্রভু গোবর্ধননাথজীর মন্দিরে আমার যাবার সময় হয়েছে। তার আগে, আমায় তৈরি হতে হবে, একটু প্রসাধন ক'রে নিতে হবে।"

এবার কুটিরস্থ একটি বালিকাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে, আমার আরশিটা তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে আয়, গোপীচন্দনের তিলকচিহ্নটা দিয়ে নি।"

বালিকাটি উত্তরে কহিল, "আপনার আরশি বাইরে নেব কি করে? নিচেকার ফুটো দিয়ে সব জল যে ঝরে পড়ে যাচ্ছে।"

মানসিংহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, "আরশির সঙ্গে জলের কি সম্পর্ক, তাতো বুঝে উঠতে পারছিনে?"

ইতিমধ্যে মেয়েটি ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। হাতে তাঁহার শালপাতা দিয়া তৈরি বাটির মতো একটি পাত্র। তাহাতে জল পুরিয়া রাখা হয় এবং ঐ জলেই নিজের প্রতিকৃতি দুবেলা দর্শন করেন কুম্ভনদাস, সম্পন্ন করেন তাঁহার গোপীচন্দনের প্রসাধন। এটিই তাঁহার আরশি!

মানসিংহের ইঙ্গিতে পরিচারকেরা তাঁহার হাতির হাওদা হইতে স্বর্ণখচিত আরশিটি লইয়া আসে, এটি স্থাপন করা হয় কুম্ভনদাসের

সম্মুখে। রাজা বলেন, "আপনার প্রসাধনের কাজ এই আরশিটি দিয়ে ভালো চলবে। এইটি আপনি রেখে দিন।"

কুম্ভনদাস সহাস্যে উত্তর দেন, "সোনা বাঁধানো এই দামী আরশি দিয়ে আমার কোন্ প্রয়োজন, মহারাজ? তাছাড়া, এটি এই দীন দরিদ্রের কুটিরে থাকলে, আজ রাতেই ডাকাত পড়বে যে! না, এ আপনি নিয়ে যান।"

রাজা মানসিংহ এবার বাহির করেন তাঁহার মোহরের থলি। একরাশ স্বর্ণমুদ্রা কুম্ভনদাসের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়া বলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছা, এই অর্থ আপনি গ্রহণ করুন, আপনার মতো ভক্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে সর্বদা সংগ্রামে নিযুক্ত থাকবেন, তা আমি চাইনে।"

কুম্ভনদাস উত্তর দেন, "মহারাজ, দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম আমার নেই। বরং আমাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে। আমার যে কয় বিঘা জমি আছে, তা দিয়ে কোনোমতে সংসারের ব্যয় নির্বাহ হচ্ছে। তাছাড়া, মহারাজ, আমার লোভ নেই, অভাববোধও নেই। কাজেই আপনার এ অর্থ দিয়ে আমার কি দরকার? দয়া ক'রে এগুলো আপনি ফিরিয়ে নিন।"

মানসিংহ অনুরোধ জানান, "বেশ তো, আপনি সোনার মোহর নিতে না চান, কিছুটা জমি নিন, বা একটা গ্রাম আমার কাছ থেকে নিন।"

কুম্ভনদাসকে কোনো কিছুতেই রাজী করানো গেল না। রাজা মানসিংহ তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতেছেন, প্রিয় প্রভু গোবর্ধনধারীর মন্দিরে যাইতে তাঁহার বিলম্ব ঘটিতেছে, এজন্য বরং তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন।

মানসিংহ প্রশ্ন করিলেন, "দয়া ক'রে একটিবার আমায় বলুন, আমি কি করলে আপনি খুশী হবেন।"

"সত্যি কথা বলতে কি, আপনার মতো মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিরা আমার কাছে না এলেই আমি খুশী হবো। আমার প্রিয় প্রভু আর

আমার মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে কেউ ব্যবধান রচনা করুক, এ আমি চাইনে।" অকপটে বলেন কুম্ভনদাস।

ভক্তপ্রবরের মনের কথাটি মানসিংহ বুঝিলেন। বার বার তাঁহার প্রশস্তি জানাইয়া সেখান হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কুম্ভনদাসের নিজের পরিবারবর্গ ও আশ্রিতের সংখ্যা কম ছিল না। তাই সামান্য যেটুকু জমি ছিল তাহা চাষ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন চলা ভার হইত। বল্লভ আচার্যের পুত্র, গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথ, সে-বার তাঁহার দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা করেন। বিঠ্ঠলনাথ একবার শিষ্যদের দর্শন দিবার জন্য ব্রজমণ্ডলের বাহিরে যাইতেছেন। কুম্ভনদাসকেও তিনি সঙ্গে নিলেন। উদ্দেশ্য, এই উপলক্ষে ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট হইতে যে অর্থাদি পাওয়া যাইবে, তাহার কিছুটা অংশ কুম্ভনদাসকে দিবেন এবং এভাবে তাঁহার দুঃখ মোচনে কিছুটা সহায়তা হইবে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। গোবর্ধন অঞ্চল ত্যাগ করার পর হইতেই কুম্ভনদাসের নয়নে নামিল অশ্রুর বন্যা। পরম প্রভু গোবর্ধনধারীর বিরহে তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন, শেষটায় আহার নিদ্রাও ত্যাগ করিলেন।

বিঠ্ঠলনাথ বুঝিলেন, তিনি ভুল করিয়াছেন। কুম্ভনদাসকে প্রভু গোবর্ধননাথের সঙ্গচ্যুত করা তাঁহার পক্ষে ঠিক হয় নাই। প্রবীণ ভক্তেরা সবাই জানে, লীলাময় শ্রীবিগ্রহ চিন্ময়রূপে প্রতিদিন কুম্ভনদাসকে দর্শন দেন, তাঁহার সঙ্গে লীলাখেলা করেন। সেক্ষেত্রে কুম্ভনের গোবর্ধন ত্যাগ প্রভু ও ভক্ত দুজনেরই সন্তাপের কারণ ঘটিয়াছে। শুধু কুম্ভনদাসই নয়, শ্রীবিগ্রহও বিরহ দহনে জর্জরিত হইতেছেন।

এসব কথা চিন্তা করিয়া গোস্বামী বিঠ্ঠলনাথ সেইদিনই কুম্ভনদাসকে তাঁহার স্বস্থান গোবর্ধনে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

এই কয়দিনের বিরহ-দহনের চিহ্ন ভক্ত কুম্ভনদাসের কয়েকটি ভক্তি সংগীতে পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই সংগীতগুলি বল্লভ সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত।

কৃষ্ণদাস ছিলেন বল্লভ আচার্যের 'সখা' পর্যায়ভুক্ত অপর এক অন্তরঙ্গ ভক্ত। ভাগ্যচক্রের গতি যেভাবে তাঁহাকে ঘর-সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য করে, বল্লভের আশ্রয়ে টানিয়া নিয়া আসে, তাহা বড় বিস্ময়কর।

গুজরাটের এক জোতদারের পুত্র ছিলেন কৃষ্ণদাস। পিতা গ্রামের প্রধান বা পাটেল, যথেষ্ট অর্থবানও। কিন্তু তবুও তাঁহার অর্থ লালসার নিবৃত্তি ছিল না।

সে-বার এক বড় বণিক নানা ধরনের পণ্য নিয়া গ্রামে আসিয়াছে। কৃষ্ণদাসের পিতা ধনী ব্যক্তি এবং গ্রামের প্রধান, বণিকটি তাঁহার কাছে বহু পণ্য বিক্রয় করিলেন, এবং মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করিলেন চৌদ্দ হাজার টাকা। অতঃপর কাজকর্ম সারিয়া সেই রাত্রেই তিনি অপর গ্রামের দিকে রওনা হইলেন।

কৃষ্ণদাসের পিতা ছিলেন অতিশয় দুর্নীতিপরায়ণ, অসাধু উপায়ে ধনার্জনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সে রাত্রেই তাঁহার ইঙ্গিত অনুযায়ী একদল ডাকাত ঐ বিদেশী বণিকের নিকট হইতে তাঁহার দেওয়া চৌদ্দ হাজার টাকা লুঠ করিয়া নিল।

পরদিনই ভোরবেলায় বণিকটি কৃষ্ণদাসের পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত। সখেদে এই ডাকাতির সংবাদ সে দিল, লুণ্ঠিত অর্থ উদ্ধারের জন্য চাহিল তাঁহার সাহায্য।

সাহায্য দেওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণদাসের পিতা বণিকের প্রতি গর্জিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তুমি নিজে অত্যন্ত অসাবধান তাই টাকা লুঠ হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা তার কি করতে পারি? বনে জঙ্গলে ডাকাতদের পিছু পিছু এখন কে ধাওয়া করতে যাবে। যাও, এখান থেকে এখন ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো।"

গ্রামের পাটেল যদি ডাকাতদের সন্ধান চালাইতে ইচ্ছুক না হয় তবে আর উপায় কি?

বিষণ্ন মনে বণিকটি সেস্থান হইতে বিদায় নিল। কিন্তু গ্রামের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল পাটেলের

পুত্র বালক কৃষ্ণদাসের সঙ্গে। সে কহিল, "শুনুন। আমি আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি। আমার বাবা একটি দুষ্ট চক্রের পাল্লায় পড়েছেন, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদেশীদের টাকা লুঠ করছেন আর নিজেদের মধ্যে ভাগ বখ্‌রা ক'রে নিচ্ছেন। তাঁর এ পাপকর্মের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আপনার টাকা উদ্ধারের জন্য আমি তাই সাহায্য করতে চাই।"

বণিক আশার আলো দেখিতে পায়। বালককে প্রশ্ন করে, "বল তো ভাই, কি ভাবে আমার টাকাগুলো আবার ফেরত পাওয়া যায়?"

"আমার বাবা গ্রামের পাটেল। আপনি আমেদাবাদে গিয়ে সদরওয়ালার কাছে তাঁর নামে নালিশ রুজু করুন। আমি আপনার পক্ষে সাক্ষী দেব, ঘটনার আসল বিবরণ প্রকাশ করবো।"

"কিন্তু ভাই, কেন তুমি একাজ করতে যাচ্ছো, বল তো?"

"আমার বিশ্বাস, সত্য কথা প্রকাশ করলে, ডাকাতদের হাত থেকে আপনার টাকা উদ্ধার করা হবে, ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। তাতে আমার বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যেমন হবে, তেমনি হবে তাঁর সত্যকার কল্যাণ।"

আমেদাবাদে আসিয়া বণিক তাহার মামলা দায়ের করে এবং কৃষ্ণদাসের পিতার উপর সরকারী পরওয়ানা জারী হয়। এই মামলায় সত্যভাষী বালক কৃষ্ণদাসের সাক্ষ্যেই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণদাসের পিতা ভীত হইয়া নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থ বণিককে প্রত্যর্পণ করা হয়।

বালক কৃষ্ণদাসের অনুনয়ের ফলে কাজী তাহার পিতাকে মার্জনা ভিক্ষা দেন।

স্বগ্রামে পৌঁছিয়াই কৃষ্ণদাসের পিতা স্বমূর্তি ধারণ করেন, পুত্রকে বহিষ্কার করেন গৃহ হইতে।

নিঃসম্বল বালক ভগবানের নাম নিয়া এবার পথে বাহির হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর নানা তীর্থ ও মঠ মণ্ডলী দর্শন করিয়া সে

অতিবাহিত করে। তারপর একদিন মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। আচার্য বল্লভ তখন ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে ভাগবত পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার ভাবময় ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয় তরুণ ভক্ত কৃষ্ণদাস, আশ্রয় নেয় তাঁহার চরণে। উত্তরকালে কৃষ্ণদাস আচার্য বল্লভের মঠ এবং মণ্ডলীর অন্যতম সংগঠক ও পরিচালকরূপে চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

আচার্য বল্লভ এবং শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হন প্রায় সমকালে। বয়সের হিসাবে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বল্লভ কিছুটা বড়। উভয় ধর্ম-নেতার ভক্তি-আন্দোলন পাশাপাশি অগ্রসর হইয়া চলিলেও নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য উভয়ে রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

চৈতন্য ও বল্লভের প্রচারিত তত্ত্ব প্রধানত ভাগবত পুরাণের অনুসারী। কিন্তু চৈতন্য নিয়াছেন ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ী বর্ণিত ব্রজকিশোর কৃষ্ণ ও ব্রজকিশোরী শ্রীরাধার তত্ত্ব। আর আচার্য বল্লভ তাঁহার সাধনজীবনের পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছেন, বালক শ্রীকৃষ্ণকে। বালগোপালের লীলাকে করিয়াছেন তাঁহার মণ্ডলীর প্রধান উপজীব্য।

মহাপ্রভু চৈতন্য ও আচার্য বল্লভের চিত্তাকর্ষক সাক্ষাতের বিবরণ আমরা পাই গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে। ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস তাঁহার ঐ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ গোস্বামীর মতো উচ্চকোটির বৈষ্ণব মহাত্মাদের নিকট হইতে। তাই তাঁহার এই বিবরণের প্রামাণিকতার উপর অনেকটা নির্ভর করা চলে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করিয়া তখন বাংলা ও উড়িষ্যায় ভক্তি-প্রেমের প্রবল বন্যা উৎসারিত হইয়াছে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, সর্বদর্শনবেত্তা বাসুদেব সার্বভৌম, প্রভুর চরণে শরণ নিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে বিরাজিত অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতির মতো দিক্‌পাল মহাবৈষ্ণব। স্বয়ং উড়িষ্যার মহারাজা

প্রতাপরুদ্র গজপতি প্রভুর একান্ত বশংবদ। শুধু তাহাই নয়, পুরী-ধামে তৎকালে সে সব সাধু সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদ্ আচার্য তাঁহার দর্শনে আসিতেছেন, তাঁহারাই প্রভুর দিব্যকান্তি ও মহাভাবময় প্রেম দর্শনে জীবন সার্থক করিতেছেন, অকুণ্ঠ কণ্ঠে গাহিতেছেন এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর প্রশস্তি। বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন করিয়া ও রূপ সনাতন প্রভৃতি প্রতিভাধর বৈষ্ণবদের প্রেরণ করিয়াও শ্রীচৈতন্য এক প্রবল ভক্তি প্রবাহ উৎসারিত করিয়াছেন।

আচার্য বল্লভ সে-বার শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য পুরীধামে আসিয়াছেন। প্রভু শ্রীচৈতন্য তখন এই ধামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তাছাড়া, বল্লভ পূর্ব হইতেই শ্রীচৈতন্যকে জানেন, বিপুল শ্রদ্ধা পোষণ করেন তাঁহার প্রতি। কয়েক বৎসর আগে প্রভু যখন প্রয়াগে ছিলেন, তখন বল্লভ তাঁহাকে আড়েলে স্বগৃহে নিয়া গিয়া ভিক্ষা নির্বাহ করাইয়াছেন, প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্তন ও প্রেমবিকার দর্শনে ধন্য হইয়াছেন।

স্বভাবতই পুরীতে জগন্নাথ দর্শনের পর আচার্য বল্লভ ভট্ট প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ মাত্র উভয়েই আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন।

বল্লভ সহর্ষে কহিলেন, "পূর্ব ভারতে ও বৃন্দাবনে আপনি নাম-প্রেমের যে বন্যা উৎসারিত করেছেন, তার তরঙ্গ প্রভাবিত করেছে সারা ভারতকে। স্পষ্টতই বুঝতে পারছি, কৃষ্ণের শক্তি নিহিত রয়েছে আপনার মধ্যে, তাই আপনার দর্শন স্পর্শনে মানুষের এমন রূপান্তর ঘটছে।"

শ্রীচৈতন্য সবিনয়ে উত্তর দেন, "ভট্টজী, আমি শুষ্ক সন্ন্যাসী, প্রেম-ভক্তির নিগূঢ় রহস্য আমি কি জানবো। হ্যাঁ, তবে কৃষ্ণের কৃপায় প্রকৃত বৈষ্ণবদের সৎসঙ্গ আমি পেয়েছি, তাই তাঁদের কাছ থেকে ভক্তি,সাধনার তত্ত্ব কিছু কিছু শিখছি।"

রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর গৌড় হইতে ভক্তেরা পুরীতে আসিতেন। জগন্নাথ দর্শনের পর প্রভুর মধুময় সান্নিধ্যে কিছুদিন

বাস করিয়া আবার তাঁহারা দেশে ফিরিতেন। ফলে প্রভুর শ্রেষ্ঠ ভক্তদের একটি বিরাট সম্মেলন দেখা দিত পুরীধামে। এবারকার রথযাত্রায়ও অন্যান্য বারের মতো বহু গৌড়ীয়া বৈষ্ণবের সমাবেশ ঘটিয়াছে। প্রভু তাঁহাদের নিয়া প্রায়ই ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন।

বল্লভ ভট্ট প্রভু-চৈতন্যকে ভালোভাবেই জানেন। প্রভুর বিনয় বচনে মোটেই বিভ্রান্ত না হইয়া আবার তিনি তাঁহার প্রশস্তি শুরু করিলেন।

স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে চৈতন্য কহিলেন, "না ভট্টজী, আপনি আমার এই বৈষ্ণব বন্ধুদের প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তাই বার বার আমার মতো অভাজনের প্রশংসা করছেন। এই দেখুন, এখানে রয়েছেন অদ্বৈত আচার্য, যাঁর প্রভাবে ম্লেচ্ছরাও কৃষ্ণভক্তি পেয়েছে। নিত্যানন্দ অবধূত তো সাক্ষাৎ ঈশ্বর। বাসুদেব সার্বভৌমের মতো দিক্‌পাল পণ্ডিত ভক্তিসাধনার কত নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদের শেখাচ্ছেন। আর রায় রামানন্দ? আহা, রাগমার্গের ভজন তাঁর চাইতে আর কে জানে? আমি তো তাঁর কাছ থেকেই ব্রজরসের মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছি। ঐ দেখুন বসে আছেন হরিদাস ঠাকুর—নামের মহিমা যে লোকে তাঁর কাছ থেকেই শিখছে। শুধু এঁরাই নয়, আরো কত বৈষ্ণব মহাত্মা এখানে রয়েছেন, এঁদের সঙ্গের ফলেই কৃষ্ণভক্তি উপজিত হয়েছে আমার মধ্যে।"

বল্লভ ভট্ট জানেন, এই বৈষ্ণবেরা সবাই প্রভুর ভক্তজন। তবে প্রভুর কথা হইতে ইহাও বুঝিয়া নিলেন, ইহারা প্রত্যেকেই এক একটি ভক্তি-সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন।

বল্লভ ভট্ট একজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব আচার্য। শুধু ব্রজমণ্ডলেই নয়, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বহুস্থানে তাঁহার শিষ্য ভক্তেরা ছড়াইয়া রহিয়াছেন। বল্লভের রচিত শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মণ্ডলীর বাহিরের বহু বৈষ্ণবও উপকৃত হইতেছেন। কিন্তু আচার্য হিসাবে বল্লভের মনে কিছুটা সূক্ষ্ম অহংবোধ রহিয়াছে, ইহা চৈতন্যের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই বার বার ভক্তদের তত্ত্ব তাঁহার কাছে উদ্‌ঘাটন করিতেছেন।

বল্লভ ভট্ট তখন তাঁহার ভাগবতের সুবোধিনী টীকা প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছেন। ভাবিলেন, এই শক্তিধর বৈষ্ণব মণ্ডলীর যিনি অধীশ্বর সেই শ্রীচৈতন্যকে একবার তাঁহার টীকাটি পড়াইয়া শুনাইবেন। যদি এ হেন বৈষ্ণব নেতার প্রশংসা পাওয়া যায়, তবে সারা ভারতে ইহা অতি সহজে প্রচারিত হইতে পারিবে।

বল্লভ একদিন শ্রীচৈতন্যকে ধরিয়া বসিলেন, "আমার অভিলাষ, আমার লিখিত ভাগবতের টীকা গ্রন্থটি আপনাকে একবার আমি পড়ে শুনাবো।"

প্রভু কহিলেন, "আপনার মতো মহৎ বৈষ্ণব ভাগবতের টীকা লিখেছেন, এতো অতি চমৎকার কথা। কিন্তু আমি নিজে ভাগবতের অর্থ তেমন বুঝতে পারি কই? সারাদিন কেবল কৃষ্ণনাম জপ করি, তাও আমার নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হতে চায় না।"

বল্লভ ভট্ট কহিলেন, "আমি কৃষ্ণনামের অর্থ নানাভাবে ব্যাখ্যান ক'রে লিখেছি, তা আপনি একটু শুনুন।"

"কৃষ্ণনামের শুধু একটা অর্থই আমি জানি, তা হচ্ছে তিনি শ্যামসুন্দর এবং যশোদানন্দন, আর সব ব্যাখ্যা আমার কাছে অবান্তর। শুধু তাই নয়, আমার অধিকার জন্মায় নি অপর কোনো ব্যাখ্যা শোনবার।"

ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রীচৈতন্যের অনিচ্ছা দেখিয়া ভট্ট বড় ম্রিয়মাণ হইলেন। ভাবিলেন, প্রভুর প্রধান প্রধান পার্ষদদের ঐ ব্যাখ্যা শোনানোর জন্য এবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় কই? সবাই প্রভুর নৃত্য কীর্তনে মজিয়া আছে, প্রভুময় হইয়া আছে। ভট্টের ব্যাখ্যা শুনিবার ধৈর্য বা সময় কাহারো নাই। তাছাড়া, প্রভু শ্রীচৈতন্য নিজেই যখন ভট্টের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, তবে আর শুধু শুধু কে তাঁহার এই বিদ্যার কচ্‌কচি শুনিতে যাইবে?

কয়েকটি স্থানে বিরূপতা দেখিয়া বল্লভ ভট্ট শেষটায় শরণ নিলেন প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতের। গদাধর শান্ত স্বভাবের লোক, হাঁ না কিছুই বলিলেন না। এই সুযোগে বল্লভ

কৃষ্ণনামের যে সব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিতকে শুনাইয়া দিলেন।

চৈতন্যপ্রভুর সভায় গিয়া শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট এক একটি তত্ত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেন, আর অদ্বৈত প্রভৃতি তাহা তৎক্ষণাৎ যুক্তি তর্কের বলে খণ্ডন করিয়া দেন।

বল্লভ ভট্ট বড় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, এই গৌড়ীয়া বৈষ্ণবেরা তাঁহার চিন্তাধারাকে গ্রাহ্যই করিতেছে না, বার বার সবার সমক্ষে তাঁহাকে হেয় করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন বল্লভ ভট্ট অদ্বৈত আচার্যকে একটি কূট প্রশ্নের প্যাঁচে ফেলিলেন। কহিলেন, "জীব হচ্ছে প্রকৃতি, আর কৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষ, তার স্বামী। আমরা সবাই তো জানি, যে নারী পতিব্রতা সে কখনো স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। অথচ আপনারা অবাধে উচ্চ স্বরে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ ক'রে চলেছেন। বলতে পারেন, এটা করছেন কোন্ যুক্তির বলে ?"

অদ্বৈত আচার্য হাসিয়া কহিলেন, "আপনার সম্মুখে মূর্তিমান ধর্ম, মহাপ্রভু, বিরাজ করছেন, তাঁকেই বরং এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন !"

বল্লভ ভট্ট এবার প্রভু চৈতন্যকে চাপিয়া ধরিলেন। কহিলেন, "সন্ন্যাসীবর, আপনিই বরং আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দিন।"

চৈতন্য অবলীলায় বিতর্কের মীমাংসা করিয়া দিলেন—"আচার্য, আপনি প্রশ্নটি ভাল ক'রে তলিয়ে দেখেন নি। পতিব্রতার আসল ধর্ম হচ্ছে তাঁর স্বামীর আজ্ঞা পালন ক'রে চলা। জগতের স্বামী আজ্ঞা দিয়েছেন, নিরন্তর তাঁর নাম নেবার জন্য। জীবরূপ প্রকৃতি কি ক'রে তা লঙ্ঘন করে ? তাই তো নিরন্তর তাঁর নাম উচ্চারণ করেছে। আর এ কর্মের যা শ্রেষ্ঠ ফল, তাও সে পেয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁর ভেতর উপজিত হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম।"

এই যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া বল্লভ ভট্ট নিরুত্তর হইলেন।

আর একদিন শ্রীচৈতন্যের সম্মুখে বসিয়া ভট্ট গর্ব ভরে কহিতে-ছিলেন, "ভাগবতের সুবোধিনী টীকায় আমি শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাকে

খণ্ডন করেছি, তাঁর অনেক কথা আমি তত্ত্বের দিক দিয়ে মেনে নিতে পারি নি।”

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, “স্বামী যে না মানে, সে তো ভ্রষ্টা বলে গণ্য হয়।”

বলা বাহুল্য, প্রভুর এ কথায় বল্লভ ভট্ট সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন, আর সভায় একটা চাপা হাসির তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

শ্রীধর স্বামীপাদের ভাগবত ব্যাখ্যা ছাড়া প্রভু শ্রীচৈতন্য আর কিছু সমর্থন করিতে রাজী নন, একথা স্পষ্ট বুঝা গেল। অভিমানাহত বল্লভ ভট্ট যেন মরমে মরিয়া গেলেন, সেদিন আর তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

বল্লভ ভট্ট বিদ্বান এবং সৎস্বভাবের বৈষ্ণব, প্রভু তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই বুঝি ভট্টের আত্ম-অভিমানের কাঁটাগুলি এমনি-ভাবে একটি একটি করিয়া উৎপাটন করিতেছিলেন।

ঘরে ফিরিয়া রাত্রি যোগে বল্লভ প্রভুর আচরণ ও বাণীর মর্ম অনুধাবন করিতে লাগিলেন। যে প্রেমিক সন্ন্যাসী প্রয়াগে থাকা কালে ভট্টের এত আদর আপ্যায়ন করিয়াছেন, সম্মান জানাইয়াছেন, পুরীতে দেখা যাইতেছে তাঁহার ভিন্ন আচরণ। বল্লভ উপলব্ধি করিলেন, নিশ্চয় তাঁহার অন্তরে পাণ্ডিত্যের অভিমান জাগিয়াছে, তাই চৈতন্য সে অভিমানের শিরে বার বার আঘাত হানিতেছেন।

পরদিন ভোরবেলায় বল্লভ চৈতন্যের সভায় গিয়া উপস্থিত। এবার তাহার পূর্বেকার বিদ্যাগর্ব নাই। প্রভুকে কহিলেন, “আপনার কথায় ও আচরণে আমার চৈতন্যোদয় হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, আমার কল্যাণ সাধনের জন্যই আপনি মাঝে মাঝে দিয়েছেন এমন রূঢ় আঘাত।”

শ্রীচৈতন্য এবার আন্তরিকতা পূর্ণ স্বরে বল্লভ ভট্টকে দান করিলেন তাঁহার উপদেশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়ঃ

প্রভু কহে তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত।
দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব পর্বত॥

শ্রীধর-স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর।
শ্রীধর-স্বামী নাহি মানি, এত গর্ব ধর॥
শ্রীধর-স্বামীর প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
ভাগবদ্‌গুরু শ্রীধর-স্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান॥
অপরাধ ছাড়ি, কর কৃষ্ণ সংকীর্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

বল্লভ ভট্টের অন্তর হইতে এবার বিষাদের মেঘ কাটিয়া যায়। অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের তিনি তাঁহার নিজের আবাসে নিয়া সযত্নে ভিক্ষা গ্রহণ করান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সহিত ভট্টের ব্যবহার ও মেলামেশা আবার সহজ হইয়া উঠে।

বল্লভ চৈতন্য ও গৌড়ীয়া ভক্ত গোষ্ঠীর সহিত হৃদ্য সম্পর্ক রাখিলেন বটে, কিন্তু চৈতন্যপ্রভুর দিক্‌দর্শন অনুযায়ী শ্রীধরের ভাগবত ভাষ্য তিনি গ্রহণ করেন নাই।

কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের কথায় এবং গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গ প্রভাবে বল্লভ ভট্টের জীবনদর্শনের পরিবর্তন ঘটে। বালগোপাল ইষ্ট ছাড়িয়া কিশোর কৃষ্ণ ইষ্টের ভজনা তিনি শুরু করেন। কিন্তু একথার কোনো সমর্থন বল্লভের জীবনী বা রচনায় পাওয়া যায় না। আচার্য বল্লভ তাঁহার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমক্ষে যে তত্ত্ব ও ভজনাদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা অব্যাহতই থাকে। তবে শ্রীচৈতন্যের কল্যাণময় সান্নিধ্যের ফলে তাঁহার জীবনে ব্রজনন্দন কিশোর কৃষ্ণের ভাবমূর্তিটি পূর্বাপেক্ষা হয়তো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

বল্লভাচার্য বিষ্ণুস্বামীর অনুগামী, এই ধারণাটি বল্লভ সম্প্রদায়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বল্লভের মতবাদে তাঁহার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট, নিজের শাস্ত্র-বিদ্যা, পুরাণশাস্ত্রের দক্ষতা ও প্রেম ভাবালুতা সহায়ে তিনি নূতনতর একটি ভাগবত ধর্মের প্রবর্তন করেন। অনেক স্থলে বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া নিজস্ব মতবাদও তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আসলে বল্লভ আচার্যকে বিষ্ণুস্বামীর অনুগামী বলিয়া প্রচার করার চেষ্টা করা হইয়াছে কয়েকটি কারণে। সম্ভবত বল্লভের পিতা লক্ষণ ভট্ট বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, বল্লভ হয়তো তাঁহার প্রথম জীবনে ঐ সম্প্রদায়ের ভাবধারায় প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। একদল গবেষক ইহাও মনে করেন, কালক্রমে বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক লোক বল্লভের সম্প্রদায়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। ইহারাই প্রধানত ঝুঁকিয়াছিলেন বল্লভকে বিষ্ণুস্বামীর অধস্তন আচার্য হিসাবে দেখানোর জন্য।[১]

আচার্য বল্লভের রচিত গ্রন্থের অন্যতম তাঁহার 'অনুভাষ্য'। এই গ্রন্থে ব্রহ্মসূত্রের চার অধ্যায়ের ভাষ্য দেওয়া আছে এবং ইহার মাধ্যমে বল্লভ শঙ্করের অদ্বৈত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাগবতের ব্যাখ্যা 'সুবোধিনী'-তে আচার্যের দার্শনিক মতবাদ প্রপঞ্চিত।[২] তাঁহার লিখিত আরও গ্রন্থ আছে বলিয়া সম্প্রদায় হইতে দাবি করা হয়। কিন্তু সেগুলি দুষ্প্রাপ্য।

আচার্য বল্লভ শঙ্করের 'জগৎ-মিথ্যাত্ববাদ' নানা যুক্তি সহায়ে খণ্ডন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শ্রুতির প্রমাণ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন—এই জগৎ ব্রহ্মের রচিত, ইহা ব্রহ্মের কার্য, তাই ইহা ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য।

---

১ শ্রীবল্লভাচার্য (ইং): ভাই মণিলাল পারেখ।

২ সিদ্ধান্ত রহস্য, ভাগবত-লীলারহস্য, একান্ত রহস্যও আচার্য বল্লভের রচিত।

তিনি বলিয়াছেন মর্যাদা ও পুষ্টি ভেদে ভক্তির পথ দুইটি। শাস্ত্র যে বৈধী ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাই মর্যাদা মার্গ। আর কৃষ্ণের অনুগ্রহ লব্ধ যে ভক্তি তাহাই পুষ্টিমার্গ। ভাগবত পুরাণে শ্রীশুকের বাক্য রহিয়াছে—'পোষণং তদনুগ্রহঃ'—ভক্তের প্রতি ভগবানের যে অনুগ্রহ তাহাই হইতেছে 'পোষণ'। এই পোষণ-এর ভিত্তির উপর বল্লভ দাঁড় করাইয়াছেন তাঁহার পুষ্টিমার্গের তত্ত্ব। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাগমার্গীয় সাধনেরই মতো। বল্লভের পুষ্টিমার্গে ভগবানের অনুগ্রহ বা কৃপার উপরই একান্তভাবে নির্ভর করিতে বলা হইয়াছে।

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য' শ্রুতির এই মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বল্লভ দেখাইয়াছেন যে, পরব্রহ্ম দ্বারা যে ভক্ত বৃত হন, তিনিই হইতেছেন পুষ্টিমার্গের পথিক। পুষ্টিভক্তি চার প্রকারের, ইহাও বল্লভ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

বল্লভের জীবনদর্শন আলোচনা করিলে দেখা যায়, নেতিবাদকে কখনো তিনি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দার্শনিকতা ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ-কে একসঙ্গে মিলাইয়া নিয়াছে। শাস্ত্রের ভিত্তিতে যে নূতনতর বৈষ্ণবীয় দর্শন ও ভক্তিবাদ তিনি স্থাপন করিলেন; তাহার নাম দিলেন শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ।

সাধন ভজনের ক্ষেত্রে বল্লভ ভট্ট কৃচ্ছ্র বা অত্যধিক ত্যাগ তিতিক্ষার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নাই।[১] সংসার জীবনে মধ্যপথ অবলম্বন করা ও সদাই কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণমুখীন হইয়া থাকা, কৃষ্ণের অনুগ্রহ বা পুষ্টির আশায় উন্মুখ থাকা, এ সবের উপরই তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও বল্লভাচার্য এই মধ্যপথ এবং নিরন্তর কৃষ্ণ ভাবনার পথ অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও চৈতন্যের পরে তাঁহার মতো এত বড় শাস্ত্রবিদ্ বৈষ্ণব ও ধর্মনেতা আর ভারতভূমিতে দেখা যায় নাই। তৎসত্ত্বেও বল্লভ

---

১ এই মতবাদের ছিদ্র দিয়া উত্তরকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বল্লভাচারী ধর্ম-নেতাদের জীবনে দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে।

নিজেকে কোনোদিন অবতার বা অবতারপ্রতিম ধর্মাচার্য করিয়া তুলিতে চান নাই। নিজের প্রতিষ্ঠিত হাবেলী বা মন্দিরগুলির কোথাও কৃষ্ণবিগ্রহের পাশে নিজের বিগ্রহ তিনি প্রতিষ্ঠা করিতে দেন নাই।

অড়েলের গৃহে অতি সাধারণ একজন আচার্যের অনাড়ম্বর জীবনই বল্লভ ভট্ট যাপন করিতেন। উত্তর ভারতের ভক্তসমাজে অসামান্য প্রতিপত্তি তাঁহার ছিল, বহু অর্থ ও বিলাসের দ্রব্য তিনি উপঢৌকনও পাইতেন, কিন্তু নিজে এগুলি কোনোদিন ব্যবহার করেন নাই। বার বার সারা ভারত তিনি পরিব্রাজন করিয়াছেন, কিন্তু পায়ে কোনোদিন পাতুকা ছিল না, অঙ্গে শুধু থাকিত একটি পরিধানের বস্ত্র, আর একটি উড়ুনি।[১]

বল্লভ বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস বা ভেক কখনো সমর্থন করেন নাই। ঔপনিষদিক যুগ বা ঋষিযুগের কল্যাণময় গার্হস্থ্য আশ্রমকেই তিনি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁদের মতে, সাধক তখনই শুধু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, যখন শ্রীভগবানের বিরহ-দহন তাঁহার জীবনে চরমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই সন্ন্যাসের পরই মরদেহের বিনাশ হয়, কৃষ্ণ সাযুজ্য ঘটে, ইহাই তাঁহার বক্তব্যের নির্যাস।

আচার্য বল্লভ ভট্টের নিজ জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁহার সন্ন্যাস-তত্ত্বের এই নিজস্ব ব্যাখ্যাকেই রূপায়িত হইতে দেখি।

১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ। আচার্য বল্লভ ভট্টের বয়স তখন প্রায় ষাট বৎসর। এ সময়ে ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের এক প্রত্যাদেশ আসে তাঁহার কাছে—'সময় হয়ে গিয়েছে, এবার তুমি সংসার ত্যাগ করো, চলে এসো আমার সন্নিধানে।'

সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে বল্লভের দেরি হইল না। মাতা ও পত্নীকে তিনি সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধিত করিলেন, অন্তরঙ্গ শিষ্যদের বুঝাইয়া দিলেন এই দৈবাদেশের তাৎপর্য।

১ ভাই মণিলাল পারেখ: শ্রীবল্লভাচারিয়া।

ভক্ত দামোদরদাস বল্লভ ভট্টের চির পার্শ্বচর, চির অনুগত। তিনি কহিলেন, তিনিও আচার্যের সঙ্গে গ্রহণ করিবেন সন্ন্যাস-আশ্রম। অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য ভক্ত শিষ্যদের নিরস্ত করা হইল।

সন্ন্যাস আশ্রমে বল্লভ ভট্টের নব নামকরণ হইল, পূর্ণানন্দ স্বামী। মস্তক মুণ্ডন ও দীক্ষা গ্রহণের পর সাত দিন সাত রাত্রি তিনি নিজেকে ভজন কুটিরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, একান্তভাবে নিবিষ্ট রহিলেন ইষ্টধ্যানে। তারপর কাশীধামের উদ্দেশে শুরু হইল তাঁহার পদযাত্রা।

যাত্রা পথের স্থানে স্থানে, পবিত্র বৈঠক ও হাবেলীতে আচার্যের ভক্ত শিষ্যদের ভিড় লাগিয়া গেল। সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশাদি দিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আঠারো দিন পরে পৌঁছিলেন কাশীধামে।

গঙ্গাতীরে হনুমান ঘাটের প্রান্তে আচার্যের জন্য এক পর্ণকুটির তৈরি করা হয়। স্থির করা হয়, এখানে সাতদিন তিনি অবস্থান করিবেন, ভক্ত শিষ্যদের এখান হইতেই বিদায় উপদেশ দিবেন, তারপর মগ্ন হইবেন শেষ পর্যায়ের তপস্যায়।

একদল ঘনিষ্ঠ ভক্ত-শিষ্যসহ পুত্র গোপীনাথ এবং বিঠ্‌ঠলনাথও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। করজোড়ে সবাই প্রশ্ন করেন, "আপনার অবর্তমানে আমরা কোন্ আদর্শ সম্মুখে রেখে অগ্রসর হবো, কৃপা ক'রে তা আমাদের বলুন।"

আচার্য তখন মৌনী হইয়া আছেন। ঘাটের এক প্রস্তরখণ্ডে তিনটি শ্লোক এই জিজ্ঞাসুদের উদ্দেশে তিনি লিখিয়া দিলেন। এই শ্লোকের মর্ম :

> ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণ নিয়ে করবে জীবন ধারণ,
> আঁকড়ে থাকবে তাঁর চরণ অহর্নিশি।
> তাঁর থেকে বিচ্যুত হলেই জেনো—নিশ্চিত বিনষ্টি,
> তোমার দেহ, মন ও নশ্বর যে বস্তু দ্বারা তুমি বেষ্টিত,
> তা গ্রাস করে ফেলবে তোমার আত্মাকে।

শ্রীভগবান, আমাদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ,
কভু এই মরজগতের নন,
মরজগতের কোন কিছুতেই নেই তাঁর দৃষ্টি।
হে জীব! নিরন্তর কর তাঁর স্মরণ মনন
মর ও অমর দুই জগতের প্রভু জ্ঞানে।
গোপীভর্তা সেই মাধুর্যময় কৃষ্ণে রাখো মতি,
নিঃশেষে তাঁর চরণে বিলিয়ে দাও দেহ, মন, প্রাণ—
সৎবস্তু আর শাশ্বত আনন্দ মিলবে শুধু
সেই পরম প্রভুরই অপার কৃপায়।

এবার আচার্য প্রকাশ করিলেন তাঁহার চাঞ্চল্যকর সিদ্ধান্ত। ঘোষিত হইল, ইষ্ট বিরহের চির অবসান এবার তিনি ঘটাইবেন, গঙ্গার পবিত্র স্রোতে মরদেহ দিবেন বিসর্জন।

নির্দিষ্ট লগ্ন উপস্থিত হইলে সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী ও তীর্থচারী দর্শকের সম্মুখে আচার্য বল্লভ গঙ্গা গর্ভে প্রবেশ করিলেন। আশ্রিত শিষ্য ও অনুরাগীদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল শোকের আর্তি ও হাহাকার।

জনশ্রুতি আছে, উপস্থিত জনসাধারণ এ সময়ে এক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে পান। আচার্যের মরদেহ গঙ্গায় বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান হইতে একটা শুভ্র জ্যোতির ধারা উত্থিত হয়, ধীরে ধীরে আকাশমার্গে মিলাইয়া যায়। ঘাটের জনতার ভিতর হইতে মুহুর্মুহু উঠিতে থাকে মহাসাধক বল্লভাচার্যের জয়ধ্বনি।

শিখগুরু অমরদাস

গঙ্গাস্নান আর গঙ্গাপূজা ছিল ভক্ত গৃহস্থ অমরদাসের জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ। অমৃতসর অঞ্চলে তাঁহার বাস, গঙ্গা সেখান হইতে বহু দূরে। তবুও প্রতি বৎসর অমরদাস কোনো একটা পুণ্যযোগ উপলক্ষে গঙ্গায় গিয়া অবগাহন করিতেন, তারপর পদব্রজে ফিরিয়া আসিতেন স্বগ্রামে।

সেবারও স্নান তর্পণ সারিয়া দেশের দিকে রওনা হইয়াছেন। ক্রমে বেলা বাড়িয়া গেল। গ্রীষ্মের গরমে দেহ অতিশয় ক্লান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসায়ও কাতর। পথের পাশে এক বটগাছের ছায়ায় ঝুলিটি নামাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে শুরু হইল রন্ধনের উদ্যোগ।

পরিব্রাজন রত এক সাধুও আশ্রয় নিয়াছেন ঐ বৃক্ষতলে। অমরদাস করজোড়ে কহিলেন, "বাবা, অনুমতি করেন তো, আপনার ভিক্ষা নির্বাহের ব্যবস্থা আমার এখানেই করি।"

আলাপ পরিচয়ে সাধু শুনিলেন, অমরদাস এক ভক্তিপরায়ণ ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান। গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপূজা সারিয়া পাঞ্জাবে স্বগ্রামের দিকে চলিয়াছেন। গঙ্গামৃত্তিকার তিলক তখনো শোভিত রহিয়াছে তাঁহার কপালে। সাধু সম্মতি দিলেন, কহিলেন, "বেটা দেখছি, তুমি সজ্জন, ভক্তিমান্। বহুত আচ্ছা, আজ তোমার রসুই-করা খানাই গ্রহণ করবো।"

ভোজনের পর দুজনের বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছে। প্রসঙ্গক্রমে সাধু প্রশ্ন করিলেন, "বেটা, তোমার গুরুকরণ হয়েছে কোথায়?"

"বাবা, সে সৌভাগ্য আর হলো কই?" সখেদে জানান অমরদাস। "মনোমত গুরু আজো মেলে নি। দীক্ষা গ্রহণও তাই ঘটে উঠে নি। দেখা যাক্ শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা।"

সাধু চমকিয়া উঠিলেন। রোষ ও বিরক্তিভরা কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি তাহলে অদীক্ষিত ? ছি-ছিঃ। একথা আগে বলো নি কেন ? হায় পরমাত্মা ! কেন আমি আজ এর হাতের অন্ন গ্রহণ করলুম। দীক্ষা না নিলে যে দেহশুদ্ধি হয় না। অশুচি রসুইয়ার রান্না খেয়ে যে আমি পাপ সঞ্চয় করলুম।"

"বাবা, মহারাজ, আমায় মাপ করুন। আমি এত সব জানতুম না। তবে এটা ঠিক, আমি স্নান তর্পণ সেরে এসে রসুই করতে বসেছি, আপনার অন্ন ভক্তিভরেই তৈরি করেছি।"

"না বেটা, তোমার কোনো দোষ নেই। দোষ আমার। আমারই আগে থেকে এ খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। তুমি বয়স্ক ব্যক্তি, ভক্তিমান্, নিষ্ঠাভরে তিলক কেটেছো, আমি ধরে নিয়েছিলাম, তুমি অবশ্যই কোথাও দীক্ষা গ্রহণ করেছো। যাক্ যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। আবার আমায় গঙ্গার ধারে ফিরে যেতে হবে। গঙ্গা স্নানে শুচি হয়ে, প্রায়শ্চিত্ত ও পুরশ্চরণ করতে হবে।"

"বাবা মহারাজ, আমারই দোষে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে, আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।"

সাধু ইতিমধ্যে কিছুটা শান্ত হইয়া আসিয়াছেন। কহিলেন, "বেটা, শুধু দেহশুদ্ধির জন্যই গুরুকরণের প্রয়োজন তা নয়, পরম-প্রাপ্তির জন্যও চাই গুরুকৃপা, গুরু হচ্ছেন সূর্য, তাঁর কৃপার আলোয় স্নান করলে তবেই তো শিষ্যের জীবন-কমল ফুটে উঠবে। মুক্তি মিলবে যে গুরুরই কৃপায়। তবে হ্যাঁ, সদ্‌গুরু পেতে হবে, তিনিই সফল করতে পারেন সর্ব অভীষ্ট।"

তল্পিতল্পা গুটাইয়া সাধু আবার ফিরিয়া চলিলেন গঙ্গার দিকে।

অমরদাস তখন বিষাদখিন্ন হৃদয়ে নীরবে বসিয়া ভাবিতেছেন। সাধুর কথা তো মিথ্যা নয়। জীবন ভরিয়া যত কিছু সৎ কাজ ও ধর্মাচরণ তিনি করিয়াছেন, তার সব কিছুই যে নিরর্থক। গুরুকরণ ও দীক্ষার অভাবে যাহার দেহশুদ্ধিই হয় নাই, মুক্তির কথা, পরমপ্রাপ্তির কথা তো তার কাছে সুদূরপরাহত !

নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন অমরদাস। কিন্তু মন তাঁহার ভারাক্রান্ত, বেদনাহত। সাধুর কণ্ঠে সেদিন যে অপ্রিয় সত্য উচ্চারিত হইয়াছে, বার বার তাহারই অনুরণন চলিয়াছে অন্তরে।

সেদিন অতি প্রত্যূষে জপ ধ্যান সারিয়া, বাড়ির ছাদের এক কোণে নীরবে বসিয়া আছেন অমরদাস, হঠাৎ কানে আসিল সুমধুর নারী-কণ্ঠের এক অপূর্ব স্তবগান। এ গানের সংবেদন উত্তাল করিয়া তুলিল সমগ্র সত্তাকে। গুরুকৃপার সুধানিষিক্ত এই স্তবগানের প্রতিটি পদ তিনি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন :

পরম প্রভু বসে আছেন তাঁর সিংহাসনে
অমৃত স্বরূপ হয়ে—
কি করে পৌঁছুবে তাঁর চরণ তলে
না মিলে যদি সদ্‌গুরুর কৃপার হাওয়া ?
কোন ভেলা কোন খেয়া তরীই পৌঁছুবেনা ওপারে।
স্বর্ণময় প্রাচীরে বেষ্টিত আমার প্রভুর প্রাসাদ,
ভেতরে রয়েছে তার মণিমুক্তো হীরের পাহাড়,
কি করে পৌঁছুবে সেথায় গুরুদত্ত মই ছাড়া ?
গুরু-ধ্যানের ভেতর দিয়ে চলে যাও প্রভুর সকাশে,
গুরুর আলোকে দর্শন কর তাঁকে।
সদ্‌গুরু ছাড়া জানেনা যে আর কেউ
খেয়া পারাপারের কৌশলী সন্ধান।
গুরু-রূপী তরণী সহায়ে ঘটবে তোমার উত্তরণ
পাবে তোমার চিরদিনের ধ্যেয় সেই পূর্ণ স্বরূপকে।

এই স্তবগানের সঙ্গে ঝংকৃত হইতেছে মধুনিষ্যন্দী রবাব—সুর তাল লয়ের অপরূপ এক মোহজাল বিস্তারিত হইয়াছে চারিদিকে।

প্রাণ গলানো স্তবগাথার ভিতর দিয়া কে ছড়াইতেছে এই স্বর্গীয় আনন্দধারা ? অমরদাস তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গেলেন, খোঁজ নিয়া জানিলেন, এই ভজন সংগীত গীত হইতেছে তাঁহারই ভ্রাতার গৃহে। কিছুদিন পূর্বে ভ্রাতার এক পুত্র শিখগুরু অঙ্গদের কন্যা বিবি

অমরো-কে বিবাহ করিয়াছে, সেই নববধূর কণ্ঠেই শোনা গিয়াছে এই অপরূপ স্তবগান। অভ্যাসমতো প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া রবাব সহযোগে সে এই স্তবগান সম্পন্ন করে, তারপর শুরু করে গৃহকর্ম।

মেয়েটির সহিত তখনি সাক্ষাৎ করেন অমরদাস। প্রশ্ন করেন, "মা, বল তো কার কাছে শিখেছো তুমি এই অপূর্ব সংগীত ?"

"আমার বাবার কাছে, গুরু অঙ্গদের কাছে," সলজ্জভাবে উত্তর দেয় সে।

কোন্ এক দিব্য আনন্দের স্রোত অমরদাসের মনপ্রাণ উদ্বেল। সেই মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করিলেন, যে সদ্‌গুরুর আশ্রয়ের জন্য তিনি এত ব্যগ্র হইয়াছেন, সেই গুরু অঙ্গদ ছাড়া আর কেউ নয়। ঈশ্বর চিহ্নিত এ মহাপুরুষের চরণেই করিবেন তিনি আত্মসমর্পণ, যাত্রা করিবেন পরমা মুক্তির পথে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিবি অমরো-কে সঙ্গে নিয়া অমরদাস উপস্থিত হন গুরু অঙ্গদের ধর্মসভায়। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জাগিয়া উঠে নূতনতর চেতনা, নূতনতর প্রত্যয়—এই যে তাঁহার সদ্‌গুরু, তাঁহার ইহলোক পরলোকের ঈশ্বরচিহ্নিত মহান্ কাণ্ডারী, এই কাণ্ডারীর হাতেই জীবন মরণের সকল কিছু দায়িত্ব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

গুরু অঙ্গদের চোখে মুখে দিব্য আনন্দের ছটা। এতদিন পরে উত্তর সাধকের দর্শন তিনি পাইয়াছেন, শিখ মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ-নেতা দৈবযোগে আসিয়া ধরা দিয়াছেন তাঁহার কাছে। সোৎসাহে দুই বাহু প্রসারণ করিয়া গুরু মহারাজ আলিঙ্গন দিলেন অমরদাসকে, চিরতরে দিলেন তাঁহাকে আশ্রয়। উত্তরকালে এই অমরদাসেরই অভ্যুদয় আমরা দেখি শিখ সম্প্রদায়ের তৃতীয় গুরু রূপে।

ঋদ্ধি ও সিদ্ধির যে আলো অমরদাস তাঁহার তপস্যাপূত জীবনে প্রজ্বলিত করেন উত্তরকালে তাহা অগণিত শিখ সাধককে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে, পৌঁছাইয়া দিয়াছে মুক্তির তোরণ-তলে।

অমৃতসরের নিকটবর্তী বসরকা গ্রাম। এই গ্রামে, ভল্ল শ্রেণীর এক ক্ষত্রিয় বংশে, ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অমরদাস ভূমিষ্ঠ হন। পিতার নাম তেজভান্, মাতা—ভক্ত কাউর।

পিতার তিনি প্রথম সন্তান। কৃষির জমি ও পৈতৃক ব্যবসায় হইতে যে আয় ছিল তাহা দিয়া বেশ সচ্ছলভাবেই সংসারের ব্যয় নির্বাহ হইত। অমরদাসের বয়স যখন চব্বিশ বৎসর, তখন তাঁহার বিবাহ হয়। নিষ্ঠাবান্ ভক্ত বৈষ্ণবের গৃহ তাঁহাদের। পত্নী মনসাদেবী সহ অমরদাস দৈনন্দিন জীবনে বৈষ্ণবীয় আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করিয়া চলিতেন।

দুই পুত্র, দুই কন্যা ও অন্যান্য আত্মপরিজনসহ ধনে জনে পূর্ণ ছিল তাঁহাদের গৃহ। এই গৃহের দরজায় আসিয়া অতিথি ও দুঃখী মানুষ কখনো ফিরিয়া যাইত না। বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সাধু-সন্তদের সাহায্য দানে অমরদাস ও তাঁহার পত্নীর উৎসাহের সীমা ছিল না।

সে-বার গঙ্গাতীর হইতে ফিরিবার পথে দীক্ষা গ্রহণের যে আকুতি অমরদাসের অন্তরে জাগ্রত হয়, ঘটনাচক্রে তাহাই তাঁহাকে টানিয়া নিয়া যায় গুরু অঙ্গদের সকাশে। নূতনতর সাধন পথে শুরু হয় তাঁহার অভিযাত্রা।

খাদূরে আসিয়া গোড়াতেই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটে অমরদাসের। গুরু অঙ্গদের রসুই কুঠির খ্যাতি তখন সকলেরই জানা ছিল। সম্প্রদায়ের প্রথামতো ভক্ত শিষ্যেরা এই কুঠিতেই একসঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেন, আর সবার জন্য রন্ধন করা হইত একই রকমের খাদ্য।

সেদিন রসুই কুঠিতে মাংস রান্না করা হইতেছে। সবার জন্যই সেদিন মাংস রুটির ব্যবস্থা। কথাটি নবাগত ভক্ত অমরদাসের কানে গেল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, ‘চিরজীবন আমি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবের জীবন যাপন ক'রে এসেছি। মাছ মাংস কোনোদিন স্পর্শ করি নি। গুরুর এখানে এসে আজ শেষটায় কি আমায় মাংস খেতে হবে? গুরু তো শুনেছি অন্তর্যামী। তিনি কি বুঝবেন না যে

আমি নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত? আমি নূতন এসেছি, আমার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করবেন না?'

তাঁহার এ মনোভাব গুরু অঙ্গদের অজানা রহিল না। তখনি রসুই কুঠিতে খবর পাঠাইলেন, "অমরদাসের খাওয়া সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা রাখো। তার জন্য থাকবে নিরামিষ ডাল রুটি।"

এবার অমরদাসের মনে উদিত হইল নূতন চিন্তা—'আচ্ছা, গুরু তো সব কিছু জেনে শুনেই আমার জন্য আমিষ খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। নিশ্চয় তাঁর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। আমার সংস্কার ও চিরাচরিত অভ্যাসকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে হয়তো নূতন মানুষ তিনি করতে চাইছেন আমায়। মূর্খের মতো আমি তাতে বাধা দিচ্ছি। নাঃ, যে আশ্রয়ে এসেছি, সেখানকার রীতি নীতিই আমি গ্রহণ করবো।"

রসুইয়াদের জানাইয়া দিলেন, আমিষই তিনি গ্রহণ করিবেন। আহারের সময় গুরু লক্ষ্য করিলেন, অমরদাস তাহার পূর্ব সংস্কার মুছিয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইলেন এই নবীন শিষ্যের দিকে। অমরদাসের মন ততক্ষণে হাল্কা হইয়া উঠিয়াছে। হাঁফ ছাড়িয়া তিনি বাঁচিয়াছেন।

পরের দিন গুরু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইলেন। স্মিতহাস্যে কহিলেন, "সবাইকে ভাগ ক'রে দেবার মতো যে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে, সব শিখেরা এক পঙ্‌ক্তিতে বসে যা খাবে, তাই আমাদের রীতি। নিরামিষ আমিষের বিচার বড় নয়, বড় হচ্ছে সেই বিচার যা নির্দেশ দেয়—সদাই পরিহার করো পরের ধন সম্পদ, পরনারী, পরনিন্দা, ঈর্ষা, লোভ আর অহংকার।"

অমরদাসকে গুরু ভাঙিয়া চুরিয়া নিলেন কয়েকদিনের মধ্যে। তারপর নিজের অনেক কিছু সেবার ভার, শিখদের ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন এই নবাগত শিষ্যের উপর। অমরদাসও মনে প্রাণে গ্রহণ করিলেন গুরুসেবার মহান্ ব্রত। উপলব্ধি করিলেন, এই সেবা

ব্রতের মধ্য দিয়াই আত্মাভিমান তাঁহাকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে, গুরুসত্তার উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে তাঁহার সর্ব অস্তিত্বে। তবেই জন্মিবে গুরুর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণের, মুক্তি অর্জনের, অধিকার।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই অমরদাস নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন একজন একনিষ্ঠ সাধকরূপে, গুরু এবং শিখ সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেবকরূপে। শুধু গুরুরই নয়, প্রবীণ শিখ সাধকদেরও গভীর আস্থা ও স্নেহ অর্জন করিলেন অমরদাস।

গোবিন্দ নামে এক ভক্ত সে-বার গুরু অঙ্গদের কাছে তাঁহার এক সমস্যা নিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গোবিন্দ ধনবান্ ব্যক্তি, খাদূরের কিছু দূরেই এক বিস্তৃত অঞ্চলের সে অধিকারী। দীর্ঘদিন যাবৎ শরিকদের সহিত ভূসম্পত্তি নিয়া জটিল মামলা চলিতেছিল। গোবিন্দের সংকল্প ছিল, এই মামলায় জয়ী হইলে গুরু অঙ্গদ ও তাঁহার শিখদের উপযোগী একটি জনপদ সে গড়িয়া তুলিবে। মামলায় জয় তাহার হইয়াছে বটে, কিন্তু সংকল্প অনুযায়ী কাজ অগ্রসর হয় নাই। নূতন জনপদ নির্মাণের জন্য যখনই প্রাচীর নির্মিত হইতেছে, রাত্রি যোগে কে যেন তাহা ভাঙিয়া দিতেছে। গোবিন্দের প্রার্থনা, গুরু তাঁহার বিভূতির বলে এই বাধা বিঘ্নকে দূর করিয়া দিন, একবার সেখানে পদার্পণ করুন।

উত্তরে গুরু অঙ্গদ কহিলেন, "গোবিন্দ, তোমার রচিত এই জনপদ হবে শিখদের এক উত্তম সাধনকেন্দ্র। এর নির্মাণকার্য তো ব্যাহত হবার নয়। আচ্ছা, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যবস্থা আমি এখনি করছি।"

অমরদাস সম্মুখেই করজোড়ে দণ্ডায়মান। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গুরু কহিলেন, "আমার প্রতিনিধি হয়ে অমরদাস বাস করবে তোমার সঙ্গে। তার উপস্থিতিতে সব বাধা বিপত্তি তোমার দূর হয়ে যাবে।"

সভায় সমবেত শিখেরা সবাই বিস্মিত, সকলেই এ উহার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইতেছেন। এই তো সেদিন মাত্র অমরদাস

গুরুর আশ্রয় নিয়াছেন, সাধন ভজন করিতেছেন। ইহারই মধ্যে এত বড় একটা স্বীকৃতি গুরু তাঁহাকে দিতেছেন!

গুরু অঙ্গদ এবার স্মিত হাস্যে নিজের পবিত্র রূপোয় বাঁধানো যষ্টিটি অমরদাসের হাতে গুঁজিয়া দিলেন। কহিলেন, "বৎস, আজ থেকে এইটি তোমায় রক্ষা করবে, আর শক্তি যোগাবে। গোবিন্দের আরব্ধ কাজ অবশ্যই সুসম্পন্ন হবে।"

গোবিন্দ ও অমরদাসের চেষ্টায় সুরম্য একটি শিখ উপনিবেশ অচিরে গড়িয়া উঠিল। নির্মাণ কার্য শেষ হইলে অমরদাস ইহার নামকরণ করিলেন গোবিন্দোয়াল। তারপর উভয়ে খাদূরে আসিয়া প্রণত হইলেন গুরুর চরণে। কহিলেন, "আমাদের একান্ত ইচ্ছা, আপনি এই নূতন জনপদে গিয়ে সব শিখ শিষ্যদের নিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করুন। এখন থেকে সেটি হয়ে উঠুক আপনার প্রধান কেন্দ্র।"

গুরু এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। কহিলেন, "আমি খাদূর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না। গোবিন্দ, তুমি আমার একনিষ্ঠ ভক্ত, আমায় তুমি নিজের আরও কাছে পেতে চাচ্ছো, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার প্রিয় শিষ্য অমরদাসই স্থায়ীভাবে বাস করবে গোবিন্দোয়ালে। অমরদাসের সঙ্গ পেয়ে তোমার যেমন কল্যাণ হবে, তেমনি তোমাদের ঘিরে এই নূতন জনপদে একটা বড় শিখ-গোষ্ঠীও গড়ে উঠবে।"

গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়া, তাঁহার সেবা পরিচর্যা ছাড়িয়া, অমরদাস আর একটি দিনও অন্য কোথাও থাকিতে চান না। অশ্রুসজল নয়নে কহিলেন, "আমার প্রতি এমন নির্দয় হবেন না, গুরু। আমায় আপনার কাছে রাখুন, সাধন ভজনের পথ সুগম ক'রে দিন।"

"অমরদাস, আমি ভেবে রেখেছি, খাদূর ও গোবিন্দোয়াল দুই স্থানেই তুমি থাকবে। রাত্রে থাকবে গোবিন্দোয়ালে, আর দিনে খাদূরে আমার সেবাকর্মে। এই দুই স্থানে ছুটাছুটি ক'রেও তোমার সাধন ভজন ও গুরু সেবা অব্যাহত থাকে কিনা, তার পরীক্ষাও এবার হবে, বৎস।"

গুরুর এই ব্যবস্থা অমরদাস শিরোধার্য করিয়া নিলেন। রাত্রে গোবিন্দোয়ালে নিজের সাধন ভজনে ব্যাপৃত থাকিতেন, আর ভক্ত শিখদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করিতেন। পরদিন প্রত্যুষেই ছুটিতেন খাদূরের পথে, সেখানে আপ্রাণ প্রয়াসে করিতেন গুরু সেবা।

তাঁর এসময়কার দিনচর্যার এক মনোজ্ঞ চিত্র দিয়াছেন শিখধর্মের গবেষক এম. এ. ম্যাকলিফ্[১] :

"অমরদাস প্রবীণ ভক্ত, তখন প্রায় বার্ধক্যের কোঠায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এসময়ে ভক্তি ও আত্মোৎসর্গের এক দিব্য বিভা যেন ছড়িয়ে থাক্‌তো তাঁর চারদিকে। শেষ রাত্রে, ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে, গোবিন্দোয়ালে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। ভজন কৃত্যাদি সেরে ছুটে যেতেন পুণ্যতোয়া বিপাশা নদীতে। সেখানে এক বৃহৎ ভাণ্ডে গুরুর নিত্যকার স্নানের জল সংগ্রহ করতেন। তারপর ছুটে চলতেন খাদূরের দিকে। অর্ধেকটা পথ অতিক্রান্ত হবার সময় জপজীর স্তবগুলো তাঁর শেষ হয়ে যেতো। খাদূরে পেঁাছে গুরুকে স্নান করিয়ে 'আশা কি ওয়ার' ভজন সংগীত ভক্তিভরে তিনি শ্রবণ করতেন।

"তারপর গুরু হতো শিখ ভক্তদের রসুই কুঠি সংক্রান্ত কাজের পালা। রান্নার জন্য কুয়ো থেকে জল তুলতেন ভারে ভারে, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ক'রে আনতেন পাশের বন থেকে, বাসনপত্র মেজে ঘষে করতেন পরিষ্কার।

"বিকেলে ধর্মসভায় বসে পবিত্র 'সোদর' তিনি শ্রবণ করতেন। তা সমাপ্ত হলে যোগ দিতেন শিখ ভক্তদের সান্ধ্য প্রার্থনায়। তারপর গুরুর পাদ-সম্বাহন করতেন বহুক্ষণ ধরে এবং তাঁকে বিশ্রামাগারে পাঠানোর পর, রাত্রিযোগে আবার পদব্রজে ফিরতেন নিজের বাসস্থান গোবিন্দোয়ালে। পথ চলার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাক্‌তো গুরুর স্মরণ মনন, জপ এবং ভজন সংগীত। প্রতিদিন ভোরে গোটা পথের মাঝামাঝি স্থানে এসে যেখানে প্রায়ই তিনি তাঁর জপজী সমাপ্ত

১ ম্যাক্স আর্থার ম্যাকলিফ্: দ্য শিখ রিলিজিয়ন, ভল্যু-২

করতেন সে স্থানটিকে ভক্ত শিখেরা বলতেন, দমদমা, অর্থাৎ যেখানে সাধক অমরদাস তাঁর দম ছাড়বার একটু অবকাশ পেতেন। পবিত্র স্থানটিকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য পরবর্তীকালে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। আজো বহু ভক্তিপরায়ণ শিখ নরনারী দমদমার ঐ মন্দির দর্শন করেন, সিদ্ধ সাধক অমরদাসের পবিত্র স্মৃতির করেন অনুধ্যান।"

সাধক অমরদাসকে কেন্দ্র করিয়া এসময়ে গোবিন্দোয়ালে একটি সুসম্বদ্ধ শিখগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। অমরদাসের গুরুনিষ্ঠা ও জীবন-সাধনা তাঁহাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে।

অমরদাস অতঃপর তাঁহার স্বগ্রাম বসরকার বাস উঠাইয়া দিয়া সপরিবারে গোবিন্দোয়ালেই বাস করিতে থাকেন।

সে-বার পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র খরা চলিয়াছে। নদী নালার জল কমিয়া গিয়াছে। পুকুরগুলি শুষ্ক, কৃষি জমির মাঠ ফাটিয়া চৌচির। ঘাসপাতার অভাবে গরু মহিষ মরিতেছে, দুঃস্থ জাঠ কৃষকদের মধ্যে উঠিয়াছে হাহাকার।

খাদূরের অনতিদূরেই তপা নামক এক সাধুর বাস। নিম্ন শ্রেণীর কাহিরা জাঠেরা তাহাকে কিছুটা ভয় ভক্তি করে। এ মহা বিপদে তাহারা সাধুর শরণ নেয়, বলে, "সাধুজী, ক্ষেতের শস্য সব পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। গরু মোষ তো অনেক মরেছে, এবার মানুষও মরবে না খেতে পেয়ে। আপনি তো অনেক তুক্‌তাক্ জানেন। যদি পারেন শিগ্‌গীর বৃষ্টি নামিয়ে দিন, আমাদের প্রাণ বাঁচান।"

তপাসাধু অনেক দিন যাবৎ গুরু অঙ্গদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এবার অঙ্গদকে জব্দ করার সে এক ফন্দী আঁটিয়া বসে। বলে, "বৃষ্টি আমি নামাতে পারি, তা ঠিক। কিন্তু তোরা তো আমার মূল্য বুঝিস নি এতদিন। আমি এত উপবাস, যোগ তপ করছি, মাথায় জটা রেখেছি, তবু তোরা আমায় মান্যি করিস না। তোরা ভিড় করিস গুরু অঙ্গদের সভায়। সেখানে রসুইখানার সামনে গেলেই

গুরু অমরদাস

খেতে পাওয়া যায়, আর সভায় রয়েছে কত আলো রোশনাই হাসি গান। তাই ঐ দিকেই তোদের ঝোঁক। বেশ তো, অঙ্গদকে বল্, সে তোদের জন্য বৃষ্টি নামিয়ে দিক। আর যদি সে না পারে আমিই নামাচ্ছি। কিন্তু তার আগে গুরু অঙ্গদকে এখান থেকে দূরে চলে যেতে হবে।"

মূর্খ কাহিরা জাঠেরা উল্লসিত হইয়া উঠে। বলে, "বেশ, আমরা গুরু অঙ্গদের কাছে গিয়ে এখনি একথা বলছি।"

তপা সাধুর শর্ত, "গুরু অঙ্গদ এস্থান ত্যাগ করুক। তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার ভেতরেই আমি বৃষ্টি নামিয়ে দেব তোদের জন্য।"

জাঠেরা দল বাঁধিয়া খাদূরে উপস্থিত হয়, অঙ্গদকে জানায় সকল কথা।

অঙ্গদ উত্তর দেন, "এ দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে ভগবান আমাদের পরীক্ষা করছেন। তাঁর বিধান উল্টে দেবার চেষ্টা কেন আমি করতে যাবো? বেশ তো, তপা সাধু যদি তা পারে তাহলে সে করুক। আর আমি এখান থেকে চলে গেলে যদি বৃষ্টি নামে, তোমাদের সবার কল্যাণ হয়, তবে আমি সানন্দে এখনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

প্রবীণ শিখ-নেতা ভাই বুধা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "তপা সাধু এই গরীব নিরক্ষর জাঠদের যা ইচ্ছে তাই বোঝাচ্ছে। এটা চলতে দেওয়া যায় না। এখনি এর প্রতিবিধান আমরা করবো।"

ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকাইয়া গুরু অঙ্গদ স্নিগ্ধস্বরে বলেন, "ভাই বুধা, তুমি বিজ্ঞ ও প্রবীণ। জানো তো, আমাদের ধর্মের প্রধান উপদেশ হলো, পাপী আর অপরাধীকে মার্জনা করা।"

শিখদের দিকে তাকাইয়া গুরু কহিলেন, "আমি আমার সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে ফেলেছি। আমি এই মুহূর্তে এ স্থান ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। তোমরা সব শান্ত হয়ে থেকো।"

গুরু তৎক্ষণাৎ খাদূর ছাড়িয়া চলিয়া যান, দূরে পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা এক অরণ্যে গ্রহণ করেন আশ্রয়।

এদিকে ভণ্ড সাধু তপার তপোবল বুঝা গেল। বৃষ্টি নামানোর দাবি পর্যবসিত হইল হাস্যকর ব্যর্থতায়।

পরদিন প্রভাতে খাদূরে উপস্থিত হইয়া ভক্ত অমরদাস দেখেন, গুরু সেখানে নাই, দূর অরণ্যে নিজেকে সরাইয়া নিয়াছেন।

ক্ষোভে ক্রোধে অমরদাস গর্জিয়া উঠিলেন। জাঠদের ডাকিয়া কহিলেন, "তোরা শুধু মূর্খই নয়, কাণ্ডজ্ঞানও তোরা হারিয়েছিস। ঐ ভণ্ড তপা সাধুর ভাঁওতায় ভুলে তোরা গুরু অঙ্গদের মতো মহান্ পুরুষকে হারিয়েছিস। ওরে মাটির প্রদীপ আর সূর্যের তফাতও তোরা বুঝতে পারিসনে? এমনিতেই কর্মদোষে তোরা দুর্দিনে পড়েছিস, এবারকার এই কুকর্মের ফলে আরো দুর্গতি নেমে আসবে তোদের ওপর।"

জাঠেরা উত্তেজিত হইয়া ছুটিয়া যায় তপা সাধুর কাছে, বলে, "তোমার চক্রান্তে ভুলে আমরা গুরু অঙ্গদকে হারালাম। দুর্দিনে তাঁর রসুইখানায় গিয়ে দুমুঠো খেতে পেতাম, সে সুযোগও রইল না। এদিকে তোমার বৃষ্টি নামাবার ক্ষমতাও আমরা বুঝে ফেলেছি।"

তপা তাহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া সময় নেয়, বৃষ্টি নামানোর জন্য অনেক কিছু তুকতাক সে করিতে থাকে।

এবার জাঠদের সবাইকে ডাকিয়া অমরদাস বলেন, "তপা যদি তপোবলে বৃষ্টিই নামাতে পারবে, তবে সে তোমাদের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে ক'রে বেড়ায় কেন? তার অহমিকা, কাম ক্রোধ কিছুই আজো যায় নি, ভণ্ডামী নিয়ে পড়ে আছে। এ হেন লোকের কুহকে ভুলে তোমরা গুরু অঙ্গদের মতো মহাত্মাকে দূরে সরে যেতে দিয়েছো!"

উত্তেজিত জাঠেরা এবার তপা সাধুকে ধরিয়া মারমিট করে, খাদূর হইতে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর জাঠ ও শিখদের এক মিলিত দল গুরু অঙ্গদের অরণ্য-আবাসে গিয়া উপস্থিত হয়, ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁহার কাছে, খাদূরে ফিরিয়া আসার জন্য বার বার মিনতি জানায়।

তপা সাধুর শাস্তির কথা শুনিয়া গুরু ক্ষুব্ধ হন। অমরদাসের দিকে তাকাইয়া বলেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকেও আমার সাধনার মূল কথা তোমরা এখনো হৃদয়ঙ্গম করো নি। সে মূল কথাটি হচ্ছে—শান্তি, সহনশীলতা এবং ক্ষমা, দেখতে পাচ্ছি, প্রকৃত সাধনার ফলে এবং দুঃসহ দুঃখের দহনে যে সহনশীলতা আসে, তা তোমার জীবনে এখনো আসে নি। তপা সাধুর ভণ্ডামী দমন করতে গিয়ে যে কাজ তুমি করেছ, তার পেছনে রয়েছে একদল মূর্খ জনতার কাছে বাহবা নেবার গোপন ইচ্ছা। প্রকৃত শিখ সাধককে আরো পরিশুদ্ধ হতে হবে, অমরদাস।"

গুরুর চরণে পতিত হইয়া অমরদাস বার বার মাগিলেন ক্ষমা ভিক্ষা। করজোড়ে কহিলেন, "এবারকার মতো এ দাসকে ক্ষমা করুন গুরুজী। এর পর থেকে চেষ্টা করবো আপনার উপদেশকে জীবনে রূপায়িত করতে।"

প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু কহিলেন, "অমরদাস, ধৈর্য ও সহনশীলতায় ধরিত্রীর মতো হও। দুঃখ কষ্টের ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে থাকো পর্বতের দৃঢ়তা নিয়ে। হৃদয়ে সদাই সঞ্চয় ক'রে রাখবে ক্ষমার ঐশ্বর্য, আর তোমার প্রতি যে যত অন্যায়ই করুক না কেন তার কল্যাণ সাধনে থাকবে সতত উন্মুখ। সত্যকার সাধকের দৃষ্টিতে থাকবে সমদর্শিতা, সোনা আর ধূলিমুষ্টিতে পার্থক্য সে করবে কেন? নম্রতার ভেতর দিয়েই হয় জীবন সাধনার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। হীরে আর মুক্তো, দেখতে কত ক্ষুদ্র, কিন্তু তার মূল্য কি বিপুল! বৃক্ষের একটা ক্ষুদ্র বীজ কি বিরাট বনস্পতিতে পরিণত হয়, দেখেছো তো?"

অমরদাস প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়া গুরু অঙ্গদ আবার খাদূরের দিকে রওনা হইলেন। পথে পড়িল ভইরো নামক এক গ্রাম। এই গ্রামে গুরু অঙ্গদের এক পুরাতন বন্ধু বাস করিতেন, নাম তাঁহার খিওয়ান। গুরুর আগমন সংবাদ শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন,

পরম সমাদরে নিয়া গেলেন তাঁহার নিজের ভবনে। অতিথিদের পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হইল।

এই সময়ে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় অমরদাস সহসা বলিয়া উঠিলেন, "খিওয়ানের মতো হৃদয়বান্ ব্যক্তি বড় কম দেখা যায়। তদুপরি তিনি আমাদের গুরুর পূর্বতন বন্ধু। কিন্তু দেখছি, তাঁর কোনো পুত্র সন্তান নেই। আহা, এ দুর্ভাগ্য তাঁর দূর হোক, অচিরে একটি পুত্র রত্ন তিনি লাভ করুন।"

সঙ্গী শিখ ভক্তেরা সবাই চমকিয়া উঠিলেন, এ কি অদ্ভুত কাণ্ড অমরদাসের! গুরু এখনো জীবিত, শুধু জীবিত নয় সশরীরে সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান। আর অমরদাস কিনা তাঁহারই কাছে দাঁড়াইয়া খিওয়ানকে বর দিতেছেন—একটি পুত্র লাভ হোক তাঁর। তবে কি গুরুর ভূমিকা গ্রহণের অভিলাষ তাঁহার হইয়াছে? এ অহমিকা তো ভালো নয়!

ইতিমধ্যে অমরদাসেরও হুঁশ আসিয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছেন, গুরুর সাক্ষাতে এ ধরনের উক্তি করা শোভন হয় নাই। শুধু তাহাই নয়, গুরুর উপদেশের অবমাননাই তিনি করিয়াছেন। এখনো প্রকৃত সংযম তাঁহার জীবনে আসে নাই।

করজোড়ে গুরুর কাছে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে গুরু সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "অমরদাস, শান্ত হও, এতে তোমার কোনোই দোষ নেই। হ্যাঁ, তাহলে সর্ব সমক্ষেই আমাকে আসল কথাটি বলতে হচ্ছে। আমার আলো তোমার ভেতরে প্রবিষ্ট হয়েছে, বৎস। এখন থেকে মাঝে মাঝে তোমার ভেতর দিয়ে আমার কথা, আমার তত্ত্ব ফুটে বেরুবে। কাজেই, কোনো কিছু বলার সময় তুমি হুঁশিয়ার থেকো[১]।"

খাদুরে পৌঁছিবার কিছুদিন পরে গুরু অঙ্গদ একদিন অন্তরঙ্গ সহচরদের কাছে অমরদাসের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "তোমরা দেখবে, উত্তরকালে অমরদাস বহু মুক্তিকামী নরনারীকে উদ্ধার করবে।

১ এম. এ. ম্যাকলিফ: দ্য শিখ রিলিজিয়ন, ভালু ২

তার স্বরূপ আমি বুঝে নিয়েছি। তার চোখ দুটো ধন্য, তা দিয়ে সে দর্শন করে সদ্‌গুরুকে। হাত দুটো নিয়ত করে গুরুসেবা। তার চরণযুগল ধন্য, তা সদাই তাকে বহন ক'রে নিয়ে যায় উচ্চকোটির মহাত্মাদের কাছে। তাঁর কান দুটো ধন্য, তা দিয়ে শ্রবণ করে ভগবানের পুণ্যময় প্রশস্তি। তার জিহ্বা ধন্য, তা দিয়ে নিরন্তর সে উচ্চারণ ক'রে চলেছে নানকজীর মধুময় স্তব।"

পাশে দাঁড়ানো প্রবীণ ভক্তেরা গুরুর মুখের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। সাধক অমরদাসের মাহাত্ম্য তাঁহাদের কাছে সেদিন আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

গুরু অঙ্গদের একটি প্রথা ছিল—প্রতি ছয় মাস অন্তর মণ্ডলীর শ্রেষ্ঠ শিখ ভক্তকে তিনি একটি সম্মানসূচক জোব্‌বা দান করিতেন। অমরদাসের ভাগ্যে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইত এই বিশেষ সম্মান। যে সব জোব্‌বা তিনি পুরস্কার পাইতেন সবগুলিই পরম পবিত্রজ্ঞানে মাথায় জড়াইয়া রাখিতেন। এভাবে ক্রমে তাঁহার মাথায় জমিয়া উঠে পরিচ্ছদের এক বৃহৎ স্তূপ। ঈর্ষাপরায়ণ ভক্তেরা কহিত, "অমরদাসের সব কিছুই উদ্ভট। মাথাটা আজকাল ওঁর খারাপ হয়েই গিয়েছে।"

প্রকৃতপক্ষে গুরুর কৃপায় গুরুগতপ্রাণ অমরদাস ধীরে ধীরে পরিণত হইতেছেন এক উচ্চকোটির সাধকে। বাসনামুক্ত, সংযতমনা, বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষরূপে ঘটিতেছে তাঁহার আন্তর বিবর্তন। এসময়ে সাধনার গভীরে সতত থাকিতেন নিমজ্জিত, আর বহিরঙ্গ জীবনে গুরুসেবা, আর্তত্রাণ আর জনসেবায় তিনি সদা নিরত।

একবার দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর গুরু অঙ্গদের পায়ে একটি মারাত্মক ঘা হয় এবং কিছুদিনের মধ্যে সেটি পাকিয়া যায়। গুরুর পদসেবা করিতে বসিয়া এ অবস্থাটি অমরদাসের নজরে পড়ে। প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলেন, "হয়তো এ ঘায়ে পুঁজ জমে উঠেছে, তীব্র বেদনায় কয়েক রাত যাবৎ আমার ঘুমও হচ্ছে না।"

তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম কি করিয়া করা যায় অমরদাস ভাবিতে লাগিলেন। তারপর পন্থা স্থির করিতে দেরি হইল না। ঘায়ের মুখে নিজের মুখটি লাগাইয়া সবটা পুঁজ রক্ত শুষিয়া নিলেন। ব্যথা তখনি কমিয়া গেল, আরাম পাইয়া গুরু নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন। এমনি অনায়াস এবং স্বতস্ফূর্ত ছিল নিষ্ঠাবান্ শিষ্য অমরদাসের গুরুসেবা।

পরদিন প্রসন্নমনে গুরু বলেন, "অমরদাস, সেবানিষ্ঠা দিয়ে তুমি আমায় কিনে নিয়েছ। তুমি আমার কাছ থেকে তোমার ইচ্ছামতো বর চেয়ে নাও।"

উত্তরে অমরদাস বলেন, "গুরুজী, আমি জানি আপনি বিপুল যোগবিভূতির অধিকারী। আমি চাই, আপনি নিজের দেহে এসব দুঃসহ রোগ আর ভোগ করবেন না। আপনি শক্তি বলে দেহ থেকে রোগকে করবেন নিষ্কাশিত। আপনার রোগভোগ আর কাতরোক্তি আমি কোনোমতেই সহ্য করতে পারিনে।"

"তা হয় না অমরদাস। দেহের সুখ ও অসুখ দুই-ই ভগবানের দান। এ দুটোই সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে তাঁর হাত থেকে। বরং অসুখের জ্বালাকে আমি উপকারী বন্ধু বলে মনে করি, তা বেশী ক'রে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উদ্ধারকারী ভগবানের কথা।"

জরা ও ব্যাধির আক্রমণে গুরু অঙ্গদের দেহ কিছুদিন যাবৎ জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। একদিন তিনি অন্তরঙ্গ শিষ্য ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "সিদ্ধ সন্তেরা যেন ভগবান প্রেরিত মেঘমালা। নানা আকারের দেহ ধারণ ক'রে তাঁরা কল্যাণ বর্ষণ করেন জনসমাজে। তারপর একদিন বিলীন হয়ে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে। পরিচ্ছদ বদলানোর মতো দেহটি বার বার তাঁরা বদলান বটে, কিন্তু আত্মা থাকেন নির্বিকার, অক্ষয়, অব্যয়। এবার কিন্তু আমার এ জীর্ণ পরিচ্ছদটা বদলে নেওয়া দরকার। কিন্তু তোমরা ভেবো না, এই

আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার যোগবন্ধনে যাঁরা বাঁধা পড়েছেন, তাঁরা আমায় সব সময়েই পাবেন তাঁদের পাশে।"

শিষ্যরা বুঝিলেন, গুরুর বিদায় আসন্ন। স্বভাবতই মন তাঁহাদের বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

গুরুর দেহান্তের পরে কে তাঁহার সাধন-ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হইবেন, কে এই ক্রমবর্ধমান শিখ মণ্ডলীকে পরিচালিত করিবেন, এই প্রশ্ন তখন অনেকেরই মনে উদিত হইতেছে।

গুরু অঙ্গদ কিন্তু নিজে মনে মনে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াই রাখিয়াছেন। তিনি জানেন, সাধনার সাফল্য, চরিত্রবল এবং ঔদার্যের গুণে অমরদাসের জুড়ি কেহ নাই। কিন্তু গুরুর প্রয়াণের পর মণ্ডলীর সবাই কি তাঁহাকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিবে? তাঁহার নিজের পুত্রদ্বয় এবং আরও কয়েকজন প্রবীণ শিখ অমরদাসকে তাঁহার যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দিতে তেমন রাজী নয়। তাই ইঁহাদের দৃষ্টি সমক্ষে অমরদাসের মাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটনে তিনি প্রয়াসী হইলেন।

তখন গ্রীষ্মকাল। কয়েকদিন যাবৎ প্রচণ্ড গরম চলিতেছে। ইঁদারা ও পুষ্করিণীতে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। ভোরবেলায় বিপাশা নদী হইতে ভাঁড়ে করিয়া ভক্তেরা যে জল বহন করিয়া আনে, দিন ভরিয়া তাহাই সবাই পান করে। সেদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল, পানীয় জলের ভাণ্ড একেবারে শূন্য। হঠাৎ কাহারো তৃষ্ণা পাইলে জল সরবরাহের কোনো উপায় নাই।

গভীর রাতে দেখা দিল এক প্রচণ্ড ঝড়। বৃষ্টিপাতও চলিল বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ। এতদিন পরে ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, সেবক ও ভক্তেরা সবাই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এমন সময়ে গুরু অঙ্গদ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, দুই পুত্রকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া কহিলেন, "আমার প্রবল তৃষ্ণা পেয়েছে। এখন কি করা যায়? ঘরে তো দেখছি, এক ফোঁটা পানীয় নেই। এই গভীর রাতের অন্ধকারে কে বিপাশা থেকে জল আনতে পারবে, বল তো?"

পুত্রেরা আরামে নিদ্রা দিতেছেন, ডাকাডাকির পর পাশ ফিরিয়া শুইলেন। জল আনা বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করিলেন না।

অমরদাসের ঘুম ইতিমধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি গুরুর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনার চরণের দাস যে এখানে হাজির রয়েছে। আপনি অপেক্ষা করুন, এখনই বিপাশা থেকে আমি জল নিয়ে আসছি।"

তখন মধ্য রাত্রি। ঝড় বাদলে সারা পথ প্রান্তর অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় জলের ভাণ্ড মাথায় নিয়া বিপাশা হইতে জল সংগ্রহ করা বড় সহজ কাজ নয়।

গুরু কহিলেন, "না অমরদাস, তুমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছো। এ বয়সে এই রাতে বিপজ্জনক রাস্তায় তোমার যাওয়া ঠিক নয়।"

"প্রভু, আপনার তৃষ্ণার জল আনতে হবে, একথা শোনামাত্রই যে আমার বয়স কমে গিয়েছে, যুবকের শক্তি ও সাহস এসে গিয়েছে আমার দেহে। আমি এক্ষুনি জল নিয়ে আসছি।"

দ্রুতপদে বিপাশার তীরে গিয়া উপস্থিত হন অমরদাস। গুরুর জন্য পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডটি কাঁধে তুলিয়া নিলেন, তারপর অস্ফুটস্বরে জপজী গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া চলিলেন খাদূরে।

নগরের উপান্তে একদল জোলার বাস। তাহাদের ঘরের পাশে বহুসংখ্যক গর্ত, এগুলিতে পা রাখিয়া তাহারা তাঁত বোনে। বৃষ্টিতে এই গর্তগুলিতে জল জমিয়া গিয়াছে। পথ চলিতে চলিতে গর্তস্থিত একটি বাঁশের খুঁটিতে অমরদাসের পা সজোরে ধাক্কা খায় আর সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও জলের ভাণ্ডটি তিনি ছাড়েন নাই, কোনোমতে উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন।

'এত রাত্রে কিসের শব্দ? চোর ডাকাত কেউ নয় তো? জোলারা দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া পড়ে। নিকটে আসিয়া দেখে, এ যে গুরু অঙ্গদের বর্ষীয়ান্ চেলা অমরদাস, পানীয় জলের ভাঁড় নিয়া আশ্রমে ফিরিতেছে।

পরিচিত এক জোলা রমণী বলিতে থাকে, "যাক্, বাঁচা গেল, চোর ডাকাত কেউ নয়। এ সেই বুড়ো অমরু, দিনরাত পাগলের মতো গুরুর আশ্রমের জল টানছে, লাকড়ি নিয়ে আসছে। অথচ নিজের স্ত্রীপুত্রের দিকে এতটুকু নজর নেই, ক্ষেতি আর কারবার চুলোয় গিয়েছে। কি অদ্ভুত মানুষ এই অমরু! বুড়ো বয়সে বিশটা জোয়ান মানুষের কাজ একহাতে ক'রে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর তার গুরুই বা কম অদ্ভুত কি? বাড়িতে এক লঙ্গরখানা তৈরি করেছে, দিনরাত চলছে নিষ্কর্মাদের হৈ-হুল্লোড়।"

যতক্ষণ অমরদাসের সম্বন্ধে নিন্দা সমালোচনা হইতেছিল তিনি নীরবে তাহা শুনিয়াছেন, একটি কথাও বলেন নাই। কিন্তু গুরুর সম্পর্কে জোলাপত্নীর তাচ্ছিল্য-ভরা উক্তিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তুমি পাগল হয়ে গিয়েছো, তাই দেবতুল্য গুরু সম্পর্কে এমন আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছো।"

বাক্‌সিদ্ধ অমরদাসের কথা কিন্তু সেই মুহূর্তেই ফলিয়া উঠে। জোলা-গিন্নী উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করিয়া দেয়।

অমরদাস আশ্রমে ফিরিয়া আসেন, তৃষ্ণার্ত গুরুকে সযত্নে পান করান বিপাশার জল। তারপর হৃদয় তাঁহার শান্ত হয়।

পরের দিন একদল জোলা সেই উন্মাদ রমণীকে নিয়া অঙ্গদের সভায় আসিয়া হাজির। কাতর কণ্ঠে করজোড়ে তাঁহারা নিবেদন করে, "গত রাতে অমরদাস একে গাল দিয়েছে পাগল বলে, তারপর থেকেই এর মাথা গেছে বিগড়ে। ওঝা, কবরেজ কত কিছু দেখানো হয়েছে, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। উন্মাদ রোগ কেবল বেড়েই চলেছে। আপনি এক্ষুণি এর একটা বিহিত করুন।"

অন্তরঙ্গ শিখ ভক্তেরা গুরুর চারিদিকে বসিয়া আছেন, সকলেরই চোখে মুখে কৌতূহল ও বিস্ময়ের ছাপ। গুরু তাহাদের দিকে তাকাইয়া বলিতে থাকেন, "অমরদাসের সাধনা, তাঁর গুরুসেবা সফল হয়েছে। সিদ্ধির আলোয় আজ সে আলোকিত। সাধকের এই অবস্থায় প্রকৃতি আপনা হতে তার কাজ সুসম্পন্ন ক'রে দেয়, তার

ক্ষীণতম ইচ্ছাটি এক মুহূর্তে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সে মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করেছে এই রমণী সম্পর্কে তাই তৎক্ষণাৎ ঘটে উঠেছে। এতে কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই। অমরদাস বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ, তার কথা তো ফলতেই হবে।"

শিখ ভক্তশিষ্যেরা সবাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে অমরদাসের দিকে তাকাইয়া আছেন, আর জোলাদের মুখপাত্রটি গুরুর কাছে বার বার মিনতি জানাইতেছেন, "আপনি একবার কৃপাদৃষ্টি দিন, এই মেয়েটির ভুলের প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হয়েছে, এবার সে সুস্থ হয়ে উঠুক।"

এবার উন্মাদ নারীর দিকে নিবদ্ধ হয় গুরু অঙ্গদের স্নিগ্ধ দৃষ্টি। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন, "হ্যাঁ মা, তুমি এখন যেতে পারো, তোমার রোগমুক্তি ঘটেছে। আর কোনো চিন্তার কারণ নেই।"

শিখ শিষ্য ভক্তদের দিকে তাকাইয়া গুরু সহাস্যে কহিলেন, "অমরদাসের গুরু সেবার এই কাহিনীটিকে কিছুদিন জনমানসে জাগরূক রাখা ভাল। কি বল তোমরা? হ্যাঁ, জোলাদের পল্লীতে যে শালের খুঁটিতে অমরদাসের পা ধাক্কা খেয়েছিল, সেই শুকনো খুঁটিটি আবার বেঁচে উঠবে, সেটি পরিণত হবে এক সজীব ও পুষ্পিত শালবৃক্ষে। আরো তোমরা জেনে রেখো, আপনভোলা বৈরাগ্যবান্ অমরদাসকে অনেকে গৃহহীন, ছন্নছাড়া পাগলাটে মানুষ বলে ভাবে বটে, কিন্তু একদিন এই অমরদাস আশ্রয় দেবে সহস্র সহস্র মানুষকে, নিঃস্বকে দেবে খাদ্য আর বস্ত্র, দুর্বলকে দেবে শক্তি, মুক্তিকামী মানুষকে দেবে দিব্যজীবনের আস্বাদ।"

গুরুর চোখে মুখে খুশীর উচ্ছলতা। প্রিয় পার্ষদদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "অমরদাসের প্রস্তুতির পালা সমাপ্ত। সাধনা তার পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। এবার আমার কাঁধের ভার চাপাতে চাই তার ওপর। কারণ, আমার এদেহে আর থাকবার প্রয়োজন নেই।"

আদেশ পাওয়া মাত্র সেবকেরা একটি নারিকেল, পাঁচটি তাম্রমুদ্রা এবং একটি নূতন জোব্বা আনিয়া দেন। নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে গুরু অঙ্গদ প্রিয় শিষ্য অমরদাসকে অভিষিক্ত

করেন, উপবেশন করান গুরুর আসনে। দরবার মুখর হইয়া উঠে নূতন ধর্মনেতা অমরদাসের জয়ধ্বনিতে।

অঙ্গদের ইঙ্গিতে সব ভক্ত শিষ্যেরা অমরদাসের চরণ বন্দনা করেন। নূতন গুরুর অভিষেক উৎসবে যোগদান করেন শহরের এবং দূর দূরান্তের ভক্ত নরনারী। অঙ্গদ প্রকাশ্যে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি কয়েকদিনের ভেতরেই এ মরদেহ ত্যাগ ক'রে চলে যাচ্ছি। যাবার আগে গুরুর আসনে, পরমশ্রদ্ধেয় নানকজীর আসনে, উপবেশন করিয়ে গেলাম গুরু অমরদাসকে। যে শিখ অনন্যভাবে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করবে, ইহজগতে পাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর পরলোকে পাবে পরমা মুক্তি।"

অমরদাসকে ঘিরিয়া শুরু হয় শিখ সাধক ও ভক্তমণ্ডলীর সাদর সম্ভাষণ ও সম্বর্ধনা।

পূর্ব নির্ধারিত দিনে অঙ্গদের তিরোধান ঘটে, তিরোধানের পূর্বে অমরদাসকে বলিয়া যান, "তুমি গোবিন্দোয়ালে গিয়ে স্থাপন করো গুরুর আসন, এবার থেকে সেখানেই গড়ে উঠুক শিখধর্মের প্রধান কেন্দ্র।"

গুরু অঙ্গদের প্রয়াণে ভক্ত শিষ্যেরা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এসময়ে প্রাজ্ঞ নেতা ভাই-বুধা সবাইকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত করিতে থাকেন। সবার শেষে নূতন গুরু অমরদাস দান করেন তাঁহার আন্তরিক ভাষণ।

গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণনার পর তাঁহার মুখে শোনা যায় আত্মার অবিনাশিত্বের দৃপ্ত ঘোষণা। উদ্দীপিত স্বরে তিনি বলেন, "গুরু অঙ্গদ অমর, অবিনশ্বর। মানুষের দেহ যেমন জন্মলাভ করে তেমনি আবার তা বিনষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের আত্মার কোনো বিনাশ নেই, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা অনাদি অনন্ত। সাধু মহাপুরুষেরা মরজীবনকে দেখেন নিতান্ত অস্থায়ী বস্তু বলে। পক্ষী সাময়িকভাবে বৃক্ষের নীড়ে আশ্রয় নেয়, ডিম পাড়ে, খাদ্য আর খড়কুটো নিয়ে ছুটোছুটি করে। তারপর উড়ে চলে যায় আর এক কুলায়ে। আত্মার মরদেহ

আশ্রয়ও ঠিক এমনি অস্থায়ী। জীবন যে নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী, এই শিক্ষাটি পাওয়া যায় সিদ্ধ মহাপুরুষদের কাছে। তাঁদের এই শিক্ষাকে তোমরা জীবনে ও আচরণে রূপায়িত করো। অমরলোকে, সূক্ষ্ম-লোকে, দিব্য চেতনার যে ধারা প্রবাহিত তার সঙ্গে যোগ স্থাপন করো, তবেই সংসারের ভয় ও সংশয় ঘুচবে, অভয় রাজ্যের সন্ধান পাবে, মুক্তি পাবে দেহান্তরে ঘুরে মরবার দুঃখ থেকে।"

অমরদাসের গুরু জীবনের গোড়াতেই দেখা দিল এক বিরাট পরীক্ষা। গুরু অঙ্গদের পুত্র দাতু তাঁহার বিরুদ্ধে স্থাপন করিলেন নিজের দাবি। খাদূরস্থিত গুরুর গদি অধিকার করিয়া ঘোষণা করিলেন, "পিতার আসনে পুত্রেরই স্বাভাবিক অধিকার। আমি আমার পিতার গদিতে উপবেশন করেছি এবং শিখমণ্ডলীর দায়িত্বও নিয়ে নিয়েছি। এখন থেকে ভক্তেরা আমার সভায় উপস্থিত হবে, আমার কাছে ধর্মকথা শুনবে, আমাকেই ভেট দেবে।"

"তোমার পিতা গুরু অঙ্গদ যে অমরদাসকেই গদির উত্তরাধিকারী ক'রে গিয়েছেন।" বলেন এক প্রবীণ শিখ।

তাচ্ছিল্য ভরে দাতু উত্তর দিলেন, "অমরুর কথা বলছেন ? সে তো অকর্মণ্য, বৃদ্ধ। আমাদের পাকশালার জন্য এতদিন জল আর জ্বালানি সে টেনে আন্‌তো। এতবড় একটা শিখ মণ্ডলীর গুরু হবার যোগ্যতা তার কই ?"

বিতর্ক ও সংঘর্ষের পথে না গিয়া শিখেরা সবাই গুরু অমরদাসকে নিয়া স্থানত্যাগ করিলেন, উপস্থিত হইলেন গোবিন্দোয়ালে। এখানে রীতিমতো শুরু হইল নিত্যকার ধর্মসভার অধিবেশন ও সদাব্রতের অনুষ্ঠান।

এদিকে খাদূরে বসিয়া দাতু শুরু করিয়াছেন তাঁহার গুরুগিরি। একদিন দূর অঞ্চল হইতে কয়েকটি ভক্ত শিখ খাদূরে আসিয়া উপস্থিত। গুরু অমরদাসের কাছে ধর্ম-উপদেশ শুনিতে তাঁহারা আসিয়াছে, সঙ্গে আনিয়াছে নানা ভেটদ্রব্য। অমরদাস যে স্থানত্যাগ

করিয়াছেন, এ সংবাদ তাহাদের জানা ছিল না। অতঃপর তাহারা গোবিন্দোয়ালে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান।

আগন্তকেরা চলিয়া গেলে দাতুর এক পার্শ্বচর কহিল, "দেখলেন তো অমরদাসের সভা কেমন জমজমাট হয়ে উঠেছে। নানা অঞ্চল থেকে শিখ ভক্তেরা তাঁর কাছেই এসে জুটছে। দিচ্ছে অজস্র উপহার দ্রব্য। তার ওখানে লোকজনের ভিড় আর খানাপিনা লেগেই আছে। আপনার ভৃত্যের যে প্রভাব প্রতিপত্তি, তার এতটুকু আপনার নেই। যান, একবার গোবিন্দোয়ালে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসুন অমরদাসের কি প্রতাপ!"

ঈর্ষা আর রোষে দাতু অধীর হইয়া উঠেন, সেইদিনই একদল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়া উপস্থিত হন গোবিন্দোয়ালে।

সোহিলা ধর্মসংগীত গীত হইবার পর গুরু অমরদাস তখন প্রশান্ত কণ্ঠে সমবেত শিখ ভক্তদের উপদেশ দিতেছিলেন।

দাতু তাঁহার লোকজন নিয়া চড়াও হইলেন, গর্জিয়া কহিলেন, "এই সেদিন অবধি আমার ঘরে তুমি জলটানা চাকরের কাজ করেছো, আজ এখানে এসে অধিকার ক'রে বসেছো আমার বাবার গদি। হতচ্ছাড়া বুড়ো, বেরোও এখান থেকে।"

একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ দাতু পদাঘাত করিয়া বসেন বৃদ্ধ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় অমরদাসকে।

অমরদাস একটি ইঙ্গিত করিলেই শিখেরা দাতুর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর আচরণে কোনো ক্রোধ বা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তিনি একেবারে ধীর স্থির, সমাহিত। শান্ত স্বরে শুধু কহিলেন, "এবার ক্ষান্ত হও। পায়ে চোট লাগে নি তো তোমার? বেশ তো তুমিই উপবেশন করো এই পবিত্র গদিতে। আমি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

সভা ছাড়িয়া তখনকার মতো গৃহের দোতলার এক নিভৃত কক্ষে অমরদাস চলিয়া গেলেন। ভক্ত শিষ্যদের কহিলেন, "দাতু দুরাত্মা বলে আমাদের তো কাণ্ডজ্ঞান হীন হলে চলবে না। গুরু নানকের.

গুরু অঙ্গদের, পবিত্র গদির মর্যাদা ও শুচিতা রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমাদের ওপর। দাতুর সঙ্গে সংঘর্ষ বা কলহে লিপ্ত হলে তাঁদের পবিত্র নাম কলঙ্কিত হবে। লোকে হাসবে আর বলবে, "ছাখো গুরু নানক আর গুরু অঙ্গদের কি শিক্ষা। এর ভেতরেই গদি নিয়ে নির্লজ্জ কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে শিষ্যদের।"

উত্তেজিত শিখভক্তেরা একথায় কিছুটা শান্ত হইলেন। কিন্তু এ সংকটের একটা সমাধান তো করা চাই। সবাই স্থির করিলেন, পরের দিন ধীরেসুস্থে ভাবিয়া চিন্তিয়া দাতুকে দমন করার একটা উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

এদিকে গভীর রাত্রে শয্যায় বসিয়া গুরু অমরদাস স্থির করিলেন, 'গুরুর গদি নিয়ে কোনোমতেই লজ্জাকর দ্বন্দ্বে আমি প্রবৃত্ত হবো না। গুরুর কাছে যে উপদেশ পেয়েছি তার মূল কথা—সহনশীলতা, আত্ম-সমর্পণ ও নামজপ। সেই মূল তত্ত্বকেই আমি ধরে থাকবো। এসব যা কিছু এখন চলছে, সবই তো গুরুরই পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আমায় উত্তীর্ণ হতেই হবে। হ্যাঁ, আজ এখনি আমি গোবিন্দোয়াল ত্যাগ ক'রে চলে যাবো কোনো নিভৃত স্থানে। সেখানে অজ্ঞাতবাসে থাকবো, আর দিন কাটাবো নিরন্তর জপ ধ্যান ক'রে।'

গোবিন্দোয়াল ত্যাগ করিলেন অমরদাস। শেষ রাত্রে ঘন অন্ধকারের আড়ালে, উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া দ্রুতপদে চলিলেন বহুদিনের ছাড়িয়া আসা নিজের গ্রাম বসরকার দিকে।

ভোরবেলায় গ্রামের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। হঠাৎ সাক্ষাৎ ঘটিল পূর্বপরিচিত এক কৃষকের সঙ্গে। এ অবস্থায় অভাবনীয়রূপে অমরদাসকে দেখিয়া সে বিস্মিত হয়, বলিয়া উঠে, "অমরদাস, বহুদিন পরে আপনার দর্শন পেয়ে বড় খুশী হলাম।"

"হ্যাঁ ভাই, তোমাকে দেখে আর দেশে ফিরে এসে, আমারও কত আনন্দ হচ্ছে।"

"দেশপ্রসিদ্ধ শিখগুরু আপনি। আজকাল সবার মুখে শুনি,

আপনি গুরুর গদি পেয়েছেন। আপনার সিদ্ধির কথা, প্রতিপত্তির কথাও সর্বত্র রটে গিয়েছে। কিন্তু এসময়ে একলাটি এভাবে আপনি কোথা থেকে আসছেন? শুনেছি কত ভক্ত শিখ সদাই আপনাকে ঘিরে থাকে। কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গরা কেউ দেখছি সঙ্গে নেই।"

"হ্যাঁ ভাই, একলাটিই এসেছি। তা তুমি আমায় একটু সাহায্য করতে পারবে?"

"কেন পারবো না? বলুন কি আপনার দরকার। আপ্রাণ চেষ্টায় আমি তা যোগাড় করবো।"

"ভাই, তোমার বাড়ির একটা ক্ষুদ্র ঘরে আমায় কিছুদিনের জন্য স্থান দাও। সেখানে থেকে একান্ত মনে আমি কিছুদিন সাধন ভজন করবো।"

"এ আর একটা বেশী কথা কি? আপনি আমার সঙ্গে চলুন, সে ব্যবস্থা অবশ্যই হবে।"

"কিন্তু একটা শর্ত আছে, ভাই।"

"দয়া ক'রে তা খুলে বলুন।"

"হ্যাঁ, বাড়ির একটি নিরালা ঘর আমায় দেবে। আর তার দরজাটা ইটের গাঁথুনি দিয়ে বন্ধ ক'রে দেবে, শুধু একটা ফোকর থাকবে হাওয়া ঢুকবার জন্য। কোনোমতেই কারুর সঙ্গে আমি দেখা সাক্ষাৎ করবো না, কথা বলবো না। আর আমার ঘরের সামনে পরিষ্কার ক'রে লিখে রাখবে, যে কেউ এই ঘরের দরজা খুলবে ও ভেতরে ঢুকবে, সে আমার শিখ নয়, আমিও তার গুরু নই।"

কৃষক হাসিয়া বলে, "বুঝেছি এ আপনার এক নূতন খেলা। বেশ তো, আপনার শর্ত আমি মেনে চলবো। আপনি আপনার স্বেচ্ছামতোই গোপনে বাস করবেন আমার বাড়িতে।"

গুরু অমরদাস আশ্রয় নিলেন তাহার নিভৃত কক্ষে। এবার অন্তরে বিরাজিত অপার শান্তি ও দিব্য আনন্দ। গুরুর অনুধ্যান আর জপজী আবৃত্তি করিয়া দিন রাতের অধিকাংশ সময় তাঁহার অতিবাহিত হয়।

এদিকে দাতু গোবিন্দোয়ালের গদিতে বসার পর অধিকাংশ ভক্ত শিখই সেস্থান হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িয়াছেন। কেউ বাহির হইয়াছেন পরিব্রাজন ও তীর্থ দর্শনে, কেউ বা লিপ্ত হইয়াছেন নিজস্ব সাংসারিক কাজকর্মে।

দাতুর ধর্মসভায় ভজন গায়কেরা কেউ আজকাল আর আসে না, শ্রোতাদের ভিড়ও তাই নাই। ভক্তদের ভেট ও অর্থাদি দানও বন্ধ হইয়াছে, ফলে রন্ধনশালা ও ভোজনাগার প্রায় শূন্য।

শিখ ভক্তদের এই উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য ও অপমান সহিয়া দাতু আর কতদিন সেখানে বসিয়া থাকিবেন? গোবিন্দোয়ালের আশ্রমে যা কিছু টাকা-কড়ি ও মূল্যবান তৈজসপত্র ছিল সব একটি উটের পিঠে চড়াইয়া, ক্ষুণ্ণমনে তিনি পিতার আদি ধর্মকেন্দ্র খাদুরে ফিরিয়া চলিলেন।

এবার পথমধ্যে দেখা দেয় এক আকস্মিক বিপদ। মারণাস্ত্র নিয়া একদল কুখ্যাত ডাকাত দাতুর দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, দামী উটটি এবং উহার পিঠে রক্ষিত অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লুটিয়া নিয়া তাহারা চম্পট দেয়। সংঘর্ষের সময় দাতুর পায়ে বিদ্ধ হয় বর্শার এক তীক্ষ্ণ ফলা। অতঃপর তাঁহার পায়ের ক্ষত পাকিয়া উঠে এবং শয্যাশায়ী থাকিয়া দীর্ঘদিন তাঁহাকে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আহত ঐ পা দিয়াই উদ্ধত দাতু আঘাত করিয়াছিলেন দেবপ্রতিম গুরু অমরদাসকে।

এদিকে দাতু সেখান হইতে চলিয়া গেলে শিখেরা আবার গোবিন্দোয়ালে আসিয়া সমবেত হয়। দাতুর শাস্তি ভগবান নিজেই দিয়াছেন, আর কখনো সে এ-মুখো হইবে না। এবার গুরু অমরদাসকে নিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাঁহারা ইষ্টগোষ্ঠী করিতে পারেন, আবার বসাইতে পারেন ভক্তজনের আনন্দের হাট। কিন্তু গুরু অমরদাস কোথায়? নির্মমভাবে নিজেকে তিনি কোনো গোপন স্থানে সরাইয়া নিয়াছেন।

বনে জঙ্গলে, বিপাশার তীরে তীরে, বহু অনুসন্ধান চালানো হইয়াছে, কিন্তু সবই হইয়াছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

বরাবরই জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে সবাই প্রবীণ এবং সুবিজ্ঞ শিখ ভাই-বুধার শরণ নেন। এবারও তাহাই করা হইল। ভক্তেরা কহিলেন, "ভাই-বুধা একবার গুরু অঙ্গদকে তুমি বার ক'রে এনেছিলে তাঁর অজ্ঞাতবাস থেকে, এবার গুরু অমরদাসকেও এনে দাও, ও শিখধর্মকে তুমি এ বিপদ থেকে রক্ষা করো।"

ভাই-বুধা পড়েন উভয় সঙ্কটে। নিষ্ঠাবান্, গুরুগতপ্রাণ, ভক্ত শিষ্যেরা সবাই মিলিয়া তাঁহার শরণ নিয়াছেন, তাঁহাদের নিরাশ করা সম্ভব নয়। আবার গুরু অমরদাসকে খুঁজিয়া বাহির করিলে পড়িতে হইবে তাঁহার রোষের মুখে। তবে উপায়? অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, গুরুকে আবার গদিতে আনিয়া বসাইতেই হবে, নানকজীর পবিত্র ধর্মকে তো কোনোমতেই বিনষ্ট হইতে দেওয়া যায় না।

ভাই-বুধা কহিলেন, "বেশ, গুরুর সন্ধান আমি এনে দিচ্ছি। যে অশ্বটিতে গুরু সওয়ার হন, তোমরা তাড়াতাড়ি সেটিকে সুসজ্জিত ক'রে নিয়ে এসো। উদ্যোগ করো পদযাত্রার।"

অশ্বটি আনীত হইলে ভাই-বুধা চক্ষু মুছিয়া ভক্তিভরে সোহিলা ও জপজী সমাপ্ত করিলেন। তারপর কহিলেন, "এবার অশ্বটিকে স্বেচ্ছা-মতো চলতে দাও, আর এসো, আমরা সবাই অনুসরণ করি এটিকে। গুরুর গোপন আবাসের খোঁজ অবশ্যই পাওয়া যাবে।"

অশ্বটি কিন্তু একবারও পথ ভুল করে নাই। অনুসন্ধানী শিখদের নিয়া অচিরে উহা উপস্থিত হয় বসরকায় সেই কৃষকের গৃহে, যেখানে গুরু নিভৃতে রহিয়াছেন তপস্যা রত।

কিন্তু নির্দিষ্ট কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সবাই থমকিয়া গেলেন। দেয়ালে লেখা রহিয়াছে এক কঠোর সতর্কবাণী। যে কেউ দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিবে, শিখ বলিয়া সে গণ্য হইবে না। অমরদাসকে সে পাইবে না তাহার গুরু রূপে।

ভাই-বুধা এক চতুরতার আশ্রয় নিলেন, কহিলেন, "দরজা খুলতে

নিষেধ রয়েছে ঠিকই। কিন্তু দেয়াল ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকতে তো গুরু মানা করেন নি। তোমরা ইটের দেয়ালে একটা বড় গর্ত খুঁড়ে ফেল, গুরুকে করো সবার সামনে প্রকাশিত।"

নির্দেশ মতো কাজ করা হইল। গুরু অমরদাসের দর্শন লাভে ভক্ত সাধকেরা উচ্চ স্বরে করিয়া উঠিলেন জয়ধ্বনি।

অমরদাস ধ্যানস্থ হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। কলরব শুনিয়া চোখ মেলিলেন। শান্ত দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আমার সুস্পষ্ট নির্দেশ লেখা রয়েছে ঘরের সম্মুখে। তোমরা কি ভেবে তা অগ্রাহ্য করলে! এতো মোটেই আমার অভিপ্রেত নয়।"

সাশ্রু নয়নে ভক্তেরা নিবেদন করেন তাঁহাদের মর্ম ব্যথার কথা। মিনতি জানান বার বার বাহিরে আসার জন্য।

ভাই-বুধা এবার সবার পুরোধা রূপে সুকৌশলে তাঁহার বক্তব্য রাখেন, "গুরু, আপনি নানকজী ও অঙ্গদজীর গদিতে উপবিষ্ট। তাঁদের প্রচারিত ধর্ম, তাঁদের শিষ্যবর্গ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে আপনারই উপর। এটা তো শুধু আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, পূর্ব-গুরুদের এবং সারা শিখমণ্ডলীর ব্যাপার এটা। আপনি সবার দিকে তাকিয়ে দেখুন, কি অসহায়রূপে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। এদের কল্যাণে আবার আপনাকে গোবিন্দোয়ালে ফিরতেই হবে, বসতে হবে গুরুর পবিত্র গদিতে। নতুবা নানকের ধর্ম ধরাতল থেকে লোপ পেয়ে যাবে।"

অমরদাস করুণায় বিগলিত হইলেন, সংকল্প টলিয়া গেল, কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাশ্রু নেত্রে সবাইকে দিলেন সপ্রেম আলিঙ্গন। 'ওয়াগুরু' রবে ও উল্লাস ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

অচিরে গোবিন্দোয়ালে প্রত্যাবর্তন করিয়া অমরদাস আবার গ্রহণ করেন শিখমণ্ডলীর পূর্ণ দায়িত্ব। তাঁহার ধর্মসভা ও লঙ্গরখানা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। শত শত ভক্ত ও দর্শনার্থীর আগমনে গোবিন্দোয়ালের শিখ জনপদ প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠে।

উত্তর ভারতের সর্বত্র শিখগুরুর খ্যাতি বিস্তারিত হয়। শুধু শিখেরাই নয়, অন্যান্য ধর্মের সমর্থকেরাও তাঁহার দরবারে আসিয়া ভিড় জমাইতে থাকেন। যে সমস্যা ও যে প্রশ্ন নিয়াই দর্শনার্থীরা আসুন না কেন, অমরদাস অতি সহজে এবং অবলীলায় তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। সবাই আনন্দিত মনে তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়া ঘরে ফিরিয়া যান।

অমরদাসের নিয়ম ছিল, তাঁহার দর্শনার্থীরা আগে লঙ্গরখানায় পঙ্‌ক্তি ভোজন শেষ করিবেন, তারপর করিবেন তাঁহাকে দর্শন। সামাজিক উদারতা ও শুভবুদ্ধি যাঁহার নাই, তাঁহার সহিত অযথা বাক্যালাপ করিতে তিনি সম্মত হইতেন না।

গোবিন্দোয়ালের লঙ্গরখানায় রাজা প্রজা ধনী নির্ধন, উচ্চ এবং নীচ বর্ণ সবাই একসঙ্গে আহার করিতেন। প্রতিদিনকার অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যারও কোনো স্থিরতা ছিল না। অজস্র সংখ্যক লোক এখানে ভূরি ভোজনে তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু এ খাদ্যবস্তু কি করিয়া সংগৃহীত হইত, কে অর্থ যোগাইত, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না।

শিখ ভক্ত ও দর্শনার্থীরা বলিতেন, এই বিরাট লঙ্গরখানার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছে গুরু অমরদাসের ঋদ্ধি সিদ্ধির গুণে।

গোবিন্দোয়ালে দর্শনার্থীর সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়িতেছে, তেমনি বাড়িতেছে স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা। পরিচালকেরা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি নূতন ঘরবাড়ি নির্মাণ না করিতে পারিলে শিখ পরিবারগুলির দুর্গতির সীমা থাকিবে না। কিন্তু একাজ সম্পন্ন করিতে হইলে প্রচুর কাঠের দরকার। তাহা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে?

ভক্তেরা সবাই নিরুপায় হইয়া সমস্যাটি গুরু অমরদাসের গোচরে আনিলেন।

গুরু কহিলেন, "এজন্য তোমরা ভেবো না। সওয়ান্ মল্-কে এখানে ডেকে আনো। এ দুরূহ কাজের দায়িত্ব সে-ই শুধু নিতে পারে।"

সওয়ান্ মল্ সম্পর্কে অমরদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। কিন্তু তাঁহার বড়

পরিচয়, নবীন শিষ্যদের মধ্যে তিনি অগ্রণী, সাধনার দিক দিয়াও প্রভূত উন্নতি করিয়াছেন। গুরু ও শিখধর্মের জন্য প্রাণপাত করিতে তাঁহার দ্বিধা নাই।

সওয়ান্ মল্ তৎক্ষণাৎ গুরু সকাশে হাজির হইলেন। গুরু কহিলেন, "বেটা, শিখমণ্ডলীর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে তোমায় কাংড়ার পার্বত্য অঞ্চল হরিপুরে যেতে হবে! সেখানে প্রচুর সেগুন আর দেওদার কাঠ মিলে, এগুলো সংগ্রহ করতে হবে প্রচুর পরিমাণে, তারপর তা ভাসিয়ে আনতে হবে বিপাশা নদীর স্রোতে, ভাটিতে।"

"কিন্তু গুরুজী, একাজে যে প্রচুর অর্থের দরকার।" সসংকোচে বলেন সওয়ান্ মল্। "আমাদের কোনো সঞ্চিত ধন নেই, সদাব্রত চলে ভক্তদের দানে। যেদিন যা পাওয়া যায়, তাই খরচ করা হয়, পরের দিনের জন্য কিছু থাকে না। এই তো আমাদের হাল।"

"বেটা, তুমি ভুলে যাচ্ছো, নানকজীর পবিত্র গদি থেকে এ আদেশ আমি তোমায় করছি। অগৌণে তুমি হরিপুরে চলে যাও। অন্তরে বিশ্বাস রেখে কাজ শুরু করো। ভয় নেই যথাকালে তোমার ভেতরে শক্তি সঞ্চারিত হবে।"

সওয়ান্ মল্ হরিপুরে পেঁ‌ৗছিলেন। ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে রটিয়া গিয়াছে শক্তিধর গুরু অমরদাসের অন্যতম প্রধান শিষ্য কাংড়া পরিব্রাজনে আসিয়াছেন। অসামান্য যোগশক্তির তিনি অধিকারী, আর্ত ও মুক্তিকামী মানুষের প্রতি তাঁর কৃপার সীমা নাই।

দলে দলে ভক্ত দর্শনার্থীরা আসিতে থাকে সওয়ান্ মল্-এর কাছে। দেখা যায় সত্যই গুরুকৃপায় বিপুল যোগবিভূতি তাঁহার করায়ত্ত। যাহাকে যে আশীর্বাদ করিতেছেন তাহাই ফলিতেছে। ত্রিতাপদগ্ধ নরনারী তাঁহার সকাশে আসিয়া পাইতেছে স্বস্তি এবং শান্তির আস্বাদ। সওয়ান্ মলের কুটির প্রাঙ্গণ মুখরিত হইতেছে জপজী আর সোহিলার পবিত্র সংগীতে।

হরিপুরের রাজা নিজেও চমৎকৃত হইলেন, অমরদাসের এই নবীন শিষ্যের যোগশক্তি দর্শনে। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা চলিল দু'জনের

মধ্যে। ফলে রাজা সওয়ান্ মলের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন।

কথা প্রসঙ্গে গুরুর নির্দেশের কথাটি ভাঙিয়া বলিলেন সওয়ান্ মল্। রাজা তো শুনিয়া মহা উৎসাহিত। কহিলেন, "গুরু অমরদাসের ভক্তদের জন্য এখানকার জঙ্গল থেকে কাঠ দিতে হবে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।"

তখনই রাজকীয় আদেশ জারী করা হয়। অজস্র সংখ্যক কাঠ ভাসাইয়া দেওয়া হয় নির্মীয়মাণ শিখ উপনিবেশের গৃহ নির্মাণের জন্য। বিপাশার তীরে শত শত গৃহ সমন্বিত এক নূতন গোবিন্দোয়াল শহর গড়িয়া উঠে।

হরিপুর-রাজ এবার গুরু অমরদাসকে দর্শনের জন্য মহাব্যগ্র। অনুমতি অচিরে মিলিয়া যায়। রাজার সঙ্গে চলেন তাঁহার কয়েকজন রানী এবং উচ্চ কর্মচারীবৃন্দ। হস্তী অশ্ব ও তাঞ্জামের রাজকীয় মিছিলটি গোবিন্দোয়ালের উপকণ্ঠে পৌঁছিলে অমরদাস বলিয়া পাঠান, "রাজা আমাদের উপকারী বন্ধু, তাঁকে স্বাগত জানানো আমাদের কর্তব্য। কিন্তু একটা কথা তাঁকে স্মরণ রাখতে হবে, এখানকার রীতি অনুযায়ী গুরুদর্শনের অনুমতি সেই পায়, শিখদের লঙ্গরখানায় যে সবার সঙ্গে বসে পঙ্‌ক্তি ভোজন সম্পন্ন করে।"

রাজা সানন্দে একথা মানিয়া নিলেন এবং ভোজন শেষে লাভ করিলেন অমরদাসের দর্শন। গৃহের দ্বিতলের এক কক্ষে বসিয়া রাজা ও তাঁহার রানীদের সঙ্গে গুরু সানন্দে ধর্মালোচনা করিতেছেন, নানা উপদেশ দিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার লক্ষ্য পড়িল রাজার নব পরিণীতা রানীর দিকে। এই রানী অদূরে বসিয়া আছেন, নিবিষ্টমনে গুরুর কথা শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডলটি রহিয়াছে ওড়নায় আবৃত।

গুরু তাঁহার ভাষণ হঠাৎ থামাইয়া দেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকেন রানীর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সদা উৎফুল্ল আননে নামিয়া আসে বিষাদের ছায়া। শান্তস্বরে রানীকে বলেন, "মায়ী,

তুমি কি উন্মাদ হয়েছো? যদি গুরুকে দর্শনই না করবে, তবে এত কষ্ট ক'রে এখানে এসেছো কেন বল তো?"

প্রত্যুত্তরে রানীর দিক হইতে কোনো সাড়া শব্দ নাই। ক্ষণপরেই দেখা গেল তাঁহার অতি অদ্ভুত আচরণ। ওড়নার আবরণে পূর্ববৎ মুখখানি ঢাকিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। উচ্চ কণ্ঠে হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া উন্মাদের মতো নিচে নামিয়া গেলেন, তড়িৎবেগে প্রবেশ করিলেন নিকটস্থ অরণ্যে।

এমন একটা কাণ্ড সম্মুখে ঘটিয়া গেল, কিন্তু অমরদাসের মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য বা ভাবান্তর নাই। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো নিজ আসনে তিনি বসিয়া আছেন।

রাজা ও পাত্র-মিত্রেরা সবাই ব্যাকুলভাবে নিচে ছুটিয়া গেলেন। নূতন রানী যে প্রকৃতিস্থা নন, যে কোনো কারণেই হোক উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতে কাহারো সন্দেহ নাই।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেরই চিন্তাশক্তি স্তব্ধ, এ সঙ্কটে কি করা কর্তব্য, কাহারো তাহা মাথায় আসিতেছে না।

গুরু এবার সভা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন, রাজার আর্ত প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "এ সবই রানীর কর্মফলের ভোগ। কয়েকদিনের ভেতরে আবার তিনি ফিরে আসবেন এবং উন্মাদ রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই আসবেন। যে জন্য এখানে আসা, সেই দর্শনই যে এখনো বাকী রয়েছে। আপনি শান্ত হোন, ভয়ের কোনো কারণ নেই।"

সকলেই চাহিতেছেন, তাড়াতাড়ি রক্ষীদল পাঠানো হোক অরণ্য-অঞ্চলে, উন্মাদিনী রানীকে ধরিয়া আনার ব্যবস্থা করা হোক।

প্রশান্ত স্বরে অমরদাস কহিলেন, "এ সময়ে এই উন্মাদিনীর পশ্চাদ্ধাবন করলে সকল চিকিৎসার বাইরে তিনি চলে যাবেন। গোবিন্দোয়ালের মৃত্তিকা ও আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে আছে গুরু নানকের প্রাণসঞ্জীবনী নাম। এই নামের পুণ্য স্পর্শ রানী পেয়ে গেছেন। নামের শক্তি তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনবেই।"

সওয়ান্ মল্ এবং অন্যান্য ভক্তেরা রাজাকে প্রবোধ দিলেন, "রানীর

উন্মাদরোগের ভোগ ও মৃত্যুযোগ গুরু স্বল্প দুর্ভোগের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন। মহারাজ, আপনি ধৈর্য ধারণ ক'রে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন। গুরু অমরদাসের কৃপাশক্তির ইন্দ্রজাল আমরা এখানে বসে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। এবার আপনিও তার কিছুটা পরিচয় পাবেন।"

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজা হরিপুরে চলিয়া গেলেন। গুরুর আদেশে সওয়ান্ মল্‌কেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইল।

সাচন্‌সাচ্ নামে একটি মূর্খ ও সরল প্রকৃতির ভক্ত অহর্নিশি গুরু অমরদাসের আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। শিখ লঙ্গরখানায় সে ভোজন করে এবং গুরুর ফুট-ফরমায়েস খাটিয়া, আর শিখদের ডাক হাঁকে ছুটাছুটি করিয়াই তাহার দিন কাটে। শীত গ্রীষ্ম সব সময়েই গায়ে তাহার জড়ানো থাকে একটি কালো কম্বল। কেউ কোনো কাজ করিতে বলিলে, কেউ কোনো মন্তব্য করিলে, তৎক্ষণাৎ সে বলিয়া উঠে, সাচ্, সাচ্। তাই সবাই বিদ্রূপ করিয়া তাহার নাম দিয়াছে—সাচন্‌সাচ্। এই সাচন্‌সাচ্ একদিন লঙ্গরখানার জ্বালানি কাঠ আনিতে গভীর বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। এমন সময়ে অতর্কিতে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এক অর্ধনগ্ন উন্মাদিনী নারী। আঁচড় কামড়ে সাচন্‌সাচ্‌কে সে অস্থির করিয়া তোলে, ধাক্কা দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয় ও হিঁচড়িয়া টানিয়া নিতে থাকে। এই প্রাণান্তকর অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া সাচন্‌সাচ্ কোনোমতে গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া আসে, গুরুর সম্মুখে বসিয়া হাঁফাইতে থাকে।

আঁচড় কামড় ও মাটিতে ঘর্ষণের ফলে বেচারার শরীর একেবারে ক্ষতবিক্ষত। একি দুর্দশা তাহার? কৌতূহলী হইয়া সবাই প্রশ্ন করিতে থাকে।

একটু সুস্থ হইয়া সাচন্‌সাচ্ যে বিবরণ দেয় তাহার মর্ম: সেদিনকার পাগ্‌লী রানীকে সে বনের মধ্যে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছে। আচার আচরণ তাহার একেবারে পিশাচবৎ। কোনোমতে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সে প্রাণে বাঁচিয়াছে।

অন্তরঙ্গ ভক্তদের দিকে তাকাইয়া অমরদাস নিম্নস্বরে কহিলেন, "কর্মভোগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রানী এবার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরতে পারবেন।"

পায়ের একপাটি পাতুকা খুলিয়া নিয়া গুরু সাচন্‌সাচের হাতে দিলেন, কহিলেন, "এটি তুমি তোমার কম্বলের ভেতর লুকিয়ে রেখে দাও। কাল আবার যখন বনে কাঠ কুড়ুতে যাবে, রানী আবার এসে করবেন তোমায় আক্রমণ। তখন এই পাতুকাটি কোনোমতে স্পর্শ করাবে তাঁর গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠবেন পূর্বের মতো সুস্থ ও স্বাভাবিক।

পরদিন অমরদাসের ভবিষ্যৎ-বাণী হুবহু মিলিয়া যায়। প্রহারে উদ্যত উন্মাদিনী রানীর গায়ে পাতুকার ছোঁয়া লাগার পরমুহূর্তেই তিনি থমকিয়া যান। ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে প্রাপ্ত হন নিজের স্বাভাবিক মানসিকতা। মাথার কেশরাশি এলোমেলো এবং জট-পাকানো, পরনের শাড়ি ছিন্নভিন্ন, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা। নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লজ্জায় তিনি আড়ষ্ট হইয়া পড়েন, নিকটস্থ ঝোপের আড়ালে করেন আত্মগোপন।

সাচন্‌সাচ্ তাড়াতাড়ি তাহার কম্বলটি চিরিয়া দু'খণ্ড করিয়া ফেলে। লজ্জা নিবারণের জন্য একটি খণ্ড ছুঁড়িয়া দেয় রানীর দিকে।

গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া আসিলে দেখা যায় রানী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর গুরু অমরদাসের চরণে পতিত হইয়া বার বার তিনি করিতে থাকেন স্তুতিগান। ভক্তির আবেগে দরদর ধারে ঝরিতে থাকে নয়নবারি।

সিদ্ধসাধক অমরদাসের জীবনে এবার দেখা দেয় গুরুমহিমার মহত্তর প্রকাশ। চিহ্নিত শিষ্য ভক্তের দল একের পর এক আসিতে থাকেন তাঁহার চরণোপান্তে। সাধনজীবনের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয় তাঁহাদের সমক্ষে, গুরুকৃপার মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া তাঁহারা ধন্য হন।

ভাই-পারো এই ভাগ্যবান ভক্তদের অন্যতম। শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্তী জলন্ধর অঞ্চলে তাঁহার বাস। তাঁহার অভ্যাস ছিল, একদিন অন্তর গুরুকে দর্শন করিতে আসা। এই দীর্ঘ পথটি তিনি অতিক্রম করিতেন অশ্বপৃষ্ঠে। মাঝখানেই পড়ে বিপাশা নদী, আরোহী ও অশ্ব উভয়কেই প্রতিদিন এই নদী পার হইতে হইত সন্তরণ করিয়া। স্থানীয় নবাবের এক পুত্র সেদিন শিকারে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়ে ভাই-পারো এবং তাঁহার অশ্বের সন্তরণ দৃশ্য। তখন ভরা বর্ষাকাল। সে সময়ে খরস্রোতা দুকূলপ্লাবী এই নদী পার হওয়া মহা দুঃসাহসের কাজ। এ পারে পোঁছানোর পর নবাবপুত্র সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, "ভাই, বর্ষার সময় এভাবে জীবন বিপন্ন ক'রে নদী পার হচ্ছো কেন, বলতে পারো? প্রায়ই যে তোমায় এই বিপজ্জনক কাজ আমি করতে দেখি।"

ভাই-পারো ভাঙিয়া বলেন তাঁহার এই সন্তরণের প্রয়োজনের কথা। গুরু অমরদাসের চেলা তিনি, একদিন অন্তর গুরুকে না দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। গুরুর স্নেহ ভালবাসার আকর্ষণ তাঁহার কাছে এমনই দুর্বার।

গুরুর মাহাত্ম্য ও নানা কাহিনী শুনিয়া নবাবজাদা কৌতূহলী হইয়া উঠেন। ভাই-পারোর সঙ্গে একদিন গিয়া উপস্থিত হন গোবিন্দোয়ালে। গুরু অমরদাস সেখানকার ধর্মসভায় শিখদের মধ্যমণিরূপে বিরাজিত। চোখে মুখে তাঁহার দিব্য আনন্দের দীপ্তি। ভাষণের প্রত্যেকটি শব্দ যেন চৈতন্যময়, শ্রোতাদের অন্তরে ভাব-রাজ্যের জ্যোতির্ময় পর্দা একটির পর একটি উন্মোচিত করিতেছে। নবাবজাদা উপলব্ধি করিলেন, ইনি এমন এক অনন্যসাধারণ মহা-পুরুষ যাঁহার কৃপার ধারা মানুষকে উজ্জীবিত করিতে পারে, দিতে পারে অমৃতলোকের পরম আস্বাদ।

অমরদাস সস্নেহ আহ্বানে নবাবজাদাকে আপন করিয়া নিলেন, খুশীর উচ্ছল আবেগে করিলেন তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ। তাঁহার কৃপায় এই মুসলমান তরুণ নূতনতর অধ্যাত্মজীবনের আস্বাদ লাভ

করেন। কিছুদিন পরে পৈতৃক সম্পত্তি ও পদমর্যাদা ত্যাগ করিয়া তিনি গুরু অমরদাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন, দীক্ষিত হন শিখধর্মে।[১]

ভাই-লালো ছিলেন ভাই-পারোর স্বগ্রাম ডাল্লার একজন ধনী অধিবাসী। পারোর মুখে গুরুর অপার মহিমা ও শক্তি বিভূতির কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার দর্শনে অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া পড়েন। তারপর কয়েকবার গোবিন্দোয়ালে যাওয়া আসা করার পর অমরদাসের অনুরক্ত হইয়া উঠেন।

লালোর পিতা ছিলেন গ্রামের একজন ধনী সাহুকার। টাকা লগ্নী করিয়া বহু অর্থ তিনি অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর লালোও পৈতৃক ব্যবসার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তরুণ বয়স হইতেই তিনি ভক্তিপরায়ণ এবং দানশীল, লোকের দুঃখকষ্ট দেখিলেই তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত এবং অকাতরে তাহাদের অর্থ বিতরণ করিতেন।

গুরুমুখী ভাষায় লালো শব্দের অর্থ—রক্তবর্ণ মূল্যবান চুনী পাথর। গুরু অমরদাসের সভায় প্রথম যেদিন লালো উপনীত হন, সেইদিনই গুরুর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয় তাঁহার উপর। বার বার এই সুদর্শন ধর্মপ্রাণ যুবকের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, "লালো হর্ রং রঙিয়া গয়া", অর্থাৎ, লাল চুনী রত্নটি রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে সকল রকম রং-এ—সমদর্শিতা আসিয়াছে লালোর জীবনে, সবাকার সঙ্গে আপনাকে সে মিশাইয়া দিয়াছে, এই তত্ত্বটিই অমরদাস সেদিন তাঁহার অন্তরঙ্গ শিখ ভক্তদের বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

গুরুর কাছে নাম দীক্ষা নিবার পর ভাই-লালো সাধন ভজনের গভীরে নিমজ্জিত হন, সাধনরাজ্যের মূল্যবান চুনী রত্নেই হন তিনি রূপান্তরিত। শুধু গুরুর সেবাতেই ভাই-লালো তাঁহার অর্থ ও সামর্থ্য ঢালিয়া দেন নাই, শিখমণ্ডলীর অন্যতম সেবক ও রসদদার রূপেও অচিরে তিনি সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

সে-বার এক বিশেষ পুণ্যদিনে ভাই-লালো গুরুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রণাম নিবেদন করিতেই গুরু অমরদাস সকলের

---

১ ম্যাকলিফ্: দ্য শিখ রিলিজিয়ান, ভল্যু ২

কাছে তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকারবৃত্তির প্রশস্তি বার বার উচ্চারণ করিতে থাকেন। তারপর ভাই-লালোকে নিকটে ডাকিয়া নেন, ভাবাবিষ্ট অবস্থায় একটি অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার ললাট স্পর্শ করেন। আনন্দভরে বলিয়া ওঠেন, "ভাই-লালো, তোমার আত্মিক জীবনের প্রস্তুতি গড়ে উঠেছে। তাই ললাট স্পর্শ ক'রে আজ তোমার ভেতরে রোপণ ক'রে দিলাম চৈতন্যময় বীজ। আশীর্বাদ করি, এবার থেকে আত্মার গভীরে তুমি নিমজ্জিত হও।"

সেদিনকার বিদায়ই ভাই-লালোর শেষ বিদায়। অতঃপর আর তিনি গুরু দর্শনে গোবিন্দোয়ালে আসেন নাই। নিজগৃহের নিভৃতিতে বসিয়া ধ্যান জপে তিনি নিবিষ্ট হইয়া পড়েন, পরিণত হন এক অসামান্য শিখ সাধকে।

ক্ষমা, সহনশীলতা ও ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শটি অমরদাস তাঁহার অনুগামীদের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন। শিখদের আচার আচরণে এই গুণগুলি যাহাতে সর্বদা ফুটিয়া উঠে, সে বিষয়েও সতত জাগ্রত ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি। কিন্তু এই আদর্শ এবং মানসিকতার জন্য তাঁহার নবগঠিত শিখসমাজকে কম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই।

গোবিন্দোয়াল তখনকার দিনে একটি ক্রমবর্ধমান শহররূপে গড়িয়া উঠিতেছে। শিখ ছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকও এখানে আসিয়া বসবাস শুরু করিতেছে। নবাব সরকারের কয়েকটি উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্মচারী এবং মুসলমান ব্যবসায়ীও এ সময়ে এই বর্ধিষ্ণু নগরের বাসিন্দা হইয়া পড়েন। ইহাদের কয়েকজন শিখদের উপর উপদ্রব শুরু করিয়া দেন। শিখেরা গুরুর লঙ্গরখানার জন্য কূয়া হইতে জল তুলিতে যায়। এ সময়ে দুষ্ট ছেলেদের লেলাইয়া দেওয়া হয় তাহাদের বিরুদ্ধে। ইট ছুঁড়িয়া মাটির কলসীগুলি তাহারা ভাঙিয়া দিতে থাকে।

শিখেরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, সবাই মিলিয়া গুরু অমরদাসের

কাছে তাহাদের অভিযোগ জানায়। গুরু শান্ত স্বরে কহেন, "ধর্মান্ধ কুচক্রীদের দণ্ড বিধান করবেন ভগবান, এ দায়িত্ব তোমরা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চাও কেন? আমি বলি, তোমরা কুয়ো থেকে জল তোলবার জন্য মাটির কলসী ব্যবহার না ক'রে এখন থেকে বরং চামড়ার মশক ব্যবহার করো।"

তাঁহার পরামর্শই লঙ্গরখানার কর্মীরা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তবুও দুর্বৃত্তদের হাত এড়ানো গেল না। দূর হইতে তাহারা তীর ছুঁড়িয়া চামড়ার মশক ছিন্ন ভিন্ন করিতে থাকে। জল সংগ্রাহকদের দুর্গতি উঠে চরমে।

গুরু এবার পরামর্শ দেন পিতলের হাঁড়িতে জল আনার জন্য। কিন্তু তাহাতেও কোনো কাজ হয় না। কুচক্রীরা এবার প্রকাশ্যে সরাসরি আক্রমণ শুরু করে, লোহার ডাণ্ডা দিয়া বহু শিখ কর্মীর মাথা ফাটাইয়া দেয়।

অতঃপর ভক্ত শিষ্যেরা অধীর হইয়া উঠে। দুর্বৃত্তদের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত হয়। কেউ কেউ উত্তেজিত হইয়া গুরুকে প্রশ্ন করে, "আর কতকাল কর্মীরা এভাবে এক তরফা অত্যাচার সহ্য ক'রে চলবে? এবার সময় হয়েছে পাল্টা আঘাত হানবার।"

প্রশান্ত কণ্ঠে অমরদাস উত্তর দেন, "উচ্চতর আদর্শ তোমরা জগতে প্রচার করছো, এজন্য চরম ত্যাগ স্বীকার না করলে চলবে কেন? অত্যাচার ও বর্বরের আঘাত নিয়তই আসবে, আর তার ফলেই ত্বরান্বিত হবে শিখদের আত্মিক শক্তির উদ্বোধন। আমরা সাধনা ও সিদ্ধির পথে চলেছি, সৎশ্রী আকালের পবিত্র পথ অনুসরণ করছি, প্রতিশোধের মনোভাব আমাদের শোভা পায় না। জেনে রেখো, ধৈর্য ও সহনশীলতার মতো তপস্যা আর নেই। সর্ব অবস্থায় সন্তোষকে ধরে থাকবে, তবেই লাভ করবে প্রকৃত সুখ। লোভের মতো বড় পাপ আর কিছু নেই, তেমনি ক্ষমার মতো নেই কোনো পুণ্য। এই ক্ষমাই শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র যা শত্রুকে পরিণত করে পরম মিত্রে। আরও একটা কথা তোমাদের বলে রাখি—যে বীজ তোমরা রোপণ

করবে, উত্তরকালে প্রাপ্ত হবে তারই ফল। দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও দুঃখের বীজ রোপণ করলে ফলরূপে তাই একদিন আবার ফিরে আসবে তোমাদের জীবনে। বিষ বপন করার পর কি ক'রে তোমরা আশা করো যে তার ফল হবে অমৃত ?"

অমরদাসের উচ্চারিত প্রতিটি কথায় ধ্বনিত হইতেছিল সত্যকার আত্মপ্রত্যয় ও আদর্শনিষ্ঠা। ভক্ত সাধকদের হৃদয়ে এই কথাগুলি চিরতরে গ্রথিত হইয়া গেল, দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যে ক্রোধ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এবার প্রশমিত হইল।

কিছুদিন পরে পরিব্রাজনরত একদল নাগা সন্ন্যাসী গোবিন্দোয়ালে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নাগারা ত্রিশূলধারী উলঙ্গ সন্ন্যাসী,[১] দলবদ্ধ হইয়া হিমালয়ে ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করে ; ধুনি জ্বালাইয়া শান্তিময় পরিবেশে নিজেদের সাধনভজনে ইহারা রত থাকে। কিন্তু কেহ ইহাদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করিলে বা কোনো অনিষ্ট করিলে আর রক্ষা নাই, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুর উপর চরম প্রতিশোধ নেয়। গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হইবার পর হঠাৎ সেখানে এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহার ফলে নাগারা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

শিখ লঙ্গরখানার কর্মীরা সেদিন কূপ হইতে জল সংগ্রহ করিতেছে, এমন সময়ে উপদ্রবকারী মুসলমানদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর নাগা সন্ন্যাসীদের নেতার চক্ষুতে গিয়া বিঁধে এবং চক্ষুটি নষ্ট হয়। নাগারা ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে, অস্ত্রাদি নিয়া মুসলমানদের আক্রমণ করে। ফলে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং সংঘর্ষে শিখ বিরোধী কয়েকটি দুষ্ট

---

১ মুঘল আমলে এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ মুসলমান হিন্দুতীর্থে সাধু সন্ন্যাসীর উপর নানা অত্যাচার ও জুলুম শুরু করে, সে সময়ে কাশীর বাঙালী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী মধুসূদন সরস্বতীর নেতৃত্বে একটা বিরাট প্রতিরোধ আন্দোলন গড়িয়া উঠে। প্রধানত আচার্য মধুসূদনের প্রেরণা ও নির্দেশে ত্রিশূলধারী নাগা সাধুরা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয় এবং অত্যাচারীদের শাস্তি বিধান করিতে থাকে।

মুসলমান নিহত হয়। শিখদের ধারণা হয়, ভগবানের বিধানেই নাগাদের মাধ্যমে অত্যাচারীরা এভাবে সেদিন নির্জিত হয়।

দুর্বৃত্তদের অদৃষ্টে আরো কিছুটা শাস্তির বিধান ছিল। একদল মুঘল সেনার পাহারায় বাদশাহের কোষাগারের কিছু ধন-সম্পত্তি সে-বার লাহোর হইতে দিল্লীতে সরানো হইতেছিল। স্বর্ণমুদ্রার থলিগুলি চাপানো ছিল একদল খচ্চরের পিঠে। গোবিন্দোয়ালের সন্নিহিত সড়ক দিয়া পথ চলিতেছে, এমন সময়ে স্বর্ণমুদ্রাবাহী একটি খচ্চর সবার অলক্ষে শহরের এক গলিতে ঢুকিয়া পড়ে। অঞ্চলটি ছিল মুসলমানদের অধ্যুষিত। স্থানীয় একদল দুর্বৃত্ত তাড়াতাড়ি ঐ খচ্চরটি বাড়ির ভিতরে লুকাইয়া ফেলে।

কিছুক্ষণ পরেই রক্ষীদলের অধ্যক্ষ টের পাইলেন, একটি খচ্চর দলভ্রষ্ট হইয়াছে। কোতোয়ালের সাহায্যে জোর তল্লাস চালানো হয় গোবিন্দোয়ালের প্রতি মহল্লায়। অবশেষে রক্ষীরা মুসলমান পল্লীতে উপস্থিত হইবার পর খচ্চরটি অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া নিজের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। লুকানো স্থান হইতে এটিকে বাহির করিতে গেলে দুর্বৃত্তেরা সবাই মিলিয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়া বাধা দেয়। কিন্তু সরকারী রক্ষীদলের সম্মুখে তাহারা টিঁকিবে কতক্ষণ? অচিরে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়। বাদশাহের অর্থ লুণ্ঠনের এই অপচেষ্টা ও সংঘর্ষ দুর্বৃত্তদের চরম বিপদ ডাকিয়া আনে, গোবিন্দোয়াল শহর হইতে তাহাদের সবাইকে বহিষ্কৃত হইতে হয়।

ভক্ত শিখ ও লঙ্গরখানার কর্মীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন, দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পথে যে বাধা এতদিন ছিল তাহা এবার দূরীভূত হয়।

গুরু অমরদাস তাঁহার সভায় সেদিন ভক্ত শিষ্যদের বলেন, "ভগবানের উপর নির্ভর ক'রে থাকলে, ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখালে, এমনিভাবেই দুঃখ তাপের নিবৃত্তি ঘটে, ধর্মের চক্র আবর্তিত হয়ে সাধন করে দুষ্টের দমন। আশু ফলপ্রদ না হলেও ঈশ্বর-নির্ভরতার এই পথই হয়ে উঠে সত্যকার শান্তি ও সুখের পথ।"

কয়েকজন শিখ শিষ্য একবার অমরদাসকে প্রশ্ন করেন, "গুরুজী, প্রকৃত সাধু ও ভগবদ্‌ভক্তের লক্ষণ কি, আমাদের একটু বলুন।"

উত্তরে তিনি বলেন, "প্রভু অলখ্‌ নিরঞ্জনের নাম যার হৃদয় কন্দরে সদা ধ্বনিত হচ্ছে, ব্যক্তিসত্তা ও আত্ম অভিমানের মূল যে উৎপাটন করতে পেরেছে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত সাধু। এই বিনাশশীল দেহ ত্যাগ করলে সে লাভ করে অবিনাশী জ্যোতির্ময় দেহ। যে সাধক মন থেকে বাসনার বীজ নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, তিনিই তো প্রকৃত সমর্থ সাধক, জীবন্মুক্তি অবশ্যই হয় তাঁর করায়ত্ত। সিদ্ধ সাধকেরা স্বতন্ত্রপুরুষরূপে এ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের ভেতর দিয়ে ভগবান সাধন করেন জীবের অশেষ কল্যাণ। জীব জগতের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, যুক্ত থেকেও এই সাধকেরা থাকেন তার বাইরে, নির্লিপ্তি ও স্বাতন্ত্র্যকে সম্যক্‌রূপে বজায় রাখতে তাঁরা সক্ষম হন।"

একদল কানফাট্টা যোগী সে-বার ঘুরিতে ঘুরিতে গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হয়। ইহাদের শিরে জটার ভার, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কানে হাড়ের কুণ্ডল। যোগীনেতা কিঙ্গুরিনাথের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে গুরু অমরদাসের নানা আলোচনা হয়। কথা প্রসঙ্গে সাধু সন্ন্যাসীর বাহিরের বেশ অপেক্ষা তাঁহাদের তপস্যা ও ভগবানের সহিত যোগসাধনার উপরই অমরদাস অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এসময়ে শিখগুরু যে ভজন সংগীতটি রচনা করেন, এখনো রামকেলি রাগে শিখ ভক্তেরা তাহা গাহিয়া থাকে। এ সংগীতের মর্ম :

নম্রতা হোক্‌, হে যোগী, তোমার কানের কুণ্ডল—
করুণা হোক্‌ তোমার দেহের আচ্ছাদন।
পুনর্জন্মের বন্ধন ভয়কে স্মরণ রাখো অহর্নিশ,
এ ভয়ের বিভূতি লেপন কর সারা অঙ্গে।
হে যোগী, এমনিতর শিঙ্গা বাজাতে শেখ
যা থেকে নির্গত হবে অনাহত নাদ,
আর ভগবৎ-প্রেমের সূক্ষ্ম সুমধুর নিক্কণ।

ধৈর্য হোক তোমার কাঁধের ঝুলি,
সত্যকে করে তোল তোমার ভিক্ষা-পাত্র,
থরে থরে তাতে সাজিয়ে রাখো নামের সুধা—
পান করো তা পরাণ ভরে।
মনকে বিছিয়ে দাও ভগবানের চরণে,
এবং তাই হোক তোমার যোগাসন।
দেহের দ্বারে দ্বারে দাঁড়াও ভিক্ষাপাত্র হাতে,
নামের ভোগান্ন করো গ্রহণ। হে যোগী,
শুধু তানপুরার সুর ঝংকারে পাবেনা তোমার প্রভুকে—
প্রেম আর ভক্তি হোক দুটো সুরেলা তার,
আর তা বেঁধে দাও তোমার দেহ-তানপুরায়।
সার্থক যোগীর হৃদয়-গবাক্ষের পথ বেয়ে
নেমে আসে পরম প্রভুর কল্যাণময় বাণী,
ছিন্ন হয় তাঁর সর্ব সংশয়, মুমুক্ষার দ্বার যায় খুলে,
চিরতরে যুক্ত হন যোগী তাঁর পরমাত্মার সাথে।
কিন্তু, দুরন্ত বাসনার রোগ থেকে কে দেবে ভাই নিষ্কৃতি,
যদি না ঘটে কৃপালু গুরুর আবির্ভাব ?
সদ্‌গুরু রোপণ করবেন সৎ-নামের বীজ,
তবে তো দূর হবে ভবরোগ, জ্বলে উঠবে মোক্ষের আলো।
জীবন তানপুরায় ওঠাও সেই অনাহত ঝংকার,
হে যোগী, যা শুনে মানুষ হয় অমৃতময়।

অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অমরদাস একদিন পথ চলিতেছেন। সঙ্গে রহিয়াছেন কয়েকজন ভক্ত শিষ্য। শহরের প্রান্তে একটি জীর্ণ দেওয়ালের পাশ ঘেঁষিয়া তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন। বৃষ্টিতে ঐ দেওয়ালে প্রকাণ্ড ফাটল ধরিয়া গিয়াছে, যে কোনো মুহূর্তে সেটি ধসিয়া পড়িতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই গুরু তড়িৎবেগে অশ্বের মুখ ঘুরাইয়া নিলেন, ত্রস্তব্যস্তে সরিয়া গেলেন এক নিরাপদ স্থানে।

জনৈক ভক্ত সঙ্গীর মনে খটকা বাধিল। এ বড় আশ্চর্যের কথা। ভাঙা দেওয়ালের ভয়ে গুরু অমরদাস এমন সন্ত্রস্ত! আশ্রমে ফিরিয়াই এপ্রসঙ্গটি তিনি উত্থাপন করিলেন। কহিলেন, "গুরুজী, আপনি তো প্রায়ই বলে থাকেন, ভগবানের কল্যাণময় নাম আশ্রয় ক'রে যে থাকে, সে হয় মৃত্যুঞ্জয়ী। তাছাড়া, আপনাকে বলতে শুনেছি, মৃত্যুর ভয় বা দুশ্চিন্তার লেশমাত্র আপনার মনের ভেতর নেই, সেই সঙ্গে নেই কোনো বাঁচবার আগ্রহ। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্য করলাম, জীর্ণ প্রাচীরটি ভেঙে পড়ে আপনাকে চাপা দেবে এই ভয়ে আপনি ক্ষিপ্রবেগে অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন। এর রহস্য আমাদের বুঝিয়ে বলুন।"

গুরু সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা এটা লক্ষ্য করেছো দেখে আমি খুশী হয়েছি। এ আচরণের ভেতর দিয়ে একটা তত্ত্ব আমি তোমাদের বোঝাতে চেয়েছি। বহু পুণ্যের ফলে মানব জন্ম লাভ হয় এবং এই মানব জন্মের জন্য দেবতারাও লালায়িত থাকেন, কারণ মানব-দেহের সাধনাই এনে দেয় প্রকৃত আত্মজ্ঞান ও মুমুক্ষা। তা হলে আমাদের কি উচিত নয় এই মূল্যবান এবং পরম সম্ভাবনাময় জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা? এই দেহ দিয়ে তোমরা জীবের বহু কল্যাণ সাধন যেমন করতে পারো, তেমনি পারো নিজের মুক্তি সাধন করতে। কাজেই ভগবানপ্রদত্ত এ দেহের একটু দেখাশুনা করা দরকার বৈ কি।"

অমরদাসের সভায় এক একদিন অত্যধিক জনসমাগম হইত। এ জনতার বেশীর ভাগ ছিল অর্থার্থী ও আর্তভক্ত। কেউ আসিতেছে আর্থিক দুর্গতিতে ক্লিষ্ট হইয়া, কেউ বা আসিতেছে রোগ শোকের হাত হইতে ত্রাণ লাভের জন্য।

জনতার এই ভিড় দেখিয়া গুরু সেদিন হঠাৎ রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নশ্বর দেহের দুঃখ কষ্ট নিয়াই সবাই অস্থির। কই, সংসার বন্ধন মোচনের বা ভগবদ্ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিয়া তো কেহ তাঁহার কাছে আসে না।

অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকিয়া অমরদাস কহিলেন, "ছ্যাখো, আমি স্থির করেছি, গোবিন্দোয়ালের এই ভিড় আর আমি সহ্য করবো না। কাছাকাছি কোনো একটা নির্জন অরণ্যে গিয়ে বাস করবো। আপন মনে ধ্যানভজন আর নাম জপ করবো। এ ঝক্‌মারি আর মোটেই আমার ভাল লাগছে না।"

সংকল্প করিলেন, সেই দিনই মধ্যরাত্রে গোপনে ত্যাগ করিবেন গোবিন্দোয়াল। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তাঁহার দুই পুত্র, মোহ্‌রি এবং মোহন, আর কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যাপারটি জানিয়া ফেলেন। অমরদাস গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় তাঁহারাও নীরবে করিলেন তাঁহার অনুসরণ।

বনের মধ্যে এক কুটির বাঁধিয়া একান্তে জপ ধ্যানে নিরত হন অমরদাস। সঙ্গীরা কিছুটা দূরে অবস্থান করিতেছেন, খুঁজিতেছেন তাঁহার সেবা পরিচর্যার সুযোগ। কয়েক দিন বাদে সেখানে উপস্থিত হয় এক অল্পবয়স্ক মেষপালক, জাতিতে মুসলমান, নাম বহলুল্। গুরু অমরদাসকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে সে ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে তাঁহার সেবার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। প্রতিদিন রং-বেরঙের অজস্র ফুল বনের তরুলতা হইতে সে সংগ্রহ করে, নিবেদন করে এই নবাগত মহাত্মার চরণে। দুই বেলা সে দুই ভাঁড় দুধ দিয়া যায়, তাহা পান করিয়াই অমরদাস দিনাতিপাত করেন, পরমানন্দে জপতপে মগ্ন থাকেন। বনের ভিতর হইতে রোজই প্রচুর ফলমূলও বহলুল্ নিয়া আসে, গুরুর ভক্তদের ভোজনের জন্য রাখিয়া যায়।

ভক্ত সঙ্গীদের নিকটে ডাকিয়া গুরু একদিন বলেন, "ভগবানের লীলা কি বিচিত্র, ছ্যাখো। এই জনমানবহীন বনে অবস্থান করতে এসে বহ্‌লুলের মতো রত্ন আমরা কুড়িয়ে পেলাম।"

ভক্তেরা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইয়া আছেন, ভাবিতেছেন, বহলুল্ এক দুঃস্থ সহায় সম্পদহীন রাখাল, তাহার মধ্যে গুরু কোন্ মহার্ঘ বস্তু দর্শন করিলেন কে জানে?

অমরদাস এবার পরিষ্কার ভাষায় কহিলেন, "বহলুল্ অতি

পবিত্রমনা যুবক, শুদ্ধসত্ত্ব আধার। সাধনায় ব্রতী হলে ভগবৎ-কৃপা পেতে তার বিলম্ব হবে না।"

সেদিন দুগ্ধ ভাণ্ডটি গুরুর কাছে রাখিয়া প্রণাম জানাইতেই গুরু বহলুল্‌কে কহিলেন, "বৎস, তোমার প্রতি আমি খুব প্রসন্ন হয়েছি। তোমার মনে যদি কোনো বিশেষ প্রার্থনা থাকে, আমায় জানাও। আমি তা পূরণ করবো। অর্থ মান যশ, কি তুমি চাও?"

সেলাম জানাইয়া বহলুল্ নিবেদন করে, "ছোটবেলায় বাপ-মাকে আমি হারিয়েছি। তাঁদের মৃত্যুর সময়ে কত কেঁদেছি, কিন্তু তাঁদের তো ধরে রাখতে পারি নি। শুধু আমার মতো গরীবরাই যে অসহায় তা নয়, অসহায় বড়লোকেরাও। এই তো সেদিন তিনখানা গ্রামের জমিদার ঘোড়ার পিঠ থেকে পা-হড়কে পড়ে মারা গেল। কেউ বাঁচাতে পারলো না। দেখছি, এই দুনিয়ার সবটাই একটা খেলা, একটা তামাশা। এই খেলার মালিক তো একজন ঠিকই রয়েছেন। আমি সেই মালিককে, সেই খোদাকে দেখতে চাই, তাঁর আশ্রয় পেতে চাই। সেই আশ্রয়ই একমাত্র বস্তু, যা চিরদিন থাকবে বর্ত্তমান। আমায় আপনি দয়া করুন, সেই আশ্রয়টি দিন।"

গুরুর আননে আনন্দের আভা। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "দ্যাখো পরম প্রভুর বিচিত্রলীলা! নিরক্ষর, স্বল্পবুদ্ধি, সহায়-সম্পদহীন মেষপালককে ক'রে তুলেছেন মহাভাগ্যবান্। এই অল্প বয়সেই তাঁর অন্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন চৈতন্যের বীজ। সে বীজ এবার অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে।"

সস্নেহে বহলুলের দিকে তাকাইয়া অমরদাস কহিলেন, "বৎস, তোমায় আমি নাম দেবো, নিষ্ঠাভরে তা জপ করো। তোমার জীবনের সাধ পূর্ণ হবে, এ আশীর্বাদ আমি করছি।"

এই মেষপালক বহলুল্ অমরদাসের কৃপায় উত্তরকালে এক সিদ্ধ-পুরুষ রূপে গণ্য হইয়া উঠে।

সে-বার অমরদাস কয়েক জন অন্তরঙ্গ শিষ্য সঙ্গে নিয়া পাঞ্জাবের

কাসুর অঞ্চলে গিয়াছেন। তখন গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরমে চারিদিক উত্তপ্ত, আগুনের হল্‌কার মতো বহিতেছে 'লু'র হাওয়া, সঙ্গীদের কণ্ঠতালু শুকাইয়া উঠিয়াছে। এবার কাছাকাছি কোনো একটা বনের ছায়ায় আশ্রয় না নিয়া উপায় নাই।

একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল বৃহৎ কূপ সমন্বিত একটি অতি মনোরম ফলফুলের বাগিচা। খোঁজ নিয়া জানা গেল, শহরের শাসনকর্তা এটির মালিক। অমরদাস ভাবিলেন, এই বাগিচায় তাঁবু ফেলিয়া সবাই স্নানাহার সারিবেন, দুপুরবেলা, রৌদ্রতপ্ত আবহাওয়ায় এখানেই বিশ্রাম নিবেন। তখনি এক ভক্তকে পাঠানো হইল কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্য।

নগরের শাসক একজন পুরী-শ্রেণীর ক্ষত্রিয়। অমরদাসের নাম শুনিয়াই তিনি চটিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "আমি তোমাদের গুরুকে জানি, ভাল্লা-শ্রেণীর ক্ষত্রিয় সে। এই তো সেদিনের কথা, বসরকা গ্রামে একটা সাধারণ মানুষরূপে সে বাস করতো। হঠাৎ দেখছি, সে এক মস্ত গুরু হয়ে উঠেছে। চারদিকে তার খ্যাতি প্রতিপত্তি। কিন্তু আসলে সে চূড়ান্ত অনাচার চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র সবাইকে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে খাওয়াচ্ছে, আর জাত মারছে উচ্চ বর্ণের। এমন অনাচারী লোককে তো আমি আমার বাগিচায় স্থান দিতে পারবো না।"

ভক্তটি ফিরিয়া আসিয়া সবিস্তারে সব কথা গুরুকে নিবেদন করেন। গুরু কিছুকাল গম্ভীর হইয়া থাকেন। তারপর দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "বটে! তাহলে আমিও জানিয়ে রাখছি, তার কথিত আমার এই জাতপাতহীন অনাচারী শিখরাই একদিন গঠন করবে এক স্বাধীন রাজ্য, একজন শিখ হবে এই কাসুর শহরের শাসক। আর আজকের ঐ আত্মম্ভরী শাসনকর্তার বংশীয় লোকেরা হবে তার পরিচারক।"

উত্তরকালে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী আক্ষরিকভাবে ফলিয়া গিয়াছিল।

সেদিন শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত ভক্তদের নিয়া অমরদাস কাসুরের উপকণ্ঠে এক গরীব পাঠানের গৃহে গিয়া উপস্থিত হন। ঐ পাঠান অতিথিদের পরম সমাদরে তাহার ঘরে নিয়া বসায়, শীতল জল ও পাখার বাতাসে তাহাদের শ্রান্তি দূর করে।

সবিনয়ে নিবেদন করে, "আমি দরিদ্র লোক। আপনাদের মতো মেহ্‌মানের সেবা করার সাধ্য আমার কই?"

অমরদাস আশ্বাস ভরা কণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, যা কিছু সামান্য বস্তু তোমার ঘরে আছে, তাই দাও, তাতেই আমাদের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হবে।"

স্নান আহার সমাপনের পর গুরু সেখান হইতে বিদায় নিলেন। বলিয়া গেলেন, "ভগবানের সৃষ্ট জীবের সেবা এমনিভাবে করে যাও, বন্ধু। তাঁর কৃপা অবশ্যই তুমি পাবে। অচিরে এই সমৃদ্ধ কাসুর নগরের তুমিই হবে শাসনকর্তা।"

দরিদ্র পাঠান সেদিন্ গুরু অমরদাসের এই কথার মর্ম বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে সত্যই একদিন সে গ্রহণ করে নগরের শাসন ভার।

সমকালীন কাসুরের ঐ ক্ষত্রিয়-শাসনকর্তা এবং তাহার অধীনস্থ কর্মচারীরা অতঃপর নানা অনাচারের জন্য কুখ্যাত হইয়া পড়ে। ক্রুদ্ধ বাদশাহ তাহাদের সবাইকে করেন পদচ্যুত এবং সে স্থলে নূতন করিয়া নিয়োজিত করেন পাঠানদের। অমরদাসের আশীর্বাদপ্রাপ্ত পাঠানটি এ সময়ে একটি সরকারী কাজ গ্রহণের সুযোগ পায়, তারপর নিজের দক্ষতা বলে উন্নীত হয় শাসনকর্তার পদে। এই পাঠান বংশের শাসকেরা বেশ কিছুদিন কাসুর শহরে বাদশাহের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্তীকালে শিখ নৃপতি রণজিৎসিং পাঞ্জাবের এক বৃহৎ অংশের অধিপতি হন। কাসুরের শাসনভার তখন পতিত হয় শিখদের উপর।

গুরু অমরদাসের একটি চমকপ্রদ বিভূতিলীলার কথা শিখ ভক্তদের রচিত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সেদিন গুরু তাঁহার দ্বিতল শয়নকক্ষে নিদ্রিত রহিয়াছেন, হঠাৎ শেষ রাত্রে নারী কণ্ঠের আর্ত ক্রন্দনে জাগিয়া উঠিলেন। নিকটস্থ মহল্লায় কোনো বিপদ ঘটিয়াছে। ব্যাপার কি জানার জন্য দুইটি সেবককে তাড়াতাড়ি তিনি পাঠাইয়া দেন।

সেবকদ্বয় ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দেয়—দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিয়া একটি যুবকের মৃত্যু হইয়াছে। ঐ মর্মভেদী চীৎকার তাঁহার শোকার্তা জননীর। কোনোমতেই তাহার ক্রন্দন ও আর্তি থামানো যাইতেছে না।

একথা শোনার পর অমরদাস নয়ন মুদিয়া কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ রহিলেন, তারপর অস্ফুট স্বরে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইলেন মৃত যুবকটির পুনর্জীবন লাভের জন্য। সেবক দুটিকে কহিলেন, "মৃতের সামনে বসে তোমরা ভক্তিভরে জপজীর প্রথম পৌরি আবৃত্তি করো এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মুখবিবরে কিছুটা জল ঢেলে দাও। ভয় নেই প্রভুর কৃপায় সে পুনর্জীবন লাভ করবে।"

আদেশ পালন করিতে গিয়া ভক্ত সেবকেরা চিন্তা করিল, "এই মৃত যুবকের দেহে গুরু প্রাণ সঞ্চারিত করবেন তাঁর বিভূতির বলে। আমরা উপলক্ষ মাত্র। জপজী আবৃত্তি ক'রে আর মুখে জল দিয়ে আমরা কীই বা করতে পারি। বরং মৃত যুবকটিকে সোজাসুজি গুরুর সম্মুখে এনে উপস্থিত করি, যা কিছু করবার তিনি নিজেই করবেন।"

কাল বিলম্ব না করিয়া মৃতদেহটি গুরুর ভবনেই তাহারা নিয়া আসে। সঙ্গে আসিয়া জড়ো হয় বহু কৌতূহলী নরনারী। গুরু তখনো ভাবাবিষ্ট অবস্থায় আসনে বসিয়া আছেন। শোকার্তা জননীর কান্না তাঁহাকে সজাগ করিয়া তোলে। তাড়াতাড়ি মৃতের সম্মুখে আসিয়া তিনি উপবেশন করেন, মন্ত্রপূত বারি বার বার সিঞ্চন করিতে থাকেন প্রাণহীন দেহে।

কিছুক্ষণ পরে দেখা যায়, যুবকটির চোখের পাতা ও ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে, দেহে দেখা দিয়াছে প্রাণের সঞ্চার। অতঃপর

কিছুটা জল পান করিয়া সে উঠিয়া বসে। এই অত্যাশ্চর্য বিভূতি-লীলা দর্শনে ভক্ত শিষ্য ও কৌতূহলী জনগণ আনন্দে কলরব করিয়া উঠে। মৃত যুবকের জননী সাশ্রুনয়নে, আবেগভরে, লুটাইয়া পড়েন গুরু অমরদাসের চরণতলে।

আল্লাইয়ার খান নামে এক ধনী মুসলমান বণিক দিল্লীতে ঘোড়া আমদানির ব্যবসা করিতেন। আরব হইতে বাছিয়া বাছিয়া ঘোড়া ক্রয় করা হইত, আর দিল্লীতে আনিয়া বিক্রয় করা হইত বাদশাহের সেনা বিভাগের কাছে। আল্লাইয়ার সে-বার প্রায় পাঁচশত আরবী ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতেছেন। বিপাশা নদীর দু'কূল প্লাবিত করিয়া তখন বন্যার স্রোত নামিয়াছে। আল্লাইয়ার নদীর তীরে আসিয়া মহাবিপদে পড়িল। এতগুলি ঘোড়া নিয়া এই স্ফীতকায়া নদী পার হইবেন কিভাবে? ঘাটে কিছু সংখ্যক নৌকা রহিয়াছে বটে, কিন্তু পার্বত্য বর্ষার ঢল নামায় নদী যেরূপ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে তাহাতে ওপারে যাইতে মাঝিরা সাহস করিতেছে না। বিশেষত বৃহদাকার আরবী ঘোড়ার ভারে নৌকা উল্টাইয়া পড়িবার আশঙ্কা প্রবল। বেশী টাকার প্রলোভনেও মাঝিরা ওপারে যাইতে রাজী নয়।

এমন সময়ে আল্লাইয়ার খান দেখিলেন, একটি যুবক ঘোড়াসহ নদীর স্রোতে ঝাঁপ দিলেন, সন্তরণ করিয়া উপস্থিত হইলেন এপারে। ছুটিয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন, শুনিলেন, তাঁহার নাম ভাই-পারো, তিনি একজন নবদীক্ষিত শিখ।

"ভাই, আপনার সাহসের বলিহারি যাই। এই বন্যার সময়ে জলের ঘূর্ণিপাক থাকে, তাতে কত লোক তলিয়ে যায়। আপনি কি জীবনের পরোয়া করেন না?" সবিস্ময়ে মন্তব্য করেন তিনি।

"হ্যাঁ ভাই, ঠিকই বলেছেন আপনি। ভয় সঙ্কোচ আমার জীবন থেকে দূরে চলে গিয়েছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে আমার গুরু অমরদাসজীর কৃপায়। আমি তাঁর আশ্রিত শিষ্য। গুরু অমরদাসের

বিভূতি অঘটন ঘটাতে পারে, তাঁর কৃপা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। একটিবার তাঁকে দর্শন করুন, আপনার সব ভয় সব বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। যাবেন তাঁকে দর্শন করতে? দেখবেন, শত শত লোক তাঁর সংস্পর্শে এসে নূতন জীবন লাভ করেছেন।”

আল্লাইয়ার নীরবে একটু ভাবিয়া নিলেন। এতগুলি ঘোড়া পার করার ব্যবস্থা করিতে তুই একদিন সময় লাগিবে, এজন্য বৃহৎ ও দৃঢ় গঠনের নৌকা সংগ্রহ করা দরকার। ইতিমধ্যে অত্যাশ্চর্য শক্তিধর সাধুটিকে একবার দেখিয়া আসা মন্দ কি?

পরদিনই ভাই-পায়োর সঙ্গে গোবিন্দোয়ালের ধর্ম-দরবারে গিয়া তিনি উপস্থিত।

অমরদাসকে দর্শন করা মাত্র কি এক তুর্বার আকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া গেলেন আল্লাইয়ার। অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, তাঁহার ইহ-পরকালের পথপ্রদর্শক এই মহান্ পুরুষ; ইহার আশ্রয় লাভের জন্য এ সংসারের সব কিছু আকর্ষণ ও বিত্ত বিভব অনায়াসে ত্যাগ করা যায়।

পরম স্নেহে এই মুসলমান বণিককে অমরদাস আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিজের জন্য রক্ষিত ফলমূল মিষ্টান্ন হইতে কিছুটা তাহাকে ভোজন করিতে দিলেন।

নবাগতের নামটি গুরু তু' একবার উচ্চারণ করিলেন। তারপর স্মিতহাস্যে কহিলেন, “ভাই, তোমার নাম হচ্ছে—আল্লাইয়ার, আল্লার বন্ধু। আল্লার বন্ধুস্থানীয় হওয়া বড় কঠিন কথা, ভাই। তবে তোমায় আমি অবশ্যই আল্লার দাস ক'রে দিতে পারি। আল্লা হবেন তোমার প্রভু আর তুমি হবে তাঁর দাস, তাঁর একান্ত সেবক।” গুরু অমরদাসের কৃপায় ও উপদেশে এই মুসলমান ব্যবসায়ীর জীবনের স্রোত বদলাইয়া গেল, এক নূতন মানুষে তিনি পরিণত হইলেন।

আশীর্বাদ জানাইয়া গুরু কহিলেন, “আল্লাইয়ার, শুধু নিজের সাধন ভজন ও মুক্তির প্রচেষ্টা নিয়ে থাকলেই চলবে না। মানুষ বড় অসহায়, ত্রিতাপের জ্বালায় সদা জর্জরিত। তাদের তুমি সাহস দেবে,

শক্তি দেবে, আর দেবে আল্লাহ্র জ্যোতির্ময় পথের সন্ধান। হিন্দু মুসলমান শিখ সবাইকে তুমি বিতরণ করবে তোমার অর্জিত সাধনা ও সিদ্ধির ফল।"

গুরুর আদেশ আল্লাইয়ার খান করিলেন শিরোধার্য। দিল্লীতে গিয়াই ঘোড়ার ব্যবসায়ে ছেদ টানিয়া দিলেন। বিত্তবিষয় ও ঘর-সংসার চিরতরে ত্যাগ করিয়া গ্রহণ করিলেন ত্যাগী দরবেশের জীবন।

গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া গুরু অমরদাসকে প্রশ্ন করিলেন, "এবার কৃপা ক'রে বলুন, কোথায় আমি বাস করবো, আর শুরু করবো আমার জীবন তপস্যা।"

গুরু নির্দেশ দিলেন, "তুমি জলন্ধরের কাছে ডাল্লা গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করো। সেখানে ভাই-লালো, ভাই-পারো প্রভৃতি আমার সাধননিষ্ঠ শিষ্যেরা রয়েছেন। তুমি তাদের কাছে থেকে আত্মিক জীবনের প্রভূত সাহায্য পেতে পারবে। ওখানে থেকে সর্বজাতি ও সর্ব সম্প্রদায়ের কল্যাণে তুমি ব্রতী হও, এই আশীর্বাদ আমি করছি।"

নবাগত শিষ্য অমরদাসের কথা সানন্দে মানিয়া নেন। ডাল্লা গ্রামে গিয়া কুটির বাঁধিয়া বাস করিতে থাকেন, নিমজ্জিত হন সাধনার গভীরে। ঐ অঞ্চলের সকল মানুষের অতি আপনজনরূপে, দিক-দিশারী শক্তিধর ফকীররূপে, উত্তরকালে তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন। সহস্র সহস্র মুসলমান ভক্ত নরনারী তাঁহাকে ডাকিতেন আলা শাহ্ নামে। অমরদাসের গড়িয়া-তোলা এই মুসলমান সাধকের অত্যাশ্চর্য সিদ্ধাইর কাহিনী দীর্ঘদিন জলন্ধর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

গিরিধারী নামে এক দক্ষিণ দেশীয় বণিক সে-বার একটি বিশেষ প্রার্থনা নিয়া অমরদাসের আশ্রমে উপস্থিত হয়। এযাবৎ তাহার কোনো পুত্রসন্তান হয় নাই, প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া গণ্য হওয়ায় দ্বিতীয়বার সে বিবাহ করে, কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীরও কোনো সন্তানাদি হইল না। অমরদাসের যোগশক্তির খ্যাতি গিরিধারী শুনিয়াছে।

তাঁহার আশীর্বাদে কোনো কোনো বর্ষীয়সী মহিলার বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়াছে, এসংবাদও তাহার অজানা নয়।

গোবিন্দোয়ালে অমরদাসের আশেপাশে কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পর অন্তরের প্রার্থনাটি সে জ্ঞাপন করে। প্রশান্ত কণ্ঠে গুরু উত্তর দেন, "ছাখো, জন্মের সময়ই বিধাতা জাতকের ললাটে তার ভাগ্য-লিপি এঁটে দেন, মানুষ তা খণ্ডাবে এমন শক্তি তার কই? ঘরে ফিরে গিয়ে ভক্তিভরে ভগবানের নামজপ করো, লোকের কল্যাণ করো আর ভগবানের যা অভিপ্রেত সেই সব পবিত্র কর্তব্য পালন করো। একটি পুত্রসন্তানের জন্য তুমি এত ব্যাকুল হয়ে পড়েছো, কিন্তু একবারও ভেবে দেখছো না, এই পুত্র আসলে হয়ে উঠবে তোমার সব চাইতে বড় বন্ধন। ইচ্ছে ক'রে বন্ধন বা ফাঁস কে গলায় পরে বল তো?"

গিরিধারী বুঝিল, তাঁহার আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে, গুরুর কৃপা আর মিলিবে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, অশ্রুসজল চক্ষে দরবার হইতে সে বিদায় নিল।

ছুয়ারের সম্মুখে অমরদাসের একনিষ্ঠ ভক্ত, শক্তিধর সাধক ভাই-পারোর সঙ্গে তাহার দেখা। ভাই-পারো প্রশ্ন করেন, "কি ভাই, তুমি যে চলে যাচ্ছো? গুরুর কৃপা মিলেছে তো? তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে?"

"না ভাই-পারো, আমি নিতান্ত ছুর্ভাগা, তাই বুঝি গুরুর কৃপা থেকে বঞ্চিত হলাম। সন্তানের মুখ দেখা এ-জন্মে আর হলো না।"

গুরু তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও গিরিধারী ভাই-পারোকে সবিস্তারে জানায়।

ভাই-পারো বলেন, "ছাখো, গুরুর যোগবিভূতির সীমা নেই, তেমনি নেই তাঁর কৃপার অন্ত। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে কেউ বিফল হবে, এ আমার পক্ষে অসহ্য। না ভাই, তুমি হতাশ হ'য়ো না, অমন ক'রে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলো না। আচ্ছা বেশ, তুমি

গুরুর ওপর ভক্তি বিশ্বাস রাখো, আমি বলছি—তুমি পাঁচটি পুত্রের জনক হবে। সন্তানের জন্য কোনো খেদ তোমার থাকবে না।"

গিরিধারী কিছুটা আশ্বস্ত হইলেও একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে স্বগ্রামে ফিরিয়া যায়।

অতঃপর ভাই-পারোর আশীর্বাদ কিন্তু ফলিয়া যায়। গিরিধারীর গৃহে সত্য সত্যই একের পর এক পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

এই পুত্রদের নিয়া সে-বার সে অমরদাসের সন্দর্শনে আসিয়াছে। সভায় প্রবেশ করিয়াই গদিতে সমাসীন গুরুর পদপ্রান্তে এই পুত্র-সন্তানদের সে শোয়াইয়া দেয়, নিজে ভক্তিভরে নিবেদন করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

অন্তর্যামী অমরদাস সব কিছুই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু না জানার ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "গিরিধারী, সে-বার তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ করতে পারি নি, ক্ষুণ্ণমনে তুমি বিদায় নিয়ে গিয়েছ। এখন দেখছি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, পাঁচটি পুত্র তুমি ইতিমধ্যে লাভ করেছো। ভাবছি, কি ক'রে এটা সম্ভব হলো?"

করজোড়ে গিরিধারী উত্তর দেয়, "গুরুজী, আপনার অনুগত শিষ্য ভাই-পারোর কৃপায় আমি এদের লাভ করেছি। আপনার কাছ থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি দেখে আমার প্রতি তাঁর দয়া হয়েছিল, আমায় তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন।"

স্মিতহাস্যে অমরদাস ভাই-পারোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। ধীর কণ্ঠে বলেন, "ভাই-পারো, এ সৎকাজের জন্য আমার অভিনন্দন নাও। দেখছি, প্রকৃতির বিধান তুমি উল্টে দিয়েছ। ক'জনার এ শক্তি আছে? আমার নিজেরই তো নেই।"

একি গুরুর শ্লেষ বাক্য? ভাই-পারো সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছেন। যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনি আমার হচ্ছেন রাজ-রাজেশ্বর, আমরা আপনার চাকর, আপনার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দু' একটা শক্তিকণা কুড়িয়ে নিই আমরা। আসল কথাটি তা হলে বলি। আপনার কৃপা না পেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে এই

দুর্ভাগা চলে যাচ্ছিল। আমি ভাবলাম, আপনার ভাণ্ডারে কৃপার ঐশ্বর্য তো অফুরন্ত, তারই এক কণা সংগ্রহ ক'রে একে ভিক্ষে দিই না কেন? সত্যিই তো, আমাদের প্রভু যিনি তাঁর ভাণ্ডারে এত রয়েছে, দুঃখী ভিখারী মানব কেন তা থেকে বঞ্চিত হবে?"

"তোমার মনোভাব বুঝতে আমার ভুল হয় নি ভাই-পারো," গুরু উত্তরে বলেন। "কিন্তু, এটা যে কলিযুগ, অগণিত লোক সদাই আসছে তাদের কামনা বাসনার ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। তাদের কৃপা করতে হলে, তা কিন্তু করতে হবে ভেবে-চিন্তে, এবং বিচার বিশ্লেষণ ক'রে।"

একটু মজা দেখার জন্য অমরদাস আবার বলিলেন, "ভাই-পারো, আমি বুঝতে পারছি, তোমার হৃদয়ে প্রচুর করুণাধারা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। বেশ তো, এখন থেকে তুমি কল্পতরু হয়ে যাও।"

ভাই-পারো জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইয়া গুরুকে প্রশ্ন করেন, "সেটা কি রকম, তাতো বুঝতে পারছিনে।"

"অর্থাৎ, যে সব প্রার্থীরা আমার কাছ থেকে বিফল-মনোরথ হবে, তুমি নির্বিচারে তাদের ঢেলে দাও তোমার করুণা। ভাই-পারো, তুমি সিদ্ধ সাধক, তাতে সন্দেহ নেই। তুমি আমারই দ্বিতীয় স্বরূপ। বেশ তো, আমি তোমায় জগদ্‌গুরু বানিয়ে দিচ্ছি, এবার থেকে পরমানন্দে তুমি তোমার শক্তি বিভূতির প্রকাশ দেখিয়ে বেড়াও সর্বত্র।"

গুরুর চরণ দুটি ধারণ করিয়া কম্প্রকণ্ঠে ভাই-পারো কহিলেন, "আমি আপনার দীন ভৃত্য মাত্র, আমায় আপনার চরণের আশ্রয়েই থাকতে দিন। জন্মান্তরও যদি গ্রহণ করতে হয়, তবুও যেন পর-জন্মে আপনারই চরণ সেবার অধিকার আমি পাই। চিরকালের গুরুরূপে আপনিই বিরাজ করতে থাকুন, আমি থাকবো আপনার একজন নগণ্য ভক্তরূপে।"

অমরদাস এবার গভীর কণ্ঠে কহেন, "ভাই-পারো, তুমি যদি সত্যিই আমার সেবক হয়ে থাকতে চাও, তবে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না ক'রে চলে যাও তোমার নিজ গৃহে। ভগবান অলখ্ নিরঞ্জন তোমায়

ক্ষমা করেছেন। কৃপার পূর্ণকুম্ভ হস্তে অপেক্ষা করছেন তোমার জন্য। যাও তা গ্রহণ ক'রে ধন্য হও।"

গুরুর কথার নিহিতার্থ বুঝিয়া নিলেন ভাই-পারো। স্বগ্রাম ডাল্লায় ফিরিয়া নিজের বিত্তবিষয় নিকট আত্মীয় ও দীন দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। গুরু অমরদাসের ব্যবহারের জন্য দান করিলেন তাঁহার নিজের প্রিয় অশ্বটিকে। গুরুর শিখমণ্ডলী ও সদাব্রতের জন্যও দান করিলেন পর্যাপ্ত অর্থ। তারপর পবিত্র ভোগান্ন রন্ধন করিয়া ভক্তিভরে নিবেদন করিলেন শ্রীভগবানের উদ্দেশে। এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করার লগ্ন সমাগত, এ কথা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। এবার নিজের সিদ্ধাসনে জপের মালাটি হাতে নিয়া উপবেশন করেন, নয়ন দুটি চিরতরে নিমীলিত করিয়া প্রয়াণ করেন পরম ধামে।

গুরু অমরদাসের আর এক অধ্যাত্মসৃষ্টি তাঁহার প্রবীণ শিষ্য ভাই-লালো। ভাই-পারোর প্রয়াণের পর ভাই-লালোও স্থির করিলেন, এই মরজীবনের লীলায় এবার ছেদ টানিয়া দিবেন।

শিখ ভক্তদের কাছে সেদিন কথা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তের কথা তিনি ঘোষণা করিলেন। লক্ষ্য করা গেল, এ সময়ে তাঁহার নয়ন দুটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে। শিখ ভক্তেরা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করেন, "ভাই-লালো, আপনি গুরুর অন্যতম প্রবীণ ভক্ত, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ। দেহত্যাগের কথা প্রসঙ্গে আপনার চোখে জল দেখছি কেন? সবাই জানে, সকল ঐহিক কামনা বাসনার উর্ধ্বে আপনি চলে গিয়েছেন। তবে?"

ভাই-লালোর আননে ফুটিয়া উঠে হাসির আভা। শিখদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "না ভাই, তোমরা আমার মনের ব্যথা বুঝতে পারো নি। জান তো, আমার বাবা সাহুকারের ব্যবসায়ে অজস্র বিত্ত-সঞ্চয় ক'রে গিয়েছেন, আমিও বহু অর্থ উপার্জন করেছি। এই বিপুল সম্পত্তি আমার মৃত্যুর পরে অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের ভোগে

লাগবে। একথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন ঠিক করেছি, দেহান্তের আগে আমার বিরাট অট্টালিকায় শিখদের বাসস্থানের ব্যবস্থা ক'রে দেবো, আর গুরুর সেবার জন্য দিয়ে যাবো অর্থের একটা বড় অংশ। বাকীটা থাকবে পরিজনদের জন্য।"

ভাই-লালোর এই উদার সংকল্প সাধনে তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা কোনো বাধা জন্মান নাই, বরং তাঁহার সহায়তাই করিয়াছেন। বিত্ত বিলি করার পর প্রবীণ সাধক নিমজ্জিত হন আপন সাধনার গভীরে, তারপর একদিন গুরুদত্ত নাম জপিতে জপিতে প্রসন্ন বদনে ছিন্ন করেন মরজগতের বন্ধন। সমকালীন প্রবীণ শিখেরা ভাই-লালোর দেহান্তের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—সাপের খোলস ত্যাগের মতোই সহজ ও অনায়াস ছিল ভাই-লালোর দেহত্যাগ।

সাধারণভাবে অমরদাস গৃহীদের ত্যাগ তিতিক্ষা, বাসনা ক্ষয় ও জনকল্যাণকর কর্মের উপদেশ দিতেন। কিন্তু নিজের জ্ঞাননেত্র দিয়া যাহার জীবনে পরমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিতেন, তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন ভগবানের পরমসত্তাকে। 'ভক্তি, প্রপত্তি ও আত্মোৎসর্গের সংকল্প নিয়া ভগবৎ-চিন্তা আর ভগবৎ নামজপে নিবিষ্ট হও' এই তত্ত্বের বীজই রোপণ করিতেন তাঁহার অন্তরে।

সে-বার এক শিখ বণিক অমরদাসের নিকট গিয়া বলে, "গুরুজী, সারা জীবন আমি মানুষের কল্যাণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছি, দীন-দুঃখী আর সাধু সন্তদের ভিক্ষা দিয়েছি, হাসপাতাল ও ধরমশালা তৈরি করেছি, তীর্থ ভ্রমণও কম করি নি। কিন্তু কই, জীবনে শান্তি তো মিলে না? কি ভাবে কোন্ পথে চললে সংসারচক্র থেকে মুক্তি পাবো, ভগবানের দর্শন পাবো। তাও তো বুঝতে পারছিনে।"

অমরদাস উত্তর দিলেন, "পুণ্যকর্ম আর ভগবৎদর্শন বা মোক্ষ তো এক নয়, ভাই। বিষয় বাসনা ছেড়ে, দেহবুদ্ধি ছেড়ে, ভগবানকে—ভগবানের সেবাকে, দুহাতে আঁকড়ে ধর তবেই পাবে ভগবৎ-দর্শন, মিলবে অভীষ্ট পরমবস্তু।"

অধ্যাত্ম-সাধনার পথে ভগবানের নামজপ এক শ্রেষ্ঠ পাথেয়। গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ এই জপের কল্যাণকারিতা বার বার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সেই সুরে সুর মিলাইয়া অমরদাস কহিলেন, "নাম সাধন বিনা মানবের মুক্তি নেই। চার যুগে সন্তেরা এই নামের মাহাত্ম্য প্রচার ক'রে গিয়েছেন। কলিযুগের মানুষের কাছে এটাই হচ্ছে সাধনা ও সিদ্ধির শ্রেষ্ঠ পথ।"

এ কথা বলিতে বলিতে ভগবৎ-উদ্দীপনায় গুরু তন্ময় হইয়া পড়েন। গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে থাকেন তাঁহার এক নব রচিত স্তব :

সেবাকর্ম যদি করতেই হয়
তবে করো সেই পরম পুরুষ অলখ নিরঞ্জনের সেবা,
তাতেই সিদ্ধ হবে অভীপ্সা, হবে তুমি আপ্তকাম,
আর সব কর্মের মাধ্যমে আসবে তোমার চরম ব্যর্থতা।
প্রেম স্বরূপ আমার শ্রীভগবান
আত্মার জয়যাত্রার পথে প্রেরণা তিনি,
আবার সেই তিনিই ফুটে রয়েছেন ধ্রুবতারা রূপে।
ভগবানই আমার স্মৃতি, পুরাণ, শাস্ত্র,
ভগবানই আমার পরম আত্মজন
ভগবানের যে ক্ষুধায় সদা রয়েছি আর্ত হয়ে,
তার নিবৃত্তিও যে রয়েছে তাঁরই নামসুধায়।
এই দেহ আর ইহলোক ছেড়ে যেদিন চলে যাবে,
শুধু ভগবৎ-সাধনার পরম সম্পদ ছাড়া
আর কোনো সম্পদই পারবে না সঙ্গে নিয়ে যেতে।
হে নানক,[১] শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই ঘটছে সকল কিছু,
সেই পরম ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দাও তোমার সুর।

ভক্ত শিখদের দৃষ্টিতে সুলতানপুরের গায়ক-কবি ভাই-ভিখার

---

১ অঙ্গদ, অমরদাস প্রভৃতি শিখগুরুরা স্বরচিত স্তবে নিজেদের নাম সংযোজন করেন নাই, সর্বত্র নানকের ভণিতাই দিয়াছেন।

স্থান খুব উচ্চে। অল্প বয়স হইতেই ভগবৎ-বিরহের আগুন তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু কোন্ সাধনপথ অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবেন তাহা তাঁহার জানা নাই। তাই হৃদয়ের আর্তি নিয়া দীর্ঘদিন ঘুরিয়া বেড়ান তীর্থে তীর্থে আর সাধু মহাত্মাদের মণ্ডলী-গুলিতে। কিন্তু কোন্ মহাত্মাকে বরণ করিবেন গুরুরূপে, কোন্ সাধনপথে হইবেন অগ্রসর, তাহা স্থির করিতে পারেন না। হৃদয়ের জ্বালা তাঁহার দিনের পর দিন শুধুই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্তরের অন্তস্তল হইতে শুধুই জাগিয়া উঠে অতৃপ্তির হাহাকার। স্বরচিত বহু বিরহ সংগীত আর ভজনের মধ্য দিয়া ভাই-ভিখা ভগবানের চরণে নিবেদন করেন তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু কই, যাঁহার জন্য তাঁহার এই প্রাণের কান্না, তিনি তো একটিবারও সাড়া দিতেছেন না! মনোবেদনা ও নৈরাশ্যে তিনি মুষড়িয়া পড়েন।

অবশেষে হঠাৎ একদিন আসিয়া যায় ঐশ্বরীয় ইঙ্গিত। দৈবী কণ্ঠের নির্দেশ আসে, 'এত হা-হুতাশ না ক'রে তুমি গোবিন্দোয়ালে চলে যাও, সাক্ষাৎ করো অমরদাসের সঙ্গে। অভীষ্ট তোমার তাঁর কৃপায় সিদ্ধ হবে।"

আর কালবিলম্ব না করিয়া ভাই-ভিখা অমরদাসের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। গুরু তখন ভক্তদের উপদেশ দান করিতেছেন। ভিখার সারা দেহে মনে জাগিয়া উঠে দিব্য আনন্দের ঢেউ। একদৃষ্টে মহাত্মার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকার পর লুটাইয়া পড়েন তাঁহার চরণতলে।

প্রকৃতিস্থ হইবার পর ভাই-ভিখা অমরদাসকে উদ্দেশ করিয়া একটি সংগীত রচনা করেন, সভাস্থ সকলকে তখনি এটি তিনি গাহিয়াও শুনান। শিখ সাধক মহলে এ সংগীতটি এখনো গীত হইতে শুনা যায়। ইহার মর্ম :

গুরুর দিব্য জ্ঞানের নেই কোনো তুলনা,
সাধন-মগ্ন মানুষকে তা ঠেলে দেয় ভগবৎ-চরণে।
সত্য বস্তুরূপে ভগবান রয়েছেন চির বিরাজিত—

এই সত্যে নিবদ্ধ করো তোমার জীবন সাধনা,
জীবন হয়ে উঠুক সত্যময়, অমৃতময়
ভাগ্য বলে গুরুর দর্শন যদি যায় মিলে,
তাঁর কৃপাবলে মানুষ পেঁৗছে সেই পরম সত্যে,
জীবন হয় ধন্য, সার্থক, আলোকময়।
সদ্‌গুরুর সন্ধানে ঘুরে মরেছি কতকাল,
দেখেছি তপোনিষ্ঠ সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও পণ্ডিত—
নেভাতে কেউ পারেনি আমার অতৃপ্তির আগুন,
হাত বাড়িয়ে তোলেনি কেউ আমায় দিব্য সরণীতে !
হে মোর ভগবান, এবার পেয়েছি পথ-সন্ধান,
এবারে পেয়েছি আমার আলোকদিশারী গুরুকে।

এই স্তব গাথা শ্রবণ করিতে করিতে অমরদাস ধ্যানস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ভাই-ভিখাকে সস্নেহে নিকটে আনিয়া বসান, কপালে স্পর্শ করান পুণ্যহস্ত। তখনি নাম-মন্ত্র প্রদান করেন এই মুমুক্ষু গায়ক-কবিকে।

ভাই-ভিখার জীবনে এবার নামিয়া আসে আত্মপ্রত্যয় এবং প্রশান্তি। গুরুর কাছে থাকিয়া কিছুদিন তিনি সাধন ভজনে ব্রতী হন, নানা নিগূঢ় উপদেশ গ্রহণ করেন। তারপর নিজের শহরে ফিরিয়া গিয়া নিরত হন ধ্যান জপ ও নামমন্ত্রের অখণ্ড সাধনায়।

উত্তরকালে ভাই-ভিখা এক শিখ সিদ্ধপুরুষরূপে পাঞ্জাবের সর্বত্র পরিচিত হইয়া উঠেন।

ভাই মলহন, ভাই দীপা, প্রভৃতি তরুণ শিষ্যেরা একদিন মহাত্মা অমরদাসকে অনুরোধ করেন, "গুরুজী, উচ্চ স্তরের শিখ সাধকেরা সাক্ষাৎভাবে আপনার কাছ থেকে নিগূঢ় সাধনার প্রণালী শিখতে সক্ষম হন, নিষ্ঠাভরে তা অনুসরণ ক'রে তাঁরা সাফল্য অর্জনও করেন। কিন্তু বহু শিখ গৃহস্থভক্ত আছেন যাঁরা আপনার সান্নিধ্যে বেশীদিন থাকতে পারেন না। ঐ সব ভক্তের জন্য আপনি সাধারণভাবে কিছু

নির্দেশ দিন যা তাঁরা সহজে গ্রহণ করতে পারে, আর প্রচারকর্মে গিয়ে আমরাও তাদের এগুলো জানাতে পারি।"

গুরু উত্তরে জানাইয়া দেন, "প্রত্যেক গৃহস্থ শিখের প্রতি আমার উপদেশ: ধর্মান্ধতা ও অহংকার ত্যাগ করো। ব্রতী হও সাধু-মহাত্মাদের সেবায়। আমাদের সম্প্রদায়ের রীতি অনুসরণ ক'রে নিজ নিজ আহার্য তৈরি করো। অনাহারে যে ক্লিষ্ট তাকে খাদ্য দাও। পরিচ্ছদ কেনার মতো সঙ্গতি যার নাই, তাকে দান করো তোমার পরিচ্ছদ। রাত্রি অবসানের আগে নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, শুচি হয়ে আবৃত্তি করো পবিত্র জপজী। উচ্চ স্তরের সাধকদের পুণ্যময় সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করো, শব্দ বা অনাহত নাদ শ্রবণের জন্য হও ধ্যান-নিরত। তোমার সময়, অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করো শ্রীভগবানের সেবায়। শিখধর্মের অনুশাসন ও উপদেশ শ্রদ্ধাভরে করো অনুসরণ। গুরুদের রচিত পবিত্র স্তবগাথা আবৃত্তি ক'রে যাও সারা জীবন। এই সীমাহীন জগৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই তোমার একমাত্র প্রভু, একমাত্র আরাধ্য ভগবান,—এই তত্ত্বে হও বিশ্বাসী। এই সংসার হচ্ছে এক তরঙ্গ-সংকুল মহাসমুদ্র, এই সমুদ্রে তোমার জীবনতরী যদি অত্যধিক সাংসারিক বোঝা নিয়ে চলে, তবে তা হবে নিমজ্জিত; আর যদি সে বোঝা কম হয়, তবে তরী তোমার সহজে ভেসে থাকবে, আর তুমিও সহজে পেঁছাবে এ কূল থেকে ও কূলে।"

একদিন অতি প্রত্যূষে গুরুর ধর্মসভায় শিখ ভক্তেরা 'আসা কি উয়র' আবৃত্তি করিতেছেন, এমন সময়ে গুরু গভীর ধ্যানে নিমজ্জিত হইয়া পড়িলেন।

ধ্যানাবস্থায় পরমগুরু নানকজী কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন, কহিলেন, "শিখমণ্ডলী দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়ে চলেছে, এবার এই মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য একটি তীর্থ তুমি প্রতিষ্ঠা করো। একটি পবিত্র বাওয়ালি—কূপ—তুমি খনন করাও। সবাই তার জল স্পর্শ ক'রে ধন্য হোক।"

এই প্রত্যাদেশ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে অমরদাস তাঁহার আশ্রমের নিকটে কিছুটা জমি ক্রয় করেন। শুভ সংকল্প ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাওয়ালি খননের কাজ শুরু হইয়া যায়। শিখ ভক্ত ও শিষ্যেরা সবাই মিলিয়া পরম উৎসাহে এ কার্য সাধনে ব্রতী হন।

শত শত লোক এজন্য উদয়াস্ত পরিশ্রমে রত। কেহ কোদালি দিয়া খনন চালাইতেছে, কেহ ঝুড়ি ভর্তি মাটি টানিয়া নিয়া উপরে ফেলিতেছে, কেহ সোপান নির্মাণে ব্যস্ত, আবার কেহ বা নিয়াছে কর্মীদের স্নানাহারের ব্যবস্থার ভার। এইভাবে ভক্ত শিষ্যদের শ্রমদানের মধ্য দিয়া বাওয়ালির কাজ পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, এবং শিখ-সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে ইহা পরিচিত হয়।

এ সময়ে লাহোর শহরের চুনীমাণ্ডীতে হরিদাস নামক এক ধর্মপ্রাণ সোঁধি ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী দয়া কাউরও ছিলেন অতিশয় ভক্তিমতী। এই ক্ষত্রিয় দম্পতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন সুলক্ষণযুক্ত এবং রূপলাবণ্যময় এক শিশু। নামকরণ করা হয় —রামদাস। পিতামাতার প্রথম সন্তান, এজন্য সবাই তাহাকে ডাকিতেন জেঠা বলিয়া। এই জেঠা বা রামদাস উত্তরকালে গুরু অমরদাসের আশ্রয় লাভ করেন, গণ্য হন তাঁহার শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে।

কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করেন জেঠা। কিন্তু পড়াশুনায় বা সাংসারিক কাজকর্মে তাঁহার তেমন কোনো উৎসাহ দেখা যায় না। দিনরাত উদাসীনভাবে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান। সাধুসন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিলে সারাদিন অতিবাহিত হয় তাঁহাদেরই পিছে পিছে। মাতা পিতা উভয়েই তাহাকে নিয়া বড় দুশ্চিন্তায় পড়েন। কোনো বৃত্তি গ্রহণ না করিলে, কিছু উপার্জন না করিলে, এ ছেলে কি করিয়া ঘর সংসার করিবে ?

মায়ের গঞ্জনা সহিতে না পারিয়া জেঠা একদিন কহিলেন, "বেশ, এখন থেকে আমি রোজগারের চেষ্টা শুরু করবো। তুমি আমায় কিছু ছোলার ঘুগনি তৈরি ক'রে দাও, তাই ফিরি ক'রে

বেড়াবো। তারপর দেখি ধীরে ধীরে একটা খাবার তৈরির ব্যবসায় দাঁড় করানো যায় কিনা।"

ঘুগনি তৈরি হইল, একটি ঝুড়িতে এগুলি তুলিয়া নিয়া জেঠা নদীর পারঘাটার দিকে চলিলেন। ভাবিলেন, 'এখান দিয়া বহু লোক যাতায়াত করে, দেখা যাক, খদ্দের জুটে কি না।'

ঘাটের কাছে পেঁৗছিয়া দেখেন, একদল সাধু নদীতে স্নান সমাপণ করিয়া তীরে উঠিতেছে। আলাপ করিয়া বুঝিলেন, বহু দূর হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন, সবাই শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত। জেঠা ইহাদের সেবার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত। বিক্রয়ের জন্য ঝুড়িভর্তি যে খাদ্যবস্তু আনিয়াছেন তাহার সবটা দিয়া পরিতোষ সহকারে সাধুদের ভোজন করাইলেন।

সাধুরা মহাখুশী, তাঁহারা আশীর্বাদ করিলেন, "বেটা, তুমি ভক্তিমান্ এবং সাধুসেবায় তৎপর, পরমাত্মা অবশ্যই তোমার মঙ্গল করবেন।"

বলা বাহুল্য, সেদিন বাড়িতে ফিরিবার পর জেঠাকে মায়ের তীব্র ভর্ৎসনা সহ্য করিতে হয়।

কয়েকদিন পরের কথা। জেঠা দেখিলেন, শহরের রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে ভক্ত শিখদের একটি মিছিল। শিঙ্গা করতাল ও ভেরী বাজাইয়া ভজন গাহিতে গাহিতে সোৎসাহে তাহারা পথ চলিতেছে। প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, ইহারা সবাই গোবিন্দোয়ালের যাত্রী। একজন শিখ আবেগভরে জেঠাকে কহিলেন, "ভাই, আমরা চলেছি গুরু অমরদাসের দর্শনে। তাঁর দর্শন আর আশীর্বাদে ইহ-লোকে পাবে মঙ্গল, আর পরলোকে পাবে মুক্তি। যাবে তাঁর দর্শনে? তবে চল আমাদের সাথে।"

জেঠা এই মিছিলের সঙ্গে ভিড়িয়া পড়েন। তারপর উপস্থিত হন গোবিন্দোয়ালে অমরদাসের সকাশে।

শিখগুরু তাঁহার দরবারে সমাসীন। পশ্চাৎভাগে আশাশোটা ও চামর নিয়া দণ্ডায়মান তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত-শিষ্যের দল। আর

সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন শত শত ভক্ত ও দর্শনার্থী। স্তব, ভজন সংগীত ও সোহিলা আবৃত্তির পর গুরু শুরু করিলেন তাঁহার নিত্যকার ধর্ম-উপদেশ। এ উপদেশের এক একটি বাণী যেন চৈতন্যময়। তরুণ ভক্ত জেঠার হৃদয়ে এই বাণী প্রবল আলোড়ন তুলিয়া দিল। ভক্তি-আনত শিরে অমরদাসকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

গুরুর প্রশ্নের উত্তরে জেঠা কহিলেন, "প্রভু, সংসারের স্পৃহা আমার নেই, তাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি এক অজানা আকর্ষণে। আপনার কাছে এসে অবধি মনে হচ্ছে, আপনার চরণই আমার পরম আশ্রয়। আপনার এখানে আমায় আপনি স্থান দিন, প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের পথে আমায় চালিত করুন।"

গুরুর নয়ন দুটিতে প্রসন্নতার আভা। ইতিমধ্যেই তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, এই যুবক তাঁহার চিহ্নিত উত্তর সাধক। অজানিতভাবে, ঐশ্বরীয় ইঙ্গিতে চালিত হইয়া, সে আজ গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হইয়াছে, মাগিতেছে তাঁহার পরমাশ্রয়।

স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তিনি কহিলেন, "বৎস, যদি সত্যকার বৈরাগ্য তোমার জেগে থাকে, সত্যসত্যই যদি ঘর-সংসার ত্যাগ ক'রে এখানে এসে থাকো, তবে আশ্রয় এখানে অবশ্যই মিলবে। শুধু তাই নয়, যে পরম বস্তু পেয়ে মানুষ আপ্তকাম হয়, প্রকৃত স্বতন্ত্র পুরুষ হয়ে উঠে তা পেতে হলে শুধু ঘর-সংসারই নয়, ছাড়তে হয় ইহলোকের অনেক কিছু। ভগবানের সেবায় ও জপধ্যানে নিজেকে বিলিয়ে দাও, আত্মাভিমানকে নিশ্চিহ্ন করো, তবেই তো তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। ভগবানের দরবারে পেঁছিতে হলে সর্বাগ্রে চাই আত্মশুদ্ধির প্রস্তুতি। এখানকার কাজকর্ম ও ধ্যান ভজনের মধ্য দিয়ে এই প্রস্তুতি তুমি শুরু ক'রে দাও।"

দীক্ষা গ্রহণের পর গুরুর সেবায় ও শিখ মণ্ডলীর কর্মে জেঠা তাঁহার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, অল্পকাল মধ্যে গণ্য হন এক ত্যাগী কর্মী ও সাধকরূপে।

অমরদাসের দ্বিতীয়া কন্যা বিবি ভানি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে ভক্তপ্রবর

জেঠার (রামদাসের) সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের পরও জেঠার সাধনজীবনের গতিকে মন্থর হইতে দেখা যায় নাই, গুরুর সেবা এবং গুরুর লঙ্গরখানার কর্ম পূর্ববৎ নিষ্ঠা নিয়া তিনি সম্পন্ন করিতে থাকেন।

গুরুগত প্রাণ এই শিষ্য সম্পর্কে ম্যাকলিফ লিখিতেছেন, "জেঠা প্রাণপাত করিয়া যতই গুরুর সেবাকে আঁকড়িয়া ধরেন, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম তাঁহার ততই বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে বিস্তারিত হইতে থাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রেম। মানুষ মাত্রেই, তা সে যে ধর্ম বা সম্প্রদায়েরই হোক, হইয়া উঠে তাঁহার একান্ত আপনজন। এই মানসিকতার ফলে তাঁহার সাধন-জীবন হয় দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ। স্পর্শমণির স্পর্শে লোহা বোধহয় এমনিভাবে সোনায় পরিণত হয়। গুরু অমরদাসের ব্যক্তিগত সেবা ও মণ্ডলীর কাজকর্ম ছাড়াও এই সময়ে জেঠা গুরুর পবিত্র বাওয়ালি খননের কাজে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করিতে থাকেন। দেহের ক্লান্তির দিকে বিন্দুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া তিনি কূপের তলদেশ হইতে শত শত ঝুড়ি মাটি তুলিতেন। সঙ্গীরা এই প্রাণান্তকর পরিশ্রমের জন্য অনেক সময় তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। এই নিষ্ঠা ও ত্যাগ তিতিক্ষা গুরুর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, দেহবুদ্ধি ত্যাগ করার জন্য জেঠা প্রাণপণে যুঝিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার সাধনার প্রস্তুতিপর্ব এবার প্রায় সমাপ্ত। স্বভাবতই এ সময়ে গুরুকৃপা অকৃপণভাবে তাঁহার জীবনে বর্ষিত হইতে থাকে, এক উচ্চকোটির সাধকে তিনি পরিণত হন।

শিখধর্মগ্রন্থে বৈরাগী মইদাসের গুরুকৃপা প্রাপ্তির এক মনোরম আখ্যান রহিয়াছে। গুরু অমরদাসের ঋদ্ধি সিদ্ধির খ্যাতি শুনিয়া এই ভক্ত বৈষ্ণব একদিন গোবিন্দোয়ালে আসিয়া উপস্থিত হন। অমরদাসের নিয়ম—অভ্যাগতেরা আগে লঙ্গরখানায় বসিয়া সবার সঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন করিবে, সব মানুষকে সামাজিকভাবে এক

বলিয়া গ্রহণ করিবে, তবেই লাভ করিবে গুরুকে দর্শনের অধিকার। কিন্তু রন্ধন ও ভোজনের এ ব্যবস্থা নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব মইদাসের মনঃপূত হইল না। গুরুর দর্শন-আকাঙ্ক্ষা তিনি বিসর্জন দিলেন, রওনা হইলেন দ্বারকা তীর্থের দিকে।

পথ চলিতে চলিতে সেদিন গুজরাটের এক গহন বনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রাত্রিকাল, নিকটে কোথাও জনমানব নাই। এমন সময়ে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হইল, তাড়াতাড়ি এক বৃক্ষ কোটরে আশ্রয় নিলেন মইদাস। কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে রাত্রি কোনোমতে ভোর হইল।

দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঘন অরণ্যের মধ্যে কোথাও কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কয়েকদিন ক্রমাগত পদব্রজে পথ হাঁটার পর মইদাস অতিশয় পরিশ্রান্ত। তদুপরি রহিয়াছে ক্ষুধার জ্বালা।

দেহ প্রায় অবসন্ন, বন হইতে বাহির হইবেন সে সামর্থ্যই নাই। এ ঘোর বিপদে কৃষ্ণ ছাড়া আর কে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে? মনে মনে বার বার তাঁহাকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে সেখানে আবির্ভূত হন জটাজূট সমন্বিত এক বর্ষীয়ান্ সাধু, হস্তে তাঁহার খাদ্যের থালা—ভাত, ডাল, তরকারী তাহাতে সাজানো রহিয়াছে। আহার্য বিষয়ে মইদাসের স্পর্শ বিচার আছে। ভাবিলেন, কোন্ জাতির লোক এসব রান্না বান্না করিয়াছে তাহার কিছু ঠিক নাই। তবে কি করিয়া এই খাদ্য তিনি গ্রহণ করিবেন?

সাধু বুঝিলেন, এই অন্নব্যঞ্জন গ্রহণে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব মইদাসের মন সায় দিতেছে না। থালাটি নিয়া তিনি এক বৃক্ষের আড়ালে চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরেই আবার সেখানে ফিরিয়া আসিয়া সহাস্যে মইদাসের সম্মুখে রাখিলেন লুচি ও মিষ্টি দিয়া সাজানো একটি নূতন পাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই সাধু অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

ঘৃতপক্ব লুচি ও মিষ্টিতে মইদাসের তেমন আপত্তি রহিল না। এবার এগুলি তিনি উদরস্থ করিলেন। আহারের শেষে একটু সুস্থ

হইয়াই খুঁজিতে লাগিলেন সেই সাধুটিকে, খাদ্য দিয়া যিনি তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। তাই তো, চট্ করিয়া কোথায় তিনি সরিয়া পড়িলেন ?

এবার মইদাস ভাবিতে বসিলেন। সাধুটি প্রথমবার তাহাকে যে সব রান্না করা খাদ্য দিয়াছিলেন, এই দুর্গম অরণ্যে তাহা সংগ্রহ করা তো সহজ কাজ নয়। পরক্ষণেই তিনি আনিলেন লুচি মিষ্টির থালা। এ যে ভোজবাজীর মতোই বিস্ময়কর। এ সাধুর অন্তর্ধানও বড় রহস্যময়। এদিক সেদিকে মইদাস অনেক ছুটাছুটি করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখা গেল না।

এবার তাঁহার ধারণা জন্মিল, এই আগন্তুক কোনো সাধু বা সন্ন্যাসী নয়, আসলে মইদাসের প্রাণ রক্ষার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে কৃপা করিয়া যান।

জোড়হস্তে, আবেগ কম্পিত স্বরে, মইদাস বার বার জানাইতে থাকেন তাঁহার প্রার্থনা, "হে কৃষ্ণ, হে প্রভু বাসুদেব, কৃপা ক'রে এই অধমের প্রাণ যখন বাঁচিয়েছো, এবার তাকে একবার দেখা দাও।"

দৈবী কণ্ঠের এক প্রত্যাদেশ শোনা গেল এসময়ে, "মইদাস, তোমার বিধিনির্দিষ্ট গুরু হচ্ছেন অমরদাস। বৃথা কালক্ষেপ না ক'রে, অবিলম্বে তাঁর কাছে যাও, তাঁর আশ্রয়ে থেকে তুমি সাধন ভজন করো।"

মইদাস আবার ফিরিয়া চলিলেন, গোবিন্দোয়ালে। নৈষ্ঠিকতার যে সংস্কার ও অহংবোধ তাঁহার অন্তরে জাগ্রত ছিল, এবার তাহা নির্জিত হইয়া আসিয়াছে। অমরদাসের লঙ্গরখানায় সবার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া তিনি আহার করিলেন। তারপর লাভ করিলেন গুরুর দর্শন।

পরম স্নেহে অমরদাস এই নবভক্তকে গ্রহণ করেন, আশ্বাসভরা কণ্ঠে কহেন, "মইদাস, আমি জানি, তুমি শুদ্ধসত্ত্ব সাধক, ভগবানের বিশেষ কৃপা রয়েছে তোমার ওপর। নামদীক্ষা নেবার পর আমার

সান্নিধ্যে আটদিন তুমি বাস করো, তারপর তোমার সাধনপ্রণালী সম্পর্কে আমি তোমায় সব বলবো।”

অমরদাসের পরিকল্পিত পবিত্র বাওয়ালি খননের কাজ সেসময়ে অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছে বটে, কিন্তু তলদেশ হইতে জলধারা তখন অবধি উৎসারিত হয় নাই। খননকারী শিখেরা পড়িয়াছেন এক মহা সংকটে। বাওয়ালির সর্বনিম্ন স্তরে দেখা দিয়াছে একটা বিরাট পাথরের স্তর। এটিকে তাড়াতাড়ি ভেদ না করিতে পারিলে, জল উঠিবার কোনো সম্ভাবনা নাই।

কর্মীরা সমস্যাটি অমরদাসের গোচরে আনিলেন। সব শুনিয়া তিনি কহিলেন, “পাথরের একটি বিশেষ স্থান আমি চিহ্নিত ক'রে দিচ্ছি। নিচে নেমে তোমাদের কেউ একটি লৌহ কীলকের সাহায্যে সেখানটায় ছিদ্র ক'রে দিক। ছিদ্র করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তর স্তরটি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, জল উঠতে থাকবে প্রচণ্ড বেগে। কিন্তু একটা বিপদ আছে একাজে। বাওয়ালির নিম্নপ্রদেশে দাঁড়িয়ে যে এই লৌহ কীলক প্রবিষ্ট করাবে তার জীবন কিন্তু বিপন্ন হবে। ক্ষিপ্রবেগে উত্থিত ঐ জলপ্রবাহ তাকে সজোরে আছড়ে ফেলবে।”

গুরুর কথা শুনিয়া সকলেই শঙ্কিত। তিনি এবার প্রশ্ন করিলেন, “তোমাদের মধ্যে কে যাবে একাজে এগিয়ে, আপন প্রাণ বিপন্ন ক'রে কে এই বাওয়ালির কাজকে পূর্ণাঙ্গ ক'রে তুলবে ?”

কেহই কোনো কথা কহিতেছেন না, সকলেই একেবারে চুপচাপ। এমন সময়ে গুরুর অন্যতম প্রিয় শিষ্য মানকচাঁদ ধীর পদে অগ্রসর হইয়া আসেন, বলেন, “গুরুজী, একাজের দায়িত্ব আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আপনার ও শিখমণ্ডলীর আরব্ধ পুণ্যকর্ম সমাপ্ত করতেই হবে, তাতে বিপদের ভয় করলে চলবে কেন ?”

বৃহৎ একটি লৌহ কীলক নিয়া মানকচাঁদ বাওয়ালির নিম্নদেশে নামিয়া গেলেন, সেটিকে প্রোথিত করিয়া দেন, সেই পাথরের স্তরে। পাথর ভাঙিয়া যায়, শো-শো করিয়া উদ্গত হয় রুদ্ধ জলস্রোত, মানকচাঁদের দেহটিকে আছাড়িয়া ফেলে কূপের সুদৃঢ় বেষ্টনীর গাত্রে।

ক্ষণপরেই তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ উপর দিকে ভাসিয়া উঠে, শিষ্য ভক্তদের মধ্যে হায়-হায় রব পড়িয়া যায়।

মানকচাঁদের মাতা ও স্ত্রী এ সংবাদ পাইয়া উন্মত্তের মতো ছুটিয়া আসেন, বাওয়ালির পাশে দাঁড়াইয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে গুরু অমরদাসের কাছে এই দুঃসংবাদটি পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাওয়ালির ধারে তিনি ছুটিয়া আসেন। ভক্ত মানকচাঁদের ভাসমান দেহের দিকে কিছুক্ষণ তাঁহাকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতে দেখা যায়। অতঃপর তাহার জননী ও স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া আশ্বাসভরা কণ্ঠে বলেন, "মানকচাঁদের মৃত্যু কি ক'রে হবে গো ? সে যে জীবিত থেকে বহুলোককে উদ্ধার করবে। ভগবান অবশ্যই তাঁকে বাঁচিয়ে তুলবেন।"

এবার কূপের ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুরু উচ্চ স্বরে ডাকিয়া বলেন, "মানকচাঁদ, তুমি ওভাবে জলের ওপর পড়ে আছো কেন ? তুমি যে আমার জীয়র[১] ছেলে, এক্ষুনি চোখ মেলে চাও আমাদের দিকে। দেখছো না তোমার মা তোমার শোকে কেঁদে সারা হচ্ছেন। এবার উঠে এস তুমি আমাদের কাছে।"

এবার সর্বজনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল অমরদাসের এক অত্যাশ্চর্য বিভূতি-লীলা। দেখিতে দেখিতে মানকচাঁদের দেহে প্রাণসঞ্চারিত হইল। বাওয়ালির সোপানের কাছে আসিয়া তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন। সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গুরুর দরবারে আনিয়া শোয়াইয়া দিলেন। ভক্ত শিখদের উল্লাসভরা কণ্ঠের 'ওয়াগুরু' রবে দশদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার পরের দিন অমরদাস তাঁহার নূতন শিষ্য মইদাসকে নিকটে ডাকাইলেন। প্রশান্ত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "গতকাল নিজের চোখে তুমি মানকচাঁদের আত্মোৎসর্গের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছো।

---

১ জীয়র শব্দের অর্থ জীবন্ত। আজ অবধি গুরুকৃপাপ্রাপ্ত মানকচাঁদের উত্তর পুরুষদের শিখেরা জীয়র বংশের সন্তান বলে অভিহিত করেন।

জেনে রাখবে, সে শুধু গুরুগতপ্রাণ শিষ্যই নয়, গুরুর সাধনশক্তিও অনেকাংশে তার ভেতরে সঞ্চারিত হয়েছে। মানকচাঁদ একজন প্রচ্ছন্ন সিদ্ধ সাধক, বহু লোককে উদ্ধার করার মতো সামর্থ্য রয়েছে তার। তুমি তার কাছ থেকে নিগূঢ় সাধনার প্রণালী জেনে নাও, নিমজ্জিত হও জপ ধ্যানের গভীরে। তারপর এই সাধনার ধারাকে দিকে দিকে বিস্তারিত ক'রে দাও।"

মানকচাঁদের কাছ হইতে সাধন নিবার পর মইদাস তাঁহার স্বগ্রামে চলিয়া যান। সেখানে একান্তে বসিয়া দীর্ঘ সাধনার ফলে লাভ করেন বহুতর সাধন ঐশ্বর্য। উত্তরকালে শিখধর্মের এক বিশিষ্ট প্রচারকরূপে তিনি খ্যাত হইয়া উঠেন।

শিখ ধর্মনেতাদের সম্পর্কিত হিন্দী জীবনীগ্রন্থ সূরযপ্রকাশ-এ গুরু অমরদাস ও আকবরের মিলনের এক কাহিনী বর্ণিত আছে। দিল্লী হইতে আকবর সে-বার লাহোর যাইতেছিলেন, অমরদাসের সাধন ঐশ্বর্যের খ্যাতি পূর্ব হইতেই তাঁহার শুনা ছিল, এবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। বিপাশা নদী পার হইয়া একটু ঘুর-পথে সম্রাট গোবিন্দোয়ালে গিয়া পৌঁছিলেন।

আকবর ধর্মগুরুদের মান রাখিতে জানিতেন। তাই অমরদাসের আশ্রমের কাছে গিয়া তিনি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন, অগ্রসর হইলেন পদব্রজে।[১]

গুরু অমরদাসের দর্শন লাভ করিতে হইলে, আগে তাঁহার লঙ্গরখানার খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়, সম্রাটকে একথা জানানো হইল। তৎক্ষণাৎ এ নিয়ম তিনি রক্ষা করিলেন। রসুই গৃহের সামান্য একটু খাদ্য মুখে পুরিয়া নিয়া উপস্থিত হইলেন গুরুর ধর্মসভায়।

কুশল প্রশ্ন ও আলাপ আলোচনার পর আকবর কহিলেন, "মহাত্মন্, আপনার লঙ্গরখানায় দেখছি প্রচুর জনসমাগম হয়। আপনার এই বিপুল ব্যয়ভারের কিছুটা অংশ আমায় বহন করতে দিন।

---

১ সূরযপ্রকাশ, রাস্ ২, অধ্যায় ১০

কয়েকখানা গ্রাম আমি আপনার নামে লিখে দিচ্ছি, এর আয় থেকে আপনার খাদ্য বিতরণের কাজে সাহায্য হবে।"

অমরদাস সহাস্যে উত্তর দিলেন, "সম্রাট, আমার স্রষ্টা শ্রীভগবান আমাকে অনেক কিছু তো নিজ থেকেই দিচ্ছেন। আমার ভক্ত-শিখেরা যে যা পারে সাধ্যমতো আমার এখানে ভেট দেয়, তাই দিয়ে লঙ্গরখানার কাজ অব্যাহত থাকে। যে দিন যা ভাণ্ডারে আসে তা সেদিনই খরচ ক'রে ফেলা হয়—এই এখানকার নিয়ম। পরের দিনের জন্য সঞ্চয় কিছু রাখা হয় না। এভাবেই হাজার হাজার লোককে আমরা আহার্য দিতে সক্ষম হচ্ছি। ভগবানের উপরই আমরা নির্ভর ক'রে আছি, তাই যেন শেষ পর্যন্ত থাকতে পারি।"

আকবর বুঝিলেন, গুরুকে গ্রামদান গ্রহণ করানো যাইবে না। অথচ এই বিরাট কর্মযজ্ঞে কিছু সাহায্য দিতে না পারিলে তিনি স্বস্তি পাইবেন না। অবশেষে অমরদাসের অনুমতি নিয়া তাঁহার কন্যা বিবি ভানির নামে আকবর গ্রাম কয়টি লিখিয়া দিলেন।

পারস্পরিক প্রীতি সম্ভাষণের পর সম্রাট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং বিদায়কালে গুরু অমরদাস তাঁহাকে একটি মূল্যবান জোব্বা, উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন।

সে-বার একজন ধনী শেঠ অমরদাসকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার আনীত ভেটদ্রব্যের মধ্যে রহিয়াছে রত্নখচিত একটি বহু-মূল্যবান হার। এই হারটি তিনি গুরুর গলায় পরাইয়া দিতে চান। গুরু হাসিয়া কহিলেন, "আমি বৃদ্ধ মানুষ, এই মূল্যবান হার কি আমার গলায় শোভা পায়? বরং আমার পরম স্নেহভাজন এবং আমার দ্বিতীয় স্বরূপ কোনো তরুণ সাধককে এটি উপহার দাও।"

কে সেই ভাগ্যবান সাধক, গুরু যাহাকে দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া গণ্য করিতেছেন। সভা প্রাঙ্গণে গুঞ্জন উঠিল, কেহই বুঝিতেছে না গুরু অমরদাস কাহাকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন, গুরুর পুত্রদ্বয় মোহরি বা মোহন হয়তো হইবে, উভয়েই

উন্নত ধরনের সাধক। কেহ বা নবাগত অন্যান্য তরুণ শিষ্যদের কথা বলিতেছেন। সবাকার জল্পনা কল্পনায় ছেদ টানিয়া দিয়া গুরু প্রসন্ন বদনে কহিলেন, এ হার পরবার যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছে আমাদের জেঠা—রামদাস। শেঠজীর হাত হইতে রত্নখচিত হারটি তুলিয়া নিয়া এইটি তিনি প্রিয়তম শিষ্যের গলায় দোলাইয়া দিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। গুরু অমরদাস কয়েকজন শিষ্য সহ বিপাশার তীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। হঠাৎ সেখানে এক পাগলাটে সাধুর সঙ্গে তাঁহাদের দেখা। সাধুটি অমরদাসকে দেখিয়াই আপন মনে গালাগাল শুরু করিয়া দেয়। বলিতে থাকে: "এই তো দেখছি গুরু অমরদাসকে। আহা, কি এক মস্ত গুরুই যে তিনি হয়ে গেছেন। লোককে ক্ষেপিয়ে তুলে অজস্র টাকাকড়ি নিচ্ছেন, আর তা অপচয় করছেন হাজার হাজার বাজে লোককে খাইয়ে দাইয়ে। কেন, এই যে আমি একটা সাধু এখানে পড়ে আছি, আমার দিকে তো তাঁর কোনো লক্ষ্য নেই। কই, এতটুকু আফিম বা ভাঙও তো আমার জন্য পাঠান নি। আমায় কিছু দান করলে পুণ্য হয়। অমরদাস কি তা জানে? ওর কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান আছে?"

অমরদাস ধৈর্য ও প্রশান্তির মূর্ত বিগ্রহ। সাধুর কথা শোনার পর কোনো ভাব বৈলক্ষণ্যই তাঁহার মধ্যে দেখা যায় না। আরও একদিন সাধুটি এভাবে অমরদাসকে গালিগালাজ করিয়াছে এবং তিনিও তাহাতে কোনো কর্ণপাত করেন নাই।

আর একদিন নদীতীরে জেঠাকে একলা পাইয়া সাধুটি পূর্ববৎ অমরদাসের নিন্দা শুরু করিয়া দেয়। জেঠা বিরক্তির সুরে কহিলেন, "রোজ রোজ তুমি এই তিক্ততা বাড়াচ্ছো কেন বল তো। এমন একজন সর্বজনমান্য মহাত্মাকে গালিগালাজ করলে পাপ হয় তা জানো?"

সাধুটি বলিয়া উঠে, "কেন করবো না? এত লোকে আমায় ভিক্ষা দেয়, কিন্তু তোমার গুরু কি কখনো একটা পয়সা আমায় দিয়েছে? এই তো তোমার গলায় দুলছে দেখছি একছড়া হার। ওটা আমার

দিয়ে দাও দেখি। ওটা বিক্রি করলে আমার বেশ কিছুদিনের খোরাক হয়ে যাবে।"

কোনো দ্বিরুক্তি না করিয়া জেঠা তাঁহার গলার হারটি তখনি পাগলা সাধুকে দান করেন। বলেন, "দেখো, এবার থেকে আর অযথা গুরু অমরদাসের নিন্দাবাদ ক'রো না।"

সাধু তো আনন্দে আত্মহারা। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে থাকে, "বেঁচে থাকো বেটা, সুখে থাকো। তুমি দেখছি পুরাণের রাজা হরিশ্চন্দ্র, কর্ণ, বিক্রমাদিত্যের চাইতেও বড় দাতা।"

যাক্, দুর্মুখ পাগলাটে সাধুকে তো বশীভূত করা গিয়াছে। এবার জেঠার মন অনেকটা হাল্কা। সানন্দে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নিত্যকার দিনচর্যা শুরু করিলেন।

অমরদাসের কাছে যাইতেই তাঁহার চোখ পড়ে জেঠার খালি গলার দিকে। প্রশ্ন করেন, "তোমার সেই মূল্যবান হারটি কোথায় গেল, বল তো?"

"সেটি আমি নদীতীরের সেই পাগলা সাধুটিকে দান করেছি। মহারাজ, শ্রীভগবানের নামের যে হার কৃপা ক'রে আপনি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন, তা নিয়েই আমি দিব্য আনন্দে দিনরাত ভরপুর রয়েছি। রত্নখচিত হার দিয়ে আমার কি প্রয়োজন?"

গুরুর চোখে মুখে খুশীর উচ্ছলতা। প্রসন্ন কণ্ঠে বলেন, "জেঠা, তুমি ভাগ্যবান্, দুর্লভ ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী তুমি হয়েছো। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার বংশে এই ভগবৎপ্রেমের ধারা থাকবে অব্যাহত।"

অমরদাসের খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং শিষ্য ও ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। ইহা দেখিয়া একদল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় শঙ্কিত হইয়া উঠে। এই নূতন ধর্মান্দোলনকে প্রতিরোধ করার জন্য তাহারা তৎপর হয়।

বিরোধীদের যুক্তি—অমরদাস জাতিবর্ণ সব একাকার করিয়া

দিতেছেন। তাঁহার লঙ্গরখানার সামনে ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করে। উচ্চবর্ণের ভক্তেরাও ভক্তি ভরে তাহার পাদোদক পান করে। এই ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা চলিতে দিলে ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব ও সম্মান ধূলিসাৎ হইবে। ক্ষত্রিয়দের ধর্মও হইবে বিলুপ্ত। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া অমরদাসের মণ্ডলীর উপর আঘাত হানা প্রয়োজন।

এই বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মারওয়াহা নামে এক ক্ষত্রিয় জমিদার। দিল্লীতে সম্রাটের দরবারে তাহারা অভিযোগ উপস্থিত করে,—অমরদাস হিন্দুধর্ম ও সমাজের উপর প্রবল অত্যাচার শুরু করিয়াছেন, সরকারের উচিত এখনই তাঁহাকে দমন করা।

সম্রাটের দরবারের একজন প্রভাবশালী মুসলমান মনসব্‌দার অমরদাসকে জানিতেন। তিনি এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠান। এ প্রসঙ্গে সম্রাটকেও স্মরণ করাইয়া দেন যে, ইতিপূর্বে অমরদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তাঁহার লঙ্গরখানার ব্যয় নির্বাহের জন্য সম্রাট তাঁহার কন্যার নামে কয়েকটি গ্রামও দান করিয়াছেন। অমরদাসের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও ধর্মপরায়ণতার স্মৃতি তখনো সম্রাটের মনে জাগরূক রহিয়াছে। তাই এই অভিযোগ তিনি বাতিল করিয়া দিলেন।

বিরোধীরা সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। কিছুদিন পরে আবার তাহারা এক নালিশ দায়ের করে। এবারকার যুক্তি অতি প্রবল। নালিশকারীদের বক্তব্য, অমরদাসের অনাচারের ফলে একদল সমাজদ্রোহীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহারা শুধু সমাজের উপর আঘাত হানিয়াই থামিবে না, সংঘবদ্ধভাবে অচিরে রাজনৈতিক বিরোধিতাও শুরু করিবে, সম্রাটের বিরুদ্ধে হানিবে প্রচণ্ড আঘাত। এখনই এই বিদ্রোহের অঙ্কুর সমূলে উৎপাদন করা দরকার। অমরদাসের মণ্ডলী ভাঙিয়া দেওয়া হোক্, অথবা তাঁহাকে ও তাঁহার দলবলকে পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত করা হোক।

এবার দিল্লী দরবার হইতে সমন জারী করা হয়, অমরদাস যেন

স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই অভিযোগ সম্পর্কে তাঁহার নিজের বক্তব্য পেশ করেন। দরবারের একজন কর্মচারী সমনটি নিয়া গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত।

অমরদাস আবেদন জানান, "আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার পক্ষে দিল্লীতে হাজির হওয়া সম্ভব নয়, সম্রাট যেন এজন্য আমায় মার্জনা করেন। আমার প্রতিনিধিরূপে আমার প্রধান শিষ্য জেঠা (রামদাস) যাবে দিল্লী দরবারে। আমার দিককার বক্তব্য সে বুঝিয়ে বলতে পারবে।"

অমরদাসের এই আবেদন গ্রাহ্য হয়। জেঠাও গুরুর আশীর্বাদ নিয়া উপস্থিত হন দিল্লীর দরবারে। অভিযোগের উত্তরে তিনি জানান, তাঁহার গুরু অমরদাস বলপ্রয়োগ করিয়া কাহাকেও তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করান নাই। তাঁহার উদার মতবাদই জনগণকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহার লঙ্গরখানার একসঙ্গে বসিয়া আহার করার ফলে জনগণের মধ্যে বৃদ্ধি পাইতেছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বোধ।[১] এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনার প্রতিও লোকের আগ্রহ জাগিয়াছে। গুরু অমরদাসের এই আদর্শ ও কর্মসূচী নিশ্চয়ই সম্রাটের দৃষ্টিতে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

জেঠার এই বক্তব্য শুনিয়া সম্রাট সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিরোধীদের অভিযোগ-পত্র বাতিল করিয়া দেন।

কিছুদিন পরে রামদাস একবার কুরুক্ষেত্র ও হরিদ্বার অঞ্চলে পরিব্রাজন করিতে বাহির হন। এই অঞ্চলে শিখধর্মের প্রচার এযাবৎ করা হয় নাই, প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই একদল অন্তরঙ্গ শিষ্য ও সেবকদের নিয়া তিনি যাত্রা শুরু করেন।

কুরুক্ষেত্র এবং থানেশ্বর অঞ্চলে বহু নূতন ভক্তকে অমরদাস নাম-মন্ত্র দান করেন। শিখধর্মের উদারতা, ভক্তিবাদ এবং শরণাগতির বাণী সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারিত হইতে থাকে।

---

১ শিখিজম্—এ. রোজ; এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব এথিক্‌স অ্যাণ্ড রিলিজিয়নস্।

কন্‌খল ও হরিদ্বারে গুরু অমরদাসকে দর্শনের জন্য ভিড় জমিয়া যায়। বহু মুক্তিকামী নরনারী এই বর্ষীয়ান্ মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়।

পরিব্রাজনের পথে যে সব স্থানে অমরদাস তাঁহার শিষ্যগণসহ অবস্থান করেন এবং ধর্ম-উপদেশ দান করেন, শিখ সাধকদের দৃষ্টিতে সে স্থানগুলি পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। এই সব স্থানে গুরু তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাসমতো দরবার বসাইতেন। জপজী এবং সোহিলা আবৃত্তি করা হইত, নূতন নূতন যেসব স্তব তিনি রচনা করিতেন, তান লয় সহযোগে সেগুলি ভক্তিভরে গীত হইত।

এসময়কার রচিত একটি স্তবে গুরু অমরদাস বলিতেছেন :

অসীম অনন্ত প্রভু আমার অলখ নিরঞ্জন,
বৃথা খুঁজে বেড়াও তাঁকে দেশ দেশান্তরে।
গোপনে, সবার অলক্ষ্যে রয়েছেন তিনি বিরাজিত
প্রতি মানুষের হৃদয় কন্দরে।
গুরুর পদে করো আগে আত্মসমর্পণ,
অহমিকার সামান্যতম চিহ্নটি ফেল মুছে,
সাক্ষাৎ করো তোমার বহুবাঞ্ছিত ভগবানকে।
ওগো, হারিয়ে ফেলেছি আমি আমার সত্তাকে
ছড়িয়ে দিয়েছি নিজেকে অগণিত মানুষের হৃদয়ে,
যেখানে সংগোপিত সুমধুর নাম সুধা।
মুক্তি আর অমৃত দুই-ই রয়েছে এই নামে,
গুরুর দাক্ষিণ্যে ও স্পর্শে হয়েছে তা মধুরতর।
অহংকারের পাষাণ প্রাচীর দাও ভেঙে ফেলে,
মুক্ত ক'রে দাও চৈতন্যের স্রোতধারা
গুরু কৃপার বলে জাগিয়ে তোল তোমার নামমন্ত্র,
গুরু কৃপার জ্যোতিতে কৃতার্থ হও তুমি।
গহন অরণ্যে গুপ্ত রয়েছে যে মহাধন
গুরু ছাড়া কে দেবে তার পথ সন্ধান?

পরম পুরুষকে পাবে না হেথায় হোথায় ঘুরে,
একান্ত ধ্যানে নয়ন করো নিমীলিত,
অনাহত নাদকে স্পর্শ করো তোমার চেতনা দিয়ে,
সেই পরম এক এবং পরম সত্যকে হও পরিজ্ঞাত।
সদ্‌গুরুর হাতে রয়েছে সেই চাবিকাঠি
যা খুলে দেবে মুমুক্ষার দ্বার,
দেহ থেকে দেহান্তরে ঘুরে মরার পাপচক্র
হবে চিরতরে বিধ্বস্ত, ফিরে পাবে তুমি নিজেকে।

দীর্ঘ পরিব্রাজনের পর অমরদাস আবার তাঁহার নিজের স্থানে, গোবিন্দোয়ালে, ফিরিয়া আসেন। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহিয়া যায়।

গঙ্গো নামে এক ধনী ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ে বহু টাকা লোকসান দেয় এবং শেষটায় একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়ে। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা সবাই এসময়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই চরম দুর্দশার দিনে গঙ্গো শুনিতে পায় সিদ্ধপুরুষ অমরদাসের কথা, আর্ত ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁহার কৃপার কথা। অতঃপর পদব্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সে উপস্থিত হয় গোবিন্দোয়ালে।

গুরুর চরণে পতিত হইয়া গঙ্গো নিবেদন করে তাহার দুঃখের কাহিনী, কাঁদিয়া বলে, "আপনি আমায় কৃপা করুন, আমায় মানুষের মতো বাঁচতে দিন। আপনার আশ্রয় না পেলে বিপাশার জলে গিয়ে আমি ডুবে মরবো।"

গুরুর অন্তর বিগলিত হইল, কহিলেন, "ভয় নেই, আবার তুমি তোমার বিত্ত বিষয় ফিরে পাবে, কিন্তু ধর্মের দিকে, আর্তের দুঃখ মোচনের দিকে সদাই দৃষ্টি রেখো। তুমি দিল্লী শহরে যাও, সেখানে গিয়ে সাহুকারী ব্যবসায় খোল।"

নির্দেশ মতো গঙ্গো শুরু করে তাহার নূতন ব্যবসায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ধনী শেঠরূপে সে পরিচিত হইয়া উঠে।

সে-বার এক দুঃস্থ ব্যক্তি গুরু অমরদাসের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়ে, বলে, "আমার কন্যার বিয়ে স্থির হয়েছে, কিন্তু হাতে একটি পয়সা নেই। আপনি আমায় এ সংকট থেকে উদ্ধার করুন। আপনার তো কত ভক্ত শিষ্য রয়েছে, এদের কারুর কাছ থেকে আমায় কিছু অর্থ যোগাড় ক'রে দিন।"

গুরু তাহাকে অভয় দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা মোটা টাকার হাত চিঠা দিয়া দিল্লীতে ভক্ত গঙ্গোর কাছে পাঠাইয়া দেন।

গঙ্গো কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত লোকটিকে টাকা দেয় নাই। প্রচুর অর্থের অধিকারী হওয়ার পর হইতে তাহার চরিত্র কিছুটা বদলাইয়া গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিল, 'একবার যদি গুরুর এই হাতচিঠায় টাকা দিই, তা হলেই বিপদ। প্রায়ই এ ধরনের দাবি আমার ওপর চেপে বসতে থাকবে।' অমরদাসের প্রেরিত লোকটিকে সে ফিরাইয়া দিল।

সকল কথা শোনার পর গুরু কহিলেন, "অর্থ ও জাগতিক প্রতিষ্ঠা এমনি ক'রেই মানুষের ভেতরকার দিব্যসত্তাকে নষ্ট ক'রে ফেলে। আমার হাতচিঠাকে অগ্রাহ্য ক'রে গঙ্গো ভাল কাজ করে নি। যাক্, এসো এ দুঃস্থ লোকটিকে আমরা সবাই মিলে সাহায্য করি।"

সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হয়, এবং গুরুর চরণে প্রণাম জানাইয়া বিপন্ন প্রার্থী হাসি মুখে বিদায় নেয়।

অতঃপর গঙ্গোর ব্যবসায়ে আকস্মিকভাবে এক সংকট দেখা দেয় এবং অল্পদিনের মধ্যে সে দেউলিয়া হইয়া পড়ে।

এবার হৃতসর্বস্ব গঙ্গোর চৈতন্যোদয় হয়, গুরুর দরবারে আসিয়া দৈন্যভরে পতিত হয় তাঁহার চরণতলে। অনুতাপের দহনে তখন সে জ্বলিয়া মরিতেছে। সজল চক্ষে নিবেদন করে, "গুরুজী, এবার আমি বুঝতে পেরেছি, অর্থ ও মান যশ আমার কি ক্ষতিসাধন করেছে। অহংকারে মত্ত হয়ে আমি আপনার মতো আশ্রয়দাতাকেও ভুলে গিয়েছি। আপনার চরণে আমার এই মিনতি, এখন থেকে অর্থ যেন আমার জীবনে না আসে, আবার যেন আমায় অন্ধ ক'রে

না ফেলে। অর্থের বাসনা আমার চিরতরে দূর হয়েছে, এবার আমি চাই পরমার্থ। কৃপা ক'রে মুক্তির পথ আমায় আপনি দেখিয়ে দিন।"

গঙ্গোর জীবনে আসে এবার তীব্র বৈরাগ্যের জোয়ার। তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন ও গুরুসেবার নিষ্ঠা দেখিয়া ভক্ত শিষ্যেরা বিস্মিত হইয়া যায়।

করুণাধারা এবার ঝরিয়া পড়ে ভক্ত গঙ্গোর জীবনে। পরম স্নেহে গুরু নামমন্ত্র তাহাকে দান করেন, সেই সঙ্গে একখণ্ড শুক্ল উত্তরীয় তাহার শিরে জড়াইয়া দিয়া বলেন, "আত্মশুদ্ধির আগুন জ্বলে উঠেছে তোমার জীবনে, আর ভয় নেই। আমি আশীর্বাদ করি, সাধনায় সফলকাম হও তুমি। শুধু তাই নয়, তোমার এই সাধনার ঐশ্বর্য তুমি বিতরণ করো দেশের জনগণের মধ্যে।"

আম্বালা জেলার দাউ নামক স্থানটি আজো সিদ্ধ সাধক গঙ্গোর সাধনপীঠ রূপে পরিচিত হইয়া আছে।

•

প্রেমা নামক এক হতভাগ্য ক্ষত্রিয় যুবক সে-বার গোবিন্দোয়ালে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাল্যকালেই পিতামাতাকে সে হারায়, পৈতৃক সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল নিকট আত্মীয়েরা তাহা জবরদখল করিয়া বসে। আশ্রয়হীন, কপর্দকহীন প্রেমার জীবনে আসে দৈবের আরো কঠিন আঘাত, জঘন্য কুষ্ঠরোগে সে আক্রান্ত হয়। এই চরম দুর্দশার দিনে ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া সে দিন যাপন করিতে থাকে।

লোকের মুখে প্রেমা শুনিতে পায় অমরদাসের সিদ্ধ জীবনের নানা আশ্চর্য কাহিনী। ভাবিতে থাকে, 'এই মহাপুরুষের কৃপায় কত আর্তমানুষ উদ্ধার পেয়েছে, মারাত্মক রোগের কবল থেকে বেঁচে উঠেছে। আমার মতো অসহায় ও রুগ্ন মানুষের ওপর কি তাঁর কৃপাদৃষ্টিপাত হবে না?'

আশায় বুক বাঁধিয়া, সারা পথ হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে প্রেমা একদিন আসিয়া উপস্থিত হয় গোবিন্দোয়ালে। গুরু অমরদাসকে

কেন্দ্র করিয়া এক বৃহৎ নগরের সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে। নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ শিখ ভক্তেরা কেহ গাহিতেছে নাচিতেছে, কেহ বা চক্রাকারে বসিয়া গুরুর রচিত আনন্দ্, সোহিলা ও স্তবগানে আত্মহারা হইয়া আছে।[১] এ যেন এক আনন্দের হাট।

ভাবাবেগে উচ্ছল প্রেমা গুরুর উদ্দেশে রচনা করে এক স্তবগান, অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বার বার তাহা গাহিতে থাকে। রাস্তায় ভিড় জমিয়া যায়।

প্রেমা কাতর কণ্ঠে বর্ষীয়ান্ শিখদের কাছে গিনতি জানায়, "গুরুর দর্শন ও কৃপা লাভের ব্যবস্থা আপনারা ক'রে দিন, আমি যে এসেছি তাঁর কাছে এক নূতন জীবন ভিক্ষা করতে।"

সবাই তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "গুরুর লঙ্গরখানায় আহার ক'রে তুমি অপেক্ষা করো। গুরু নিজেই তোমায় আহ্বান ক'রে নেবেন, অন্ধ আতুর ও মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা আছে, ঐদিন তোমাকেও তিনি টেনে নেবেন তাঁর কাছে।"

কিন্তু প্রেমাকে বেশী অপেক্ষা করিতে হইল না। এক অন্তরঙ্গ ভক্ত গুরুর কাছে গিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহার চরম দুর্ভাগ্যের কথা, আর সেই সঙ্গে বার বার প্রশংসা করিলেন তাহার সদ্য রচিত স্তবগানের। শিখটি আরো কহিলেন, "গুরুজী সব চাইতে বিস্ময়ের কথা, মারাত্মক ঘৃণ্য রোগে প্রেমা ক্লিষ্ট, কিন্তু গুরুর স্তব রচনা করার মতো আর তা গেয়ে শোনানোর মতো আনন্দ তাঁর অন্তরে উচ্ছলিত হয়ে উঠ্ছে। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড!"

প্রসন্ন মধুর হাসি হাসিয়া অমরদাস উত্তর দিলেন, "প্রেমা খুঁজে পেয়েছে তার চিরন্তন দিব্যসত্তা, সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের আমূল পরিবর্তনও শুরু হয়ে গিয়েছে। এখানকার আশীর্বাদ এবার অবশ্যই তার ওপর বর্ষিত হবে। কাল প্রত্যূষে আমার স্নানকরা বিপাশার জলে তার সারা দেহ ধুইয়ে দাও, তারপর তার ঘায়ের

১ শিখদের গ্রন্থ সাহিব-এ গুরু অমরদাস বহু সংখ্যক স্বরচিত স্তব সংযোজিত করিয়াছেন। দ্রঃ এ. রোজ. ই-আর-ই, ভল্যু ২।

স্থানগুলো বেঁধে দাও পরিষ্কার কাপড়ের বন্ধনী টুক্‌রো দিয়ে। তারপর আমি অবসর মতো নিজেই গিয়ে তাকে দেখে আসবো।”

নির্দেশ পালিত হইল। পরদিন গুরু অন্তরঙ্গ শিষ্যগণসহ প্রেমার কাছে গিয়া তাহাকে দর্শন দিলেন। করুণাভরা নয়নে কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিলেন। তারপর স্বহস্তে সযতনে তুলিয়া ফেলিলেন ঘায়ের বন্ধনী। কিন্তু কি আশ্চর্য! কুষ্ঠরোগের কোনো ক্ষত চিহ্নই ভিখারী প্রেমার দেহে নাই। ত্বকের বর্ণ একেবারে স্বাভাবিক এবং উজ্জ্বল।

কৃপা প্রাপ্তির আনন্দে প্রেমার চোখ-মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। গদ্‌গদস্বরে অমরদাসের প্রশস্তি গাহিয়া সে লুটাইয়া পড়ে তাঁহার চরণতলে।

শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া গুরু সহাস্যে কহিলেন, “আজ থেকে আমি এর নাম রাখলুম, মুরারী। নূতন দেহ, নূতন জীবন যে পেয়েছে, তাকে আর পুরানো নামে ডাকা কেন? এই নূতন নামেই সবাই তোমরা ওকে ডাকবে।”

গুরু অমরদাসের কাছ হইতে মুরারী অচিরে নামদীক্ষাও প্রাপ্ত হয়। অপার উৎসাহ ও নিষ্ঠা নিয়া সাধন-ভজন সে শুরু করে, গুরুসেবা ও শিখমণ্ডলীর সেবায় প্রাণপণে ক’রে আত্মনিয়োগ।

ইতিমধ্যে কিছুদিন গত হইয়া গিয়াছে, চরিত্রের মাধুর্যে ও কর্ম-দক্ষতায় মুরারী গুরু এবং প্রবীণ শিখদের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। সেদিন গুরু অন্তরঙ্গ শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মুরারী, চমৎকাররূপে গড়ে উঠছে। যেমনি প্রিয়দর্শন সে, তেমনি প্রিয়ব্রত। অচিরে সে আমাদের মণ্ডলীর এক স্তম্ভ হয়ে উঠবে।”

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি আবার কহিলেন, “মুরারীর এখন সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করা দরকার। কিন্তু সুপাত্রী কই? আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কেউ নেই যে, মুরারীর আগেকার রোগের কথা ভেবে তাকে কন্যা দান করতে ভীত হবে। অন্তত আমার মুখের দিকে চেয়ে কেউ এ কাজে পশ্চাদ্‌পদ হবে না।”

সিংহজী নামে এক বর্ষীয়ান্ শিখ তখনই করজোড়ে অমরদাসের কাছে আসিয়া দাঁড়ান। নিবেদন করেন, "গুরুজী, আমার একটি বয়স্কা কন্যা আছে। আপনি নিজের কৃপাবলে যে রোগীকে রোগমুক্ত ও সঞ্জীবিত করেছেন, তার হাতে সানন্দে আমি আমার কন্যাকে সঁপে দেবো।"

যথাসময়ে সাড়ম্বরে মুরারীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। পাত্রীর পিতা সিংহজী তাঁহার পত্নীর কাছে মুরারীর পূর্বতন রোগের ইতিহাস গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ইহা তিনি সবিস্তারে সব জানিতে পারেন এবং স্বামীর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চ স্বরে তাঁহাকে গালাগাল শুরু করিয়া দেন।

পাত্রীর জননী সেখানেই থামেন নাই। একদিন গুরুর কাছে আসিয়া উত্তেজিত স্বরে অনুযোগ দিতে থাকেন, "আমার স্বামীর কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। কোথাকার হাঘরে পাত্র, তার বাড়ি কোথায়, বাপ-মায়ের নাম কি তা জানা নেই, তার হাতেই সঁপে দিলেন আমার মেয়েটাকে!"

অমরদাস প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মুরারী আমারই ছেলে, আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি। আমিই তার বাপ মা, আত্মীয়স্বজন, একধারে সব কিছু। তোমার মেয়ের নাম মাথো, আর আমার ছেলের নাম মুরারী। তবে শুনে রাখো আমার কথা, মুরারী ও মাথোর নাম চিরদিন লোকে ভক্তিভরে স্মরণ করবে, বহু নরনারীকে তারা দু'জন দেখাবে ভগবান লাভের পরম পথ।"

মুরারী তখন লঙ্গরখানার কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। অমরদাস তখনি তাহাকে ডাকাইয়া আনেন দরবার প্রাঙ্গণে। তরুণ শিষ্যের শিরে নিজের অভয় হাতখানি রাখিয়া গুরু তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করেন, তারপর নির্দেশ দেন, "মুরারী, মুক্তিকামী মানুষকে নামমন্ত্র দানের চাপরাস তুমি আজ আমার কাছ থেকে পেলে। এবার তোমার স্বগ্রামে ফিরে যাও, সেখানে গিয়ে ব্রতী হও পুণ্যময় শিখধর্মের প্রচারকর্মে। বৎস, আমার শক্তি এখন থেকে কাজ করবে তোমার ভেতরে থেকে।"

উত্তরকালে এই মুরারী শিখ সম্প্রদায়ের এক প্রখ্যাত সাধক ও প্রচারক রূপে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

গুরুর যোগশক্তির ক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী। এই শক্তি শুধু কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই চৈতন্যোদয় ঘটাইত না, আশেপাশের সাধক ও সাধারণ নরনারীকেও করিত প্রভাবিত।

তালওয়ান্দিতে অমরদাসের এক পুরাতন ভক্ত বাস করিতেন, তাঁহার একটি পা ছিল একেবারে নিঃসাড় ও অকেজো। কোনোমতে একটি পা নিয়াই খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সে গোবিন্দোয়ালে উপস্থিত হইত এবং গুরুকে দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিত স্বগৃহে। গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে ডাকিত লঙড়া বলিয়া। শ্লেষের সুরে অনেকে বলিত, "তোর গুরুর এত শক্তি ও মাহাত্ম্যের কথা শুনতে পাই, অথচ তোর একটা পা তিনি আজ অবধি সারিয়ে তুলতে পারলেন না? তুইও তেমনি নির্লজ্জ, ঐ গুরুকে দর্শন করবার জন্য রোজ হিঁচড়ে হিঁচড়ে গোবিন্দোয়ালে যাস্। যে গুরু তোর খোঁড়া পা'টাই ভালো করতে পারেন না, স্বর্গের মতো দূরদেশে তোকে নিয়ে যাবেন কেমন ক'রে?"

উত্তরে লঙড়া শান্ত স্বরে বলিত, "খোঁড়া পা ভালো করবার জন্য কি আমি শিখধর্ম নিয়েছি? আর এই তুচ্ছ ব্যাপারে আমি গুরুকে কোনো প্রার্থনাও তো কখনো জানাই নি।"

একদিন গ্রামের চৌধুরীও অনেকের সঙ্গে জুটিয়া লঙড়াকে নানা ভাবে উৎপীড়ন করে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। লঙড়া সেদিন উত্তেজিত হইয়া উঠে, অমরদাসের দরবারে গিয়া জানায় তাঁহার দুঃখ দুর্দশার কাহিনী।

উত্তেজনায় গুরুর চোখ দুটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, শান্ত দৃঢ় স্বরে কহেন, "এবার তবে তোমার খঞ্জত্ব ঘোচাতেই হবে, দেখছি। তুমি এখনি বিপাশার তীরে চলে যাও। সেখানে এক বনের ভেতরে চুপচাপ ক'রে বসে থাকেন এক প্রাচীন ফকীর। নাম তাঁর হুসেনী শাহ্। বড় উগ্রমূর্তি এবং কর্কশভাষী। তুমি কিন্তু ভয় পেয়ো না

তাঁর কথাবার্তায় বা আচরণে। তাঁর কাছে গিয়ে তোমার নির্যাতনের কাহিনী বল এবং আরও বল, "গুরু বলেছেন—আমার এ খোঁড়া পা'টি নিরাময় ক'রে দিতে।"

লঙড়া এবার ফকীরের সম্মুখে ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হয়। সকলেই জানে, যে কেহ সম্মুখে আসিলেই ফকীর ক্ষিপ্তপ্রায় হয় এবং কদর্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে থাকে। কিন্তু তাহার দিকে তাকাইবার পর ফকীরের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সাহস পাইয়া লঙড়া তাঁহার সান্নিধ্যে বসিয়া সবিস্তারে জানাইতে থাকে দুঃখের কাহিনী। সব কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ফকীর হঠাৎ মারমুখী হইয়া উঠে, তারপরে চীৎকার করিয়া একটি মোটা লাঠি নিয়া তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া লঙড়া তাহার নিজের লাঠিটি ফেলিয়াই সেখান হইতে দৌড়িয়া পলায়।

কিছুটা পথ আসার পর সবিস্ময়ে সে থমকিয়া দাঁড়ায়। এ কি ? তাহার পা' তো আর খোঁড়া নয়! স্থির নিঃসাড় অঙ্গটি কোন্ ইন্দ্রজাল বলে একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর ধীরে ধীরে সে ফকীর হুসেনী শাহের কাছে ফিরিয়া আসে। কৃতজ্ঞতা জানাইতে থাকে বার বার।

ফকীর এবার শান্ত স্বরে বলিয়া উঠে, "ওরে, তোর জখম-হওয়া পা'টা তো তখনি ভালো হয়ে গিয়েছে যখন গুরু অমরদাস তোকে আসতে বলেছে আমার কাছে। এসব গুরুরই কাণ্ড। সে নিজে আড়ালে থেকে অনেক কিছু করবে, আর এই সব সিদ্ধাইর 'দুর্নাম' ফেলবে পাগ্‌লা হুসেনী শাহ্‌র ওপর। একটা কথা জেনে রাখবি, চারদিকে খোদার বহু সেবক রয়েছে আমার মতো, কিন্তু গুরু অমরদাসের মতো রয়েছে খুব কম সংখ্যক লোক।"

নিজের দিব্যদৃষ্টি দিয়া অমরদাস দেখিয়াছেন, জেঠা-ই—রামদাসই তাঁহার গদি ও নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী। যথাসময়ে নিজেই তিনি তাঁহার এই প্রিয় শিষ্যকে গদিতে বসাইয়া দিয়া যাইবেন, নানক

অঙ্গদের প্রিয় ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করিবেন তাহার শিরে।

সেই সঙ্গে গুরু একথাও উপলব্ধি করিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে গোবিন্দোয়ালে বাস করিয়া জেঠা তাঁহার এই গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, এজন্য চাই বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্র এবং ব্যাপকতর উদ্যোগ আয়োজন।

জেঠাকে ডাকিয়া একদিন কহিলেন, "বৎস, ইতিপূর্বে দিল্লীর সম্রাট কয়েকখানি গ্রাম হস্তান্তর করেছেন তোমার পত্নী—আমার কন্যা—বিবি ভানির নামে। সেখানে গিয়ে একটি উপযুক্ত স্থানে তুমি তোমার একটি নূতন ভবন নির্মাণ করো এবং তার চারিদিকে গড়ে তোল শিখ ভক্তদের একটি নূতন উপনিবেশ। জেনে রেখো, আমার অপ্রকটের পরে ঐ জনপদটিতেই তোমায় স্থায়ীভাবে বাস করতে হবে।"

একথা শুনিয়া পরম ভক্ত জেঠার দু' নয়ন অশ্রুসজল হইয়া উঠে। গুরুকে ছাড়িয়া অন্যত্র তাঁহাকে থাকিতে হইবে, যে গোবিন্দোয়ালের সর্বত্র গুরুর পুণ্য স্মৃতি জড়ানো তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, এ চিন্তা যে তাঁহার কাছে অসহনীয়।

স্মিত হাস্যে অমরদাস জানান তাঁহার আশ্বাস বাণী, "বৎস, তোমার ঐ বাসস্থান এবং সন্নিহিত অঞ্চলই একদিন হয়ে উঠবে শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তোমার ভবনের পূর্ব অঞ্চলে অগৌণে তুমি একটি পুণ্য-সরোবর খনন শুরু ক'রে দাও।"

গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করেন জেঠা। তাঁহার শ্রম ও তৎপরতার ফলে নির্মিত হয় একটি ক্ষুদ্র জনপদ ও পুষ্করিণী। এই কার্য ব্যপদেশে গুরুর পুণ্যসঙ্গ ছাড়িয়া প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে তাঁহাকে বাস করিতে হইতেছে, এজন্য মনে খেদের অন্ত নাই। সে-বার গোবিন্দোয়ালে ফিরিয়া গিয়া আরব্ধ কর্মের বিবরণ অমরদাসকে তিনি জানাইলেন। গুরু কহিলেন, "বৎস, যেখানে তুমি পুষ্করিণীটি খনন করেছ, তা রয়েছে দৃঢ় এবং উচ্চ ভূমিতে। এটি আর বেশী খনন

করার দরকার নেই, এ পর্যন্তই থাক্। আমার বরে এই পুষ্করিণী জাগ্রত হয়ে উঠেছে। শিখেরা ভক্তিভরে সেখানে স্নান করলে অশেষ পুণ্য অর্জন করবে। এই পুষ্করিণীর নাম দিলুম আমি 'সন্তোখ্ সর'।[১] যে কেউ এর জল স্পর্শ করলে, প্রাপ্ত হবে প্রকৃত সন্তোষ ও শান্তি।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গুরু কহিলেন, ঐ পুষ্করিণী থেকে আরও কিছুটা পূর্বে নিম্নভূমি রয়েছে। তার ভেতরে তুমি একটি সুবৃহৎ সরোবর খনন করো। আমার আশীর্বাদে উত্তরকালে ঐ সরোবর হয়ে উঠবে শিখ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আগে থেকে তার নামকরণও আমি ক'রে রাখলাম, তা অভিহিত হবে 'অমৃতসর' নামে।[২]

গুরু অমরদাস ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তাই নিজে বুঝিয়া নিয়াছেন, বিদায় লগ্নের আর বেশী দেরি নাই। এ সময়ে মাঝে মাঝেই তাঁহার মনে জাগিতেছে শিখধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের কথা। তাঁহার দেহান্তের পূর্বেই গুরুর গদিতে এমন একজন শিখ সাধককে বসাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যিনি ভক্ত শিষ্যদের সত্যকার দিক্‌দিশারী হইবেন, সুষ্ঠু নেতৃত্ব ও পরিচালনার মধ্য দিয়া শিখধর্মকে স্থাপন করিবেন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর।

মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য, সিদ্ধ সাধক জেঠাকে—রামদাসকে—অভিষিক্ত করিবেন গুরুর গদিতে।

অমরদাসের এই মনোভাব প্রবীণ ও অন্তরঙ্গ শিখদের অজানা নয়। কিন্তু তাঁহাদের কেউ কেউ এই মনোনয়নে তেমন সায় দিতে পারিতেছেন না। ভাবিতেছেন 'গুরু অমরদাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা দানীর বিবাহ হইয়াছে রামের সঙ্গে। রাম একজন নিষ্ঠাবান্ শিখ। লঙ্গরখানার কাজে, গুরুর এবং মণ্ডলীর সেবার কাজে, সর্বত্র সর্বসময়ে

---

১ সূরযপ্রকাশ, রাস ২, অধ্যায় ১১

২ গুরু অমরদাসের পরিকল্পিত অমৃত সরোবর এবং অমৃতসর শহরের খ্যাতি আজ শুধু সারা ভারতে নয়, সারা বিশ্বে প্রচারিত।

তিনি অংশ গ্রহণ করিতেছেন। বিশেষত গুরুর নির্মিত পুণ্যতোয়া বাওয়ালীর ব্যবস্থাপনা ও তীর্থযাত্রীদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে তাঁহার উপর। এদিকে জেঠাও বিবাহ করিয়াছেন গুরুর কনিষ্ঠা কন্যাকে। তাছাড়া, তিনি এক উন্নত স্তরের সাধক এবং গুরুর মণ্ডলীর এক বিশিষ্ট সেবক। তবু জেঠার চাইতে রাম বয়সে বড় এবং অধিকতর অভিজ্ঞ। গুরুর পদে তাঁহাকেই তো মনোনীত করা উচিত।'

এ ধরনের কিছু কিছু কথাবার্তা গুরুর কানে গেল। কোনো মন্তব্য না করিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, গুরু-গদির দুই প্রার্থীর পার্থক্যটি একবার সবাইকে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া দরকার।

ঘনিষ্ঠ সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়া গুরু অমরদাস হঠাৎ সেদিন পবিত্র বাওয়ালীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। রাম এবং জেঠা দু'জনকেই সেখানে ডাকিয়া আনা হইল। গুরু কহিলেন, "আমার মনে ইচ্ছে জেগেছে, এই বাওয়ালীর পাশে বসে প্রতিদিন আমি জপতপ করবো। এজন্য দুটো উঁচু পাকা মঞ্চ নির্মাণ করা প্রয়োজন। রাম তুমি একটি মঞ্চ তৈরি করো, তাতে সকালবেলায় আমি আসন পাতবো। আর জেঠা, তুমি নির্মাণ করো অপরটি, তা আমি ব্যবহার করবো সন্ধ্যা-বেলায়।"

দুই শিষ্যই মহা উৎসাহে আদিষ্ট কাজে ব্রতী হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

গুরু সেদিন বাওয়ালীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। রামের তৈরি মঞ্চটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভিনিবেশ সহকারে দর্শন করিলেন। তারপর কহিলেন, "রাম এটার জন্য তুমি খুবই পরিশ্রম করেছ, সন্দেহ নেই। কিন্তু, কি জানো, মঞ্চটি আমার তেমন মনঃপূত হয় নি। এটি ভেঙে ফেলে দিয়ে আর একটি নূতন মঞ্চ তুমি বানাও।"

আবার সোৎসাহে নির্মাণ-কর্মে লাগিয়া যান রাম। অচিরে সেটি সমাপ্ত হয় এবং গুরুকে ডাকিয়া আনিয়া দেখান। এবারও

অমরদাসের পছন্দমতো কাজ হয় নাই। নির্দেশ দিলেন, "এ দিয়ে আমার কাজ হবে না, বরং আর একবার নূতন ক'রে একটি মঞ্চ তুমি তৈরি করো।"

দুই দুই বারই গভীর নিষ্ঠা ও সতর্কতার সহিত রাম তাঁহার নির্মাণ-কার্য সমাধা করিয়াছেন, কিন্তু নিতান্ত অযৌক্তিকভাবেই গুরুজী ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ শিখদের কাছে বিরক্তির সুরে রাম কহিলেন, "গুরুজী অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আর তাঁর নেই।"

গুরুর কানে একথা পৌঁছিল। এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য না করিয়া তিনি শুধু একটু মুচকি হাসি হাসিলেন।

জেঠার মঞ্চ পরীক্ষা করার পরও প্রকাশিত হইল গুরুর একই মনোভাব। নানা খুঁটিনাটি ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া তিনি কহিলেন, "এ দিয়ে আমার কাজ চলবে না, জেঠা। সবটা গুঁড়িয়ে ফেলে, আবার তুমি নির্মাণ করো নূতন মঞ্চ। তাতে এবার যেন কোনো রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে।"

অম্লান বদনে জেঠা তখনি সেটি ভাঙিয়া ফেলেন, অধিকতর সতর্কতার সহিত আবার গাঁথিয়া তোলেন নূতন মঞ্চ।

এটি পরিদর্শন করিতে আসিয়া অমরদাস কঠোর স্বরে বলেন, "কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার জেঠা। এ দিয়ে আমার কোনো কাজই চলবে না। ভেঙে ফেলে দাও সবটা, সত্যিকার নিষ্ঠা ও মনোযোগ দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ক'রে তোল।"

জেঠার অন্তরে নেই কোনো খেদ ও বিরক্তি। প্রতিবারই গুরুর তিরস্কার ও বাতিল করণের নির্দেশ প্রাপ্তির পরই তিনি বলিয়া উঠেন, "গুরুজী, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন, এটি বাতিল হবারই যোগ্য। আমি আবার এটি তৈরি করছি।" সেই সঙ্গে তৎক্ষণাৎ মঞ্চটি পুনরায় নির্মাণের জন্য তৎপর হইয়া উঠেন।

গুরুর নির্দেশের বিরুদ্ধে কেউ কোনো নিন্দা সমালোচনা করিলে জেঠা বলেন, "আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বিচার বুদ্ধি নিয়ে

গুরুর বুদ্ধির বিচার কি ক'রে করা সম্ভব ? গুরু সিদ্ধপুরুষ। তৃতীয় নেত্রের, জ্ঞান নেত্রের, অধিকারী তিনি। আমাদের তুলনায় অনেক বেশী কল্যাণ উৎসারিত হয় তা থেকে। তিনি যা করছেন, আমার প্রতি গভীর ভালবাসার বশেই তা করছেন, আমার প্রকৃত কল্যাণই যে তাঁর অভিপ্রেত।"

বাওয়ালীর পাশে দাঁড়াইয়া প্রবীণ শিখদের সহ অমরদাস সেদিন জেঠার অষ্টমবারের নির্মিত মঞ্চটি পরিদর্শন করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠে দিব্য আনন্দের আভা। স্নিগ্ধ মধুর স্বরে বলেন, "জেঠা, সাতবার তোমার এই আয়াসসাধ্য মঞ্চ আমি ভেঙে দিতে বলেছি, সাতবারই বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য না দেখিয়ে, অম্লান বদনে, তা তুমি ভেঙে দিয়েছো। বার বার কত কষ্ট ক'রে এটিকে নির্মাণ করেছো। বৎস, আমার পরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ।"

এবার পাশে দণ্ডায়মান ভক্ত শিষ্যদের দিকে তাকাইয়া সহর্ষে কহিলেন, "আশাকরি ইতিমধ্যে তোমরা উপলব্ধি করেছো, জেঠার গুরুভক্তি কতটা গভীর ও একনিষ্ঠ, তার আত্মোৎসর্গ কি সুমহান্, আর তার ধৈর্য ও সহনশীলতা কি অপরিসীম। হ্যাঁ, এমনি শিখ সাধকের হাতেই আমি সঁপে দিয়ে যেতে চাই শিখমণ্ডলীর নেতৃত্ব।"

কিছুদিন পরের কথা। শত শত ভক্ত শিখ পরিবৃত হইয়া অমরদাস তাঁহার ধর্ম-দরবারে বসিয়া আছেন। একের পর এক চলিতেছে ভজন সংগীত ও ধর্ম-উপদেশনা। এ সময়ে গুরু সবাইকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ এখানে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করবো, যা শিখ সমাজের পক্ষে হবে পরম কল্যাণকর।"

পাশে দণ্ডায়মান ভাই বাল্লুকে এবার আদেশ দিলেন অমরদাস, "আজকের এই পুণ্যদিনে আমাদের প্রিয় জেঠাকে—রামদাসকে—উপবেশন করানো হবে গুরুর গদিতে। তার মতো পবিত্র ও আত্মনিবেদিত সাধক কেউ নেই। আমার স্থলে শিখধর্ম ও শিখ-মণ্ডলীর নায়কত্ব সে আজ গ্রহণ করবে। গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ এবং আমার এই গদির মর্যাদা সে কৃতিত্বের সঙ্গে রক্ষা করতে পারবে

বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। একটি নারিকেল ও পাঁচটি মুদ্রা তুমি এখানে নিয়ে এসো। সর্বজনের সমর্থন ও কল্যাণ কামনা সহ এই পবিত্র অনুষ্ঠানটি আমি এখানে সম্পন্ন করতে চাই।"

ভাই-বুধা এবং অন্যান্য প্রবীণ শিখেরা সানন্দে অমরদাসের এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে রামদাসের গদি আরোহণ পর্ব সমাপ্ত হইয়া গেল। দরবার-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল শিখদের আনন্দ উল্লাস এবং ওয়াহ্‌গুরু ধ্বনিতে।

অতঃপর অমরদাস একদিন তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত শিষ্যদের নিকটে আহ্বান করিলেন। কহিলেন, "এ দেহটি বেশ প্রাচীন হয়েছে, আর আমার যাত্রার সময়ও এসে গিয়েছে। দ্বাদশ মাঞ্জার উদাসী শিখ এবং সংসারাশ্রমী শিখেদের অনেকেই এখানে রয়েছো।[১] তোমরা আমার ভাই এবং বন্ধু, তোমরা সবাই এবার আমায় বিদায় দাও। শ্রীভগবানের আহ্বান এসেছে। তাঁর কাছে যেতে হবে, তাই আমার আনন্দের আজ অবধি নেই।"

ভক্ত শিষ্যদের অশ্রু সজল চক্ষের দিকে চাহিয়া অমরদাস কহিলেন, "এ বিদায় তৃপ্তির বিদায়, পরম প্রভুর মিলনানন্দের জন্য বিদায়। আমার দেহান্তের পর কোনো শিখ যেন একফোঁটা অশ্রু বিসর্জন না করে, এই আমার অনুরোধ। ভগবানের নামজপ করবে, তার গান গাইবে, আর তাঁর শব্দের জন্য—তাঁর অনাহত নাদের জন্য—থাকবে সদা উৎকর্ণ হয়ে। তোমাদের কাছে রইল এই আমার শেষ বাণী।"

অস্ফুটস্বরে জপজীর পুণ্যময় স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে সিদ্ধপুরুষ অমরদাস ত্যাগ করিলেন তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস। গোবিন্দোয়ালের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া উঠিল অগণিত শিখ নরনারীর উচ্ছ্বাসময় ধ্বনি—ওয়াহ্‌গুরু, সৎ-গুরু, সৎ-নাম!

---

১. সাধন-ঐশ্বর্যের সঙ্গে গুরু অমরদাসের জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিল অসামান্য সংগঠনশক্তি। ত্যাগী উদাসী শিখ এবং ভক্ত সংসারী শিখ, এই দুই দলকেই তিনি পৃথকভাবে সুসংগঠিত করিয়া গিয়াছেন। দ্রঃ খাজান সিং: ফিলজফিক হিস্ট্রী অব দ্য শিখ রিলিজিয়ন।

রায় রামানন্দ

পূর্বভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে, গৌড়ীয় প্রেমধর্মের ইতিহাসে রায় রামানন্দ একটি অবিস্মরণীয় নাম। ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে, প্রাক্-চৈতন্য যুগে, উড়িষ্যায় কৃষ্ণ-উপাসনার যে ধারাটি প্রবর্তিত ছিল, তিনি ছিলেন তাহারই এক ধারক বাহক। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীয় আন্দোলনের পর্যাপ্ত প্রভাব পড়িয়াছিল রায় রামানন্দের জীবনে। তাছাড়া, ভাগবতের কৃষ্ণলীলা ও গোপী-ভজনের মরমী ব্যাখ্যাতা ছিলেন এই বৈষ্ণব পুরুষ। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের প্রেম সাধনার মধুর রসও রামানন্দ পান করিয়াছিলেন আকণ্ঠ পুরিয়া, তাঁহার রচিত জগন্নাথ বল্লভ নাটক ও প্রেমভক্তিময় সংগীতে উৎসারিত হইয়াছিল এই পরম রস।

কিন্তু এহ বাহ্য। রায় রামানন্দের সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়—তিনি প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ, তাঁহার নিগূঢ় ব্রজরস সাধনার অনন্য প্রবক্তা। বৈষ্ণবীয় সাধনার যে শতদলটি নিজ জীবনে রায় রামানন্দ একান্তে ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছিল, রঙে রসে সৌগন্ধে পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যেরই দিব্য করুণার আলোক-সম্পাতে।

আনুমানিক ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা রাজ্যে রায় রামানন্দের জন্ম হয়। পিতা ভবানন্দ রায় ছিলেন উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র গজপতির অন্যতম বিশ্বস্ত সচিব এবং দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের শাসন-কর্তা। জাতিতে তিনি কায়স্থ, কুলপদবী—পট্টনায়ক। দক্ষ প্রশাসক বলিয়া ভবানন্দের যেমন খ্যাতি ছিল, তেমনি তিনি ছিলেন সংস্কৃতি-বান্ এবং ধর্মপরায়ণ, দক্ষিণ-ভারত এবং উড়িষ্যার প্রখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যদের অনেকেরই সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। ভবানন্দের পুত্রসংখ্যা পাঁচ, ইঁহাদের মধ্যে রায় রামানন্দ ছিলেন মধ্যম পুত্র।

পিতার কর্মকুশলতা এবং ধর্মসংস্কৃতির সংস্কার দুই-ই সঞ্চারিত হইয়াছিল তাঁহার জীবনে।

অল্পবয়সে গজপতি সরকারের অধীনে রায় রামানন্দ কর্ম গ্রহণ করেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের গুণে রাজা প্রতাপরুদ্রের অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন, ফলে উত্তরকালে উন্নীত হন রাজমহেন্দ্রীর শাসনকর্তার পদে।

তখনকার দিনে রাজমহেন্দ্রী ছিল উৎকলের এক প্রান্তীয় প্রদেশ। অদূরেই শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা। বিজয়নগর, বিজাপুর ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে এ সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। বিশেষ করিয়া বিজয়নগরের প্রতাপশালী রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সেনাবাহিনীর কাছে উড়িষ্যাধীপ প্রতাপরুদ্রকে একাধিকবার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইয়াছিল।[১] এই সঙ্কটময় কালে এবং এই সমস্যা জর্জরিত ও বিপজ্জনক ভূখণ্ডে রাজা প্রতাপরুদ্র নিয়োগ করিতে চাহেন একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ এবং বন্ধুস্থানীয়, বিশ্বস্ত ও কর্মকুশল শাসককে। প্রবীণ সচিব রায় রামানন্দের মধ্যে এই গুণগুলি লক্ষ্য করিয়াছেন উড়িষ্যারাজ, তাই রাজমহেন্দ্রীতে তাঁহাকেই রাখিয়া দিয়াছেন নিজের প্রতিনিধি রূপে।

রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে শাসনকর্তা রামানন্দকে স্বভাবতই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার অন্তর্জীবন ছিল প্রশান্তি ও প্রেমভক্তিতে সদা পরিপূর্ণ। আড়বারদের প্রেমরসাশ্রিত সাধনা এবং ভাগবতে বর্ণিত গোপীপ্রেমের সাধনা ছিল তাঁহার আত্মিক জীবনের আদর্শ। এই আদর্শের রূপায়ণে তাঁহাকে সদা তৎপর থাকিতে দেখা যাইত।

উড়িষ্যার বিশিষ্ট সাধক, আচার্য ও দার্শনিকদের কাছে প্রেমিক সাধক রামানন্দের এই পরিচয়টি অজানা ছিল না। ভারত বিশ্রুত

১. কে. এন. শাস্ত্রী অ্যাণ্ড এন. বেঙ্কটরমনাইয়া: ফারদার সোর্সেস্; পি. মুখার্জি: গজপতি কিংস।

বাঙালী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম তখন উড়িষ্যার রাজপণ্ডিত, এই সার্বভৌম বেদান্ত ও ন্যায়ের দুর্ধর্ষ পণ্ডিত হইলেও রায় রামানন্দের তত্ত্ব জানিতেন, তাঁহার প্রেমভক্তির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতেন। তাই দেখি, পুরীধামে প্রেমভক্তির জোয়ার বহাইয়া দিয়া, বাসুদেব সার্বভৌমকে আত্মসাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্য যখন দাক্ষিণাত্যে পরিব্রাজনে অগ্রসর হইতেছেন, সার্বভৌম তখন ব্যাকুলভাবে অনুরোধ জানাইতেছেন রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাতের জন্য। শ্রীচৈতন্যকে কহিতেছেন,

"প্রভু, গোদাবরীর তীরে, রাজমহেন্দ্রীর বিদ্যানগরে রাম রায় রয়েছেন। অব্রাহ্মণ ও বিষয়ী বলে তাঁকে যেন তাচ্ছিল্য ক'রো না। তাঁর মতো রসিক ভক্ত পৃথিবীতে আর নেই। পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসের তিনি মূর্ত বিগ্রহ। তাঁর মাহাত্ম্য আমি আগে বুঝতে পারি নি, এবার তোমার কৃপায় কিছুটা বুঝেছি। তাঁর সঙ্গে অবশ্য তুমি আলাপ পরিচয় ক'রে আসবে।"

শ্রীচৈতন্য কথা দিলেন, রায় রামানন্দের সহিত অবশ্যই তিনি সাক্ষাৎ করিবেন।

পুণ্যতোয়া গোদাবরীতে স্নান সারিয়া প্রভু কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেছেন, এমন সময়ে-দোলায় চড়িয়া রামানন্দ সেখানে উপস্থিত। সঙ্গে রহিয়াছে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ, রক্ষী, পরিচারক ও বাদ্যকর। জাঁকজমকের ঘটা দেখিয়া চৈতন্য বুঝিলেন, ইনিই প্রদেশের শাসনকর্তা রামানন্দ। পরিচয় সাধনের জন্য অন্তর তাঁহার অতিমাত্রায় ব্যাকুল। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই ধৈর্য ধরিলেন। একান্তে রহিলেন উপবিষ্ট।

গৌরকান্তি দিব্যদর্শন কে এই সন্ন্যাসী? পরিচয় সাধনের জন্য রামানন্দ নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন। ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়ের এই ঐতিহাসিক সাক্ষাতের এক মনোজ্ঞ চিত্র আঁকিয়াছেন:

সূর্য শত সম কান্তি অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন॥

দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার॥
উঠি প্রভু কহে উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ॥
তথাপি পুছিল তুমি রায় রামানন্দ।
তেঁহ কহে সেই হঙ দাস শূদ্র মন্দ॥
তবে প্রভু কৈল তারে দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু ভৃত্য দোঁহে অচেতন॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূতলে পড়িলা॥
স্তম্ভ স্বেদ অশ্রু কম্প পুলক বৈবর্ণ।
দোঁহার সুখেতে শুনি গদ্‌গদ কৃষ্ণবর্ণ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার॥
এইত সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির॥
এই মত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ॥

কিছুটা সুস্থ হইয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য কহিলেন, "এখানে আসার সময় পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম বলে দিয়েছিলেন, তোমার সঙ্গে একবার অবশ্যই যেন মিলিত হই। ভালোই হলো, এখানে বসেই অতি সহজে তোমার দর্শন পেলাম।"

করজোড়ে উত্তর দেন রামানন্দ, "সার্বভৌম বড় কৃপালু, আমায় তিনি ভৃত্য বলে জ্ঞান করেন। সর্বদা আমার কল্যাণ তিনি চান। তাই তো আপনার দর্শন আজ পেলাম। তাছাড়া, আমি বুঝেছি, সার্বভৌমের প্রতিও আপনার কৃপা কম নয়। নইলে তাঁর অনুরোধে

আমার মতো নগণ্য অস্পৃশ্য একটা মানুষকে আপনি স্পর্শ করবেন কেন ? আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আর আমি হচ্ছি রাজসেবী, বিষয়ী ও শূদ্রাধম—উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিপুল ব্যবধান। আর কি আশ্চর্য কাণ্ড, আমার সঙ্গী শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণেরা সবাই আপনাকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরসে রসায়িত হয়ে উঠেছেন, আনন্দাশ্রু ঝরছে তাঁদের নয়ন থেকে, মুখে উচ্চারণ করছেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আপনি ঈশ্বর স্বরূপ, তাই তো আপনাকে দর্শনের পরই তাঁরা ভাবাবেগে এমন উদ্বেল হয়ে উঠেছে।"

প্রভুও রামানন্দের গুণ গাহিতে কম উৎসাহী নন। বলেন, "তুমি যে একজন পরম ভাগবত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অপর লোক তো দূরের কথা, আমার মতো শুষ্ক সন্ন্যাসীর মনও তোমার সংস্পর্শে এসে গলে গিয়েছে, কৃষ্ণপ্রেমে আমি ভাস্‌ছি। সার্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত, যাতে আমার হৃদয়ের শোধন হয়, সে জন্যই তোমার কাছে আমায় পাঠিয়েছেন।"

উভয়ে উভয়ের প্রশস্তি গাহিতেছেন, এমন সময়ে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্যকে ভিক্ষা গ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাইলেন। স্থির হইল, মধ্যাহ্নে প্রভু তাঁহার কুটিরেই ভোজন করিবেন, এবং রাম রায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন সন্ধ্যার পর।

উভয়ের মিলনে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গেল। প্রভু কহিলেন, "রাম রায়, সাধনভজনের ফলে সাধকেরা যে পরমবস্তু প্রাপ্ত হয়, সেই সাধ্য সম্পর্কে আমায় কিছু বল।"

রামানন্দ রায় উত্তর দেন,-"বর্ণাশ্রমচারীরা পরমপুরুষ বিষ্ণুকে আরাধনা করেন তাঁদের নিজ নিজ শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী, এ ছাড়া তাঁকে তুষ্ট করার অন্য উপায় নেই।"

প্রভু বলেন, "এটা বাইরেকার কথা, রাম রায়। ভেতরকার তত্ত্ব কিছু বল।"

রামানন্দ এবার বলেন কৃষ্ণে কর্ম অর্পণের কথা।

প্রভু একথায় মোটেই সন্তুষ্ট নন, কহেন, "আরো গভীরে যাও রাম রায়।"

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবানের চরণে শরণ নিবার কথা বলেন রামানন্দ।

শ্রীচৈতন্যের মতে,—ইহাও বাহ্য কথা, আরও গভীরতর সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয় করা হোক, ইহাই তিনি চান। অতঃপর জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির কথা উল্লেখ করেন রায় রামানন্দ।

প্রভুর মতে, ইহা উত্তমা ভক্তি নয়, কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলিতে বুঝা যায় অভেদাত্মক ব্রহ্মানুভব রূপ জ্ঞান। ভগবৎতত্ত্বের রসমধুর অনুভূতি যেখানে নাই, সেখানে ভক্তি কোথায়?

রাম রায় এবার জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা তোলেন। এ ভক্তিতে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তাই শ্রীচৈতন্য আংশিকভাবে এই সাধ্য-তত্ত্ব মানিয়া নিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসা তো একথায় নাই। তাই আরো অগ্রসর হওয়ার কথা তিনি বলিলেন।

রামানন্দ এবার উপস্থাপিত করেন দাস্যপ্রেমের তত্ত্ব। ভাবময় ভক্তি ইহাতে আছে সত্য, কিন্তু ইষ্টের ঐশ্বর্যদর্শনে সাধকের সেবাসুখে সঙ্কোচ বা ভয় কখনো কখনো আসিয়া পড়ে। তাই ইহাও প্রভু শ্রীচৈতন্যের মনোমতো নয়—কহিলেন, "ইহার কিছুটা গ্রহণীয় বটে, কিন্তু তুমি আরো গভীরে তলিয়ে ছাখো।"

অতঃপর উঠে সখ্যপ্রেমের কথা। এ প্রেম বিশুদ্ধ, ইহাতে ভয়-সঙ্কোচের বালাই নাই। তাই প্রভু বলিলেন, "ইহা উত্তম," অর্থাৎ, দাস্যপ্রেমের উপরে ইহাকে স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু আরো গভীরতর সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয়ে তিনি অভিলাষী।

রামানন্দ রায় এবার বলেন, "কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্য সার।"

এই প্রেম মধুর রসাশ্রিত, ইহা কৃষ্ণেরই সুখের জন্য, কৃষ্ণেরই সম্ভোগের জন্য নিবেদিত। ইহাতে রহিয়াছে পাঁচটি গুণ—কৃষ্ণনিষ্ঠা, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণে অসঙ্কোচ ভাব, কৃষ্ণে প্রগাঢ় মমতা এবং কান্তার নিজাঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণের সেবন।

এই উত্তরে শ্রীচৈতন্য প্রসন্ন হইয়া উঠেন, বলেন, "এ প্রেমকে অবশ্যই সাধ্যবস্তুর সীমারূপে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু রাম রায়, কৃপা ক'রে আমায় তুমি আরো ভিতরকার তত্ত্ব বল, আমি প্রাণ ভরে তা শুনি।"

নিগূঢ় প্রেমরসের তাত্ত্বিক রায় রামানন্দের বিস্ময় এবার চরমে উঠিয়াছে। তিনি কহেন, "প্রভু এই প্রেমের আরো গভীরতর স্তরের কথা জানিতে চায়, এমন ব্যক্তি তো এই পৃথিবীতে নেই। হ্যাঁ, যদি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়, তবে বলবো,—এই কান্তা-প্রেমের সংবাহিকা গোপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন শ্রীরাধা, এবং রাধাপ্রেমই হচ্ছে সাধ্য শিরোমণি।"

প্রভু কহিলেন, "রাম রায়, আহা! তোমার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে অমৃত ধারা, রাধাপ্রেমের পরমতত্ত্ব শুনিয়ে তুমি আজ আমায় কিনে নাও।"

রাম রায় গদ্‌গদ স্বরে বর্ণনা করেন রাধা প্রেমের তত্ত্ব, "রাধা-প্রেমের তুলনা কোথায়? রাসস্থলীতে শত শত গোপীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করছেন, শ্রীরাধা দেখলেন, অন্যান্য গোপীদের পাশে দাঁড়িয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণ লীলাবিলাস করছেন, তেমনি রয়েছেন তাঁরও পাশে, তবে সাধারণ গোপীদের তুলনায় রাধার বিশেষত্ব কি রইল? রাধা মান করলেন, তাঁর প্রেম কুটিল পথে গিয়ে বামভাব প্রাপ্ত হলো। রাসস্থলী ত্যাগ ক'রে, কৃষ্ণকে ত্যাগ ক'রে, তিনি আত্মগোপন করলেন বনের অভ্যন্তরে। এদিকে রাধাকে অন্তর্হিতা দেখে কৃষ্ণ মহা ব্যাকুল। সমগ্র রাসলীলা যে রাধার যোগসূত্রে এবং রাধারই নিগড়ে বাঁধা, তিনি না থাকলে শত শত গোপীর সঙ্গ কৃষ্ণের লীলা-বিলাসের তৃষ্ণা মেটাতে পারে না। তাই তো রাধার বিরহে নিখিল-পতি কৃষ্ণ হাহাকার ক'রে বেড়ান। এখানেই রাধাপ্রেমের রমণীয়তা আর প্রগাঢ়তা।"

প্রভু শ্রীচৈতন্যের আনন্দের আর অবধি নাই, প্রেমপূর্ণ স্বরে বলেন, "রাম রায়, আহা, কি অমৃতের আস্বাদনই আজ তোমার কথায়

পেলাম। এবার কৃপা ক'রে আমায় বল তো কৃষ্ণের স্বরূপ কি, রাধার স্বরূপই বা কি?"

রায় বলেন, "প্রভু এ প্রশ্ন ক'রে তুমি শুধু আমার অপরাধ বাড়াচ্ছো। এ সব রসতত্ত্বের আমি কি জানি? তোমার প্রেরণা আমার হৃদয়কে করেছে উদ্দীপিত, তোমার বাণী আমার জিহ্বাকে করেছে মুখর। তাই তো তোমার শেখানো কথাই শুকপাখির মতো আমি কেবলই বলে যাচ্ছি। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তোমার এ লীলা-খেলার মর্ম কে বুঝবে?"

প্রভু দৈন্য ও বিনয়ের অবতার। স্নিগ্ধ স্বরে বলেন, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ, প্রেমভক্তির সুধারস আমার ভেতরে কই? পুরীধামে সার্বভৌমের সঙ্গ কিছুদিন করেছিলাম, তাতে মন কিছুটা নির্মল হয়েছে। তাঁকে কৃষ্ণভক্তির কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি এ তত্ত্বের কিছুই জানিনে, জানেন রামানন্দ রায়, তাঁর কাছে তুমি যাও।' তাই তো তোমার কাছে এখানে ছুটে এলাম। এখন দেখছি, তুমি আমার সন্ন্যাসবেশ দেখে আমার স্তুতি শুরু ক'রে দিয়েছো। রাম রায়, আমি তো এই বুঝি—ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী বা শূদ্রের বর্ণ বিচার অবান্তর, আসল কথা হচ্ছে, কৃষ্ণতত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই গুরুর আসনে বসার অধিকারী, প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা তিনিই শুধু দিতে পারেন। তুমি আমার প্রাণের তৃষ্ণা মেটাও রাম রায়।"

রামানন্দ করজোড়ে বলেন, "প্রভু আমি নট বটে, কিন্তু তুমি তার সূত্রধর। নেপথ্যে থেকে তুমিই আমায় তোমার ইচ্ছেমতো কথা বলাচ্ছো, আর নাচাচ্ছো।"

প্রভুর দিব্য প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন রায় রামানন্দ :

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
সর্ব অবতারী সর্ব কারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহা সবার আধার॥

সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র নন্দন
সর্বৈশ্বর্য সর্বশক্তি সর্বরসপূর্ণ ॥
বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কামগায়ত্রী' 'কামবীজে' যার উপাসন ॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥
নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেইসব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয় ॥
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্তিধর।
অতএব আত্মা পর্যন্ত সর্বচিত্তহর ॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥
আপন মাধুর্য হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥
(চৈ-চরিতামৃত)

কৃষ্ণ-স্বরূপের এই অপূর্ব বর্ণনা শুনিয়া প্রভু আনন্দে উদ্বেল। দু' হাত প্রসারিয়া আলিঙ্গন দেন রামানন্দ রায়কে। আবেগ ভরা স্বরে বলেন, "আহা! আমার কৃষ্ণের কি করুণা, তোমার মতো মহাভাগবতের মুখ দিয়ে আমায় শোনাচ্ছেন তাঁর পরম মাহাত্ম্য। রাম রায়, এবার কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি মহাভাবময়ী শ্রীরাধার কথা বলে আমার প্রাণ জুড়াও।"

রামানন্দের এই তত্ত্ব বর্ণনা ভক্ত সাধক কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে অমর হইয়া আছে:

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
চিচ্ছক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি নাম ॥
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থা কহি যারে।
অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সভার উপরে ॥

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার।
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য যার॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহ রূপ॥

(চৈ-চরিতামৃত)

প্রভু শ্রীচৈতন্যের সুগৌর তনু ভাবাবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, সারা দেহে আনন্দ রোমাঞ্চ, দুই নয়নে বহিতেছে আনন্দ-লোর। কৃষ্ণ-রাধার স্বরূপ-তত্ত্ব শুনিয়া এখনো তাঁহার আশ মিটে নাই। স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে কহিতেছেন, "রাম রায়, মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেম যে সাধ্য শিরোমণি তা তোমার মুখে শুনে কৃতার্থ হয়েছি, কিন্তু তোমার মতো মহাভাগবতের কাছে যে আমার আরও দাবি রয়েছে। তার পরেও আর এগিয়ে গিয়ে ব'ল।"

"পরবর্তী স্তরের কথা শুনে কি তুমি আনন্দ পাবে প্রভু?—সাধকের বোধিতে এর পরে আর যে কিছু ধরা দেয় না। এর পর আসে

প্রেমলীলার চরম অবস্থা—প্রেমক্রীড়ায় তখন আর রমণ ও রমণীর ভেদজ্ঞান নেই, নেই কোনো দ্বৈতসত্তা—সবই সেখানে অভেদ এবং একাকার।"

সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দ রায় গাহিয়া উঠেন তাঁহার স্বরচিত রাধা-কৃষ্ণের সুমধুর মিলন সংগীত যাহা দ্বৈতসত্তাকে মিলাইয়া দিয়াছে অদ্বৈতসত্তায় :—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সো সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥

প্রিয়া ও প্রিয়, মিলন ও বিরহ সবকিছু একাকার হইয়া গেলে লীলা অনুধ্যানরত বৈষ্ণব সাধকের কাছে লীলার চমকারিত্ব আর কি করিয়া থাকে? মাধুর্যময় ভগবান শ্রীগোবিন্দ আর মহাভাবময়ী শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভ আর প্রেম-মিলনের আনন্দ চাঞ্চল্যই বা কোথায় থাকে? প্রভু তাই তাড়াতাড়ি রামানন্দ রায়ের মুখটি চাপিয়া ধরিলেন, অর্থাৎ, "আর এগিও না রাম রায়, এর পর লীলাবিলাসের বৈচিত্রী থাকে না, থাকেন না রাধাগোবিন্দও।"

সাধ্যবস্তু—সাধনা দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায়—তাহার তত্ত্ব নির্ণয় তো হইল। এবার প্রভু রাম রায়ের মুখ দিয়া সাধনপন্থার কথাটি বলাইয়া নিতে চান। বিনয় করিয়া কহেন, "রায়, তোমার কাছ থেকে সাধ্যবস্তুর চরম সীমা তো জানা গেল। এবার ব'ল, কি ক'রে কোন্ সাধনপন্থার মাধ্যমে সেখানে পৌঁছা যায়।"

করজোড়ে রামানন্দ নিবেদন করেন, "প্রভু, আমার কি সাধ্য আছে যে, এত সব নিগূঢ় তত্ত্ব আমি উদ্‌ঘাটন করি? তোমার লীলা বুঝা দায়। আমাকে দিয়ে তুমিই বলছো এসব কথা, আবার নিজেই

সেজে বসেছো শ্রোতারূপে।” অতঃপর বৈষ্ণবীয় সাধনের নিগূঢ় পদ্ধতিটি ভাঙিয়া বলেন রামানন্দ :

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর॥
সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার॥
সখী-বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখী-লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়॥
সখী-বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখী-ভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

.. ...

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিনে চিন্তে রাধা-কৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাঁহাই সেবন।
সখী-ভাবে পায় রাধা-কৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য-জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিয়া ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥

বক্তা ও শ্রোতা দুই জনেই তখন কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর, বিহ্বল। একে অপরকে বার বার আলিঙ্গন করিতেছেন, আর প্রশস্তি জ্ঞাপন করিতেছেন।

ভাবপ্রমত্ত অবস্থায় উভয়ে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

প্রভুর পুণ্যসঙ্গের লোভ রাম রায় ছাড়িতে পারিতেছেন না। কাতরকণ্ঠে কহিলেন, “প্রভু, যদি নিজে যেচে আমায় কৃপা করতে এসেছো, তবে এখানে দিন দশেক থেকে যাও? আমার দুষ্ট মনকে

শোধন ক'রে দাও তুমি। আমি বুঝতে পেরেছি, জীবকে উদ্ধার করতে, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করতেই, তুমি আবির্ভূত।"

উত্তরে প্রভু বলেন, "রাম রায়, তা নয়। আমি এসেছি তোমার গুণের কথা শুনে। কৃষ্ণকথা শুনে নিজেকে পবিত্র করতে এসেছি আমি। তোমার মহিমা সম্পর্কে যা আমি শুনেছিলাম, তা যথার্থ। তুমি সত্য সত্যই কৃষ্ণপ্রেমরসের সীমা। দশদিনের কথা কি বলছো, সারা জীবনে আমি তোমার পুণ্য সঙ্গ ছাড়তে পারবো না। তুমি নীলাচলে এসো, আমরা একসঙ্গে সেখানে থাকবো, কৃষ্ণকথার সুধা পান ক'রে দিন কাটাবো পরমানন্দে।"

রামানন্দ রায় বার বার বলিয়াছেন, প্রভু তাঁহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উদ্দীপনা দিয়াছেন, কণ্ঠে বসিয়া যোগাইয়াছেন নিগূঢ় লীলাতত্ত্ব। তাঁহার একথা শুধু বিনয়ের কথা নয়, বৈষ্ণবীয় দৈন্যের কথা নয়—প্রভুর কৃপায় তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন রামানন্দ। সে দর্শন তাঁহার জীবনকে করিয়াছে মধুময়, আলোকময়। সেদিন স্পষ্ট ভাষায় প্রভুকে বলিলেন তাঁহার এই দর্শনের কথা, "তোমার গৌরকান্তি দেহে শ্যামল কিশোর কৃষ্ণের রূপ যে আমি ফুটে উঠতে দেখেছি, প্রভু। তাছাড়া আরও দেখেছি, পরম মনোহর মুরলীবাদন রত ত্রিভঙ্গ মূর্তি।"

প্রভু হাসিয়া উড়াইয়া দেন সে কথা। "রায় তার আসল কথাটা কি জানো, যাঁরা প্রেমিক-সাধক, মহাভাগবত, তাঁরা যে স্থাবর জঙ্গম সব কিছুরই মধ্যে দর্শন করেন তাঁদের ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে।"

রামানন্দ উত্তর দেন, "প্রভু, তোমার এসব ছলাকলা তুমি রেখে দাও। তোমায় আমি যে রূপে দর্শন করেছি, তোমার যে মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেছি, তা কোনোদিনই বিস্মৃত হবার নয়।"

প্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর তাঁহার রচিত কড়চায় চৈতন্য-রামানন্দ মিলনের যে মনোরম বর্ণনা সূত্রাকারে লিখিয়াছিলেন, তাহা অনুসরণ করিয়াই ভক্ত কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ আঁকিয়াছেন তাঁহার মনোরম আলেখ্য। এই আলেখ্য সম্পর্কে

তাঁহার নিজের মন্তব্যটি গৌড়ীয় ভক্তজনের কাছে চিরস্মরণীয়।

কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন :

সহজে চৈতন্যচরিত ঘন দুগ্ধপুর।
রামানন্দ-চরিত তাহে খণ্ড[১] প্রচুর॥

অতঃপর প্রভু রাজমহেন্দ্রী হইতে বিদায় নিলেন, রওনা হইলেন দক্ষিণের তীর্থ পরিব্রাজনে। বিদায় কালে নির্দেশ দিলেন রামানন্দ রায়কে, "রায়, এবার তুমি বিষয়কর্ম ত্যাগ করো, নীলাচলে এসে বাস করো। আমি তীর্থ দর্শন সেরে এসে তোমার সঙ্গে সেখানে মিলিত হবো। কৃষ্ণকথা রঙ্গে এবং পরমানন্দে আমরা সেখানে দিন যাপন করবো।"

শ্রীচৈতন্যের এ নির্দেশ রাম রায় শিরোধার্য করিয়া নেন, প্রদেশ শাসকের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন নীলাচলে, সেখানে প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদরূপে, লীলাসঙ্গী-রূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

প্রভু শ্রীচৈতন্য যখন দক্ষিণ ভারতে পরিব্রাজন রত, তখন পুরীর বিশিষ্ট ভক্ত বৈষ্ণবেরা অধীরভাবে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের মতো দুর্ধর্ষ পণ্ডিতকে যিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন, ভক্তিমান্ বৈষ্ণবে পরিণত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই এক বিরাট শক্তিধর মহাপুরুষ। এই বৈষ্ণবদের আগ্রহ ছিল তাঁহার সহিত পরিচয় সাধনের জন্য। প্রভু হঠাৎ তীর্থদর্শনে চলিয়া যাওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। এবার তিনি ফিরিয়া আসিলে সবাই সার্বভৌমকে চাপিয়া ধরিলেন, প্রভুর দর্শন তাঁহারা চান।

এই দর্শনার্থীদের অন্যতম রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায়। উড়িষ্যা-রাজের গুরু কাশী মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্য রহিয়াছেন, সেখানে বাসুদেব সার্বভৌম একদিন ভবানন্দ ও তাঁহার চারপুত্রকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রভু এই ভক্ত-পরিবারকে দেখিয়া মহা

১ খণ্ড—মিছরির টুকরো।

উল্লসিত। ভবানন্দকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "রামানন্দের মতো পুত্ররত্ন যাঁর, তাঁর মতো ভাগ্যবান্ আর কে আছে ?"

ভবানন্দের পাঁচটি পুত্র, একথা জানিয়া প্রভু কহিলেন, "তবে তো আপনি পাণ্ডুরাজা, আপনার পত্নী কুন্তীদেবী, আর পুত্রেরা সব পঞ্চপাণ্ডব।"

করজোড়ে ভবানন্দ রায় উত্তর দেন, "প্রভু, আমি জাতিতে শূদ্র এবং অধম বিষয়ী। আপনার চরণে নিজেকে সপরিবারে সমর্পণ করছি, আপনার কৃপাদৃষ্টি যেন আমাদের প্রতি চিরদিন থাকে। আমার পুত্র বাণীনাথ ইতিমধ্যেই আপনার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে, তাঁকে আমি আপনার হাতেই সমর্পণ করলাম। সে আপনার সেবা করবে, যে কোনো আদেশ পালন করবে। তাকে কোনো আদেশ দিতে আপনি যেন সংকোচ করবেন না।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর দিলেন, "সংকোচের আমার কোনো কারণ নেই। আমি যে জানি, আপনারা আমার জন্মান্তরের পরম বান্ধব। রামানন্দ তো কয়েকদিনের ভেতরেই এখানে আসছে, তখন সবাই মিলে আনন্দ করা যাবে।"

সেইদিন হইতে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ ব্রতী হইলেন প্রভুর সেবার কাজে।

পুরীধামে পৌঁছিয়াই রামানন্দ রায় শ্রীচৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন, লুটাইয়া পড়েন তাঁহার চরণতলে। উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রভু তাঁহাকে করেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রেমাবেশে তখন দু'জনেরই নয়নে ঝরিতেছে আনন্দাশ্রু, রায়ের প্রতি প্রভুর এই প্রগাঢ় প্রেম দর্শনে ভক্তেরা অবাক হইয়া গিয়াছেন।

রাম রায় সোৎসাহে কহেন, "প্রভু, তোমার কৃপায় বিষয়কর্ম থেকে অতি সহজেই আমি ছাড়া পেয়েছি। রাজাকে খুলে বল্‌লাম আমার সকল কথা। বল্‌লাম, 'আমাদ্বারা আর কোনো বিষয়কর্ম হবে না, যদি আপনি অনুমতি দেন, প্রভু শ্রীচৈতন্যের চরণসেবা ক'রে বাকী জীবনটা আমি অতিবাহিত করবো।' "

আনন্দে প্রভুর নয়ন দুটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, বলেন, "রাম রায়, ভালোই করেছো স্পষ্ট ক'রে একথা বলে। তাছাড়া, তোমার সঙ্গ না পেলে কৃষ্ণকথায় আমি ডুবে থাক্‌বো কি ক'রে ?"

রামানন্দ রায় আরো বলেন, "প্রভু, আরো কি কথা হলো রাজার সঙ্গে তা বলছি। আমার বিষয় ত্যাগের প্রস্তাব শুনে, আর তোমার নাম শুনেই রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এলেন, সোৎসাহে আমায় দিলেন আলিঙ্গন। তারপর প্রেমভরে আমার হাতদুটো ধরে বললেন, 'নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি প্রভুর চরণসেবা করতে থাকো। আর যে বেতন তুমি রাজ-সরকার থেকে পেতে আগেকার মতোই তা পেতে থাকবে। রাম রায়, আমি বড় দুর্ভাগা, প্রভুর দর্শন লাভে আমিই বঞ্চিত হয়ে রইলাম। যাক্‌, তিনি কৃপালু, ঈশ্বর-স্বরূপ, কোনো জন্মে নিশ্চয় আমায় দর্শন দিয়ে ধন্য করবেন।' প্রভু, তোমার প্রতি রাজার যে ভক্তি প্রীতি দেখলাম, মনে হয় আমার ভেতর তার একাংশও নেই।"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য মন্তব্য করেন, "রায়, তুমি কৃষ্ণভক্তদের প্রধান। তোমার প্রতি যাঁর প্রীতি আছে সে তো মহা ভাগ্যবান্‌। কৃষ্ণ অবশ্যই একদিন তাঁকে কৃপা করবেন।"

প্রভুর পাশে তখন দণ্ডায়মান পরমানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, স্বরূপ দামোদর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি প্রবীণ সাধক। রামানন্দ দৈন্যভরে ইহাদের পদবন্দনা করিলেন, সবাই দিলেন তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন।

প্রভু এসময়ে প্রশ্ন করেন, "রাম রায়, শ্রীজগন্নাথকে দর্শন ক'রে এসেছো তো ?"

"প্রভু, এবার যাচ্ছি শ্রীমন্দিরে তাঁকে দর্শন করতে" উত্তর দেন রামানন্দ।

"এ কি করেছো রায়, শ্রীভগবানকে আগে দর্শন না ক'রে তুমি এখানে এলে ?"

"প্রভু, চরণ হচ্ছে রথ, আর হৃদয় সারথী। সেই সারথীই প্রথমে আমায় তোমার কাছে নিয়ে এল, সেস্থলে আমি তার কি করতে পারি।"

"না—না রাম রায়, এ তুমি ঠিক করো নি। এক্ষুনি যাও পরম-প্রভুকে দর্শন করো।"

শ্রীচৈতন্যের চরণে এমনিভাবে সেদিন রামানন্দ রায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তীর্থবিগ্রহ শ্রীজগন্নাথ দর্শনের কথাটিও হইয়াছেন বিস্মৃত।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি প্রভু শ্রীচৈতন্যের মহিমার কথা, দেবদুর্লভ রূপের কথা, বহুভাবে শুনিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রতিম এই মহাপুরুষ তাঁহারাই রাজ্যে বসবাস করিতেছেন, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া উৎসারিত করিয়াছেন প্রেমভক্তির প্রবল বন্যা। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য রাজার, এ যাবৎ একটিবারও প্রভুকে দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রভু বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী, তাই রাজ দর্শনে তাঁহার প্রবল বিরূপতা, প্রতাপরুদ্র তাঁহার সভাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের প্রতি শ্রীচৈতন্যের কৃপার কথা শুনিয়াছেন। সার্বভৌমের প্রতি প্রভু অতিশয় প্রসন্ন, তাহাও তিনি জানেন। তাই সার্বভৌমকে একদিন রাজপ্রাসাদে ডাকাইয়া আনেন, অনুনয় করিয়া কহেন, "পণ্ডিতবর, অন্তত একটিবারের জন্য যেন প্রভুর দর্শন পাই, সেই ব্যবস্থা আপনি ক'রে দিন।'"

প্রভুর কাছে সার্বভৌম এই প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র তিনি শিহরিয়া ওঠেন, "না—না সার্বভৌম এমন অনুরোধ আমায় আপনি করবেন না। আমি সন্ন্যাসী, বিষয়ী রাজার দর্শন আর স্ত্রীলোক-দর্শন আমার পক্ষে ত্যজ্য, বিষবৎ ত্যজ্য।"

সার্বভৌম যুক্তি দিয়া বুঝান, "প্রভু, তুমি ঠিকই বলেছো, কিন্তু রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথের প্রধান সেবক, নিজে তিনি উত্তম ভক্তও বটেন।"

"না সার্বভৌম, তা হয় না। সন্ন্যাসীর পক্ষে কাষ্ঠ নির্মিত নারীদেহ দর্শন করাও ঠিক নয়, তার ফলে কামের উদ্রেক হতে পারে। তেমনি, রাজা যত ভক্তিমান্ই হোন, শ্রেষ্ঠ বিষয়াধিকারী তো বটেই। তাঁর দর্শনও তাই সমীচীন নয়।"

বাসুদেব সার্বভৌম চুপ করিয়া গেলেন। ভাবিলেন, পরে সুবিধামতো আবার প্রভুকে রাজী করানোর চেষ্টা করা যাইবে।

রামানন্দ রায় পুরীতে আসার পর রাজা প্রতাপরুদ্রের মনে নূতন আশার সঞ্চার হইল। রায়ের প্রতি প্রভুর কৃপা ও প্রেমের অন্ত নাই। রাজা তাই রাম রায়ের শরণ নিলেন।

সেবার রাজা প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রায় উভয়েই পুরীতে রহিয়াছেন। রাজার অনুরোধে রামানন্দকে দৌত্য গ্রহণ করিতে হয়, প্রভুকে তিনি চাপিয়া ধরেন। নিপুণ রাজ-সচিব তিনি, বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রতাপরুদ্রের ভক্তি ও ঈশ্বরসেবার কথা বলিয়া প্রভুর মন গলানোর চেষ্টা করিতে থাকেন।

প্রভু কহেন, "রাম রায়, তুমি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন সঙ্গত কি না। এতে যে সন্ন্যাসীর ইহলোক পরলোক দুই-ই নষ্ট হয়। সাধারণ মানুষেরও উপহাসের পাত্র হয় সে।"

"প্রভু, তুমি সন্ন্যাসী, ঈশ্বরপ্রতিম ও স্বতন্ত্র পুরুষ, তোমার আবার কাকে ভয়? লোকনিন্দারই বা কি ধার ধারো তুমি?"

"না—রাম রায়, তুমি বুঝতে পারছো না। সন্ন্যাস আশ্রম বড় কঠিন ঠাঁই। সন্ন্যাসীর চরিত্রে বিন্দুমাত্র ছিদ্র পেলে লোকে তাই নিয়ে কানাঘুষা করে। শুক্ল বসনে একবিন্দু কালি পড়লে তা সবারই চক্ষে পড়ে না কি?"

"সবই বুঝলাম, প্রভু। কিন্তু কত পাপী-তাপীকেই তো তুমি এযাবৎ উদ্ধার করেছো। প্রতাপরুদ্র শ্রীভগবানের সেবক এবং তোমার একান্ত ভক্ত। তাকেও তুমি উদ্ধার করো।"

"কিন্তু রাম রায়, প্রতাপরুদ্র যত গুণবানই হোন, রাজা তো বটেন। দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে একবিন্দু মদ্য পড়লে তা আর সাত্ত্বিক ব্যক্তির স্পর্শযোগ্য থাকে না। তেমনি 'রাজ' শব্দটি জড়িত আছে যাঁর নামের সঙ্গে, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা যায় না।"

খানিকক্ষণ চিন্তার পর শ্রীচৈতন্য একটু নরম হইলেন, কহিলেন,

"হ্যাঁ রাম রায়, তোমার যখন এমন প্রবল ইচ্ছে হয়েছে তখন একটা কাজ করা যায়। রাজার পুত্রকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এসো। শাস্ত্রে রয়েছে—আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ, আমার সঙ্গে তাঁর পুত্রের মিলন হলে, তা তাঁর নিজের মিলনেরই তুল্য। তাই করো রাম রায়।"

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করা হইল। রাজার পুত্রটি আয়ত নয়ন, শ্যামল সুন্দর কিশোর। পরিধানে পীত রং-এর পরিচ্ছদ এবং নানা অলংকার। তাহাকে দেখা মাত্র প্রভুর মনে জাগিয়া উঠে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপনা। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহাকে প্রেমভরে বুকে টানিয়া নেন।

প্রভুর এই স্পর্শ তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের মধ্যে ঘটায় অত্যাশ্চর্য রূপান্তর। অশ্রু স্বেদ কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক প্রেমবিকার স্ফুরিত হয় তাহার দেহে, দিব্য আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া সে নৃত্য করিতে থাকে।

প্রভু শ্রীচৈতন্যের করস্পর্শে আবার তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলে রাজা প্রতাপরুদ্র সাগ্রহে পুত্রকে করেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। প্রভু শ্রীচৈতন্যের স্পর্শে তাঁহার পুত্রের দেহ পবিত্রীকৃত, তাই সেই দেহ আলিঙ্গন করিয়াই রাজা সেদিন আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠেন।

প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাণের ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বর্ধিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য এই ব্যাকুলতার কথা অন্তর্যামী শ্রীচৈতন্যের অজানা ছিল না। কিন্তু রাজার প্রেমোৎকণ্ঠাকে তিনি ধীরে ধীরে আরো তীব্র করিয়া নিতে চাহিতেছিলেন।

প্রতাপরুদ্র শেষটায় একদিন বাসুদেব সার্বভৌমকে ডাকিয়া অন্তরের দহন জ্বালা উদ্‌ঘাটিত করিলেন। কহিলেন, "আচার্য, আমি কি তবে জগাই মাধাই অপেক্ষাও হীন? প্রভু তাদের উদ্ধার সাধন করলেন, আর আমাকে রেখে দিলেন দূরে সরিয়ে? আমার নিজ

জীবনের প্রতি ধিক্কার এসে গিয়েছে, এবার প্রভুর দর্শন যদি না পাই তবে এজীবন আর আমি রাখবো না।"

সার্বভৌম রাজাকে ধৈর্য ধরিতে পরামর্শ দিলেন। কহিলেন, "ইতিমধ্যে প্রভুর মন আপনার সম্বন্ধে অনেকটা নরম হয়ে এসেছে।"

অতঃপর সার্বভৌম এক ফন্দী আঁটিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, আগামী রথযাত্রার দিন প্রভু বহুক্ষণ রথাগ্রে নৃত্য করবেন এবং রথের অনুষ্ঠান শেষে বিশ্রাম নেবেন পুষ্পউদ্যানে, তখনই আসবে আপনার পরম সুযোগ। আপনি দীনবেশে এগিয়ে গিয়ে প্রভুর পাদ সম্বাহন করবেন, আর রাসপঞ্চাধ্যায়ীর সুমধুর শ্লোক দু' চারটি তাঁকে শোনাবেন। তবেই আপনি পাবেন প্রভুর কৃপা।"

সার্বভৌমের এই গোপন পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছিল, রাজা ধন্য হইয়াছিলেন প্রভুর অনুগ্রহ লাভে। এ অনুগ্রহ অনেক আগেই তিনি লাভ করিতেন কিন্তু তাহা বিলম্বিত হইবার কারণ, প্রভু তাঁহার ভক্তদের দেখাইতে চাহিতেছিলেন যে, বৈরাগী বৈষ্ণবের পক্ষে রাজা ও রাজবিষয় হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়।

রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রভুদর্শনের সমস্যাটি এভাবে মিটিয়া যাওয়াতে রামানন্দ রায় যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। রামানন্দ রাজাকে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তির[1] জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাও করিতেন। প্রভু এবার তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া নেওয়াতে রাম রায়ের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

রথযাত্রার সময় প্রভুর গৌড়ীয়া ভক্তেরা পুরীধামে উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ ও প্রভুর সান্নিধ্যে থাকিয়া আনন্দরঙ্গে মত্ত হইয়াছেন। এবার এসময়ে রূপ গোস্বামীও আসিয়া উপস্থিত।

---

১ রাজা প্রতাপরুদ্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী কবিকর্ণপুরের প্রশস্তি উল্লেখনীয়। ভক্তকবি তাঁহাকে বলিয়াছেন—ভগবদ্ভাবস্বভাবঃ স্বয়মাবির্ভূত শান্তিরসাবগাহনির্ধূতরজস্তম:

রথযাত্রার পরে চাতুর্মাস্যের সময়ও তিনি পুরীতে থাকিয়া গেলেন। এই সময়ে প্রভু তাঁহাকে নানাভাবে শিক্ষা দিলেন ব্রজরসের তত্ত্ব।

রূপ অসামান্য কবি, এবার শ্রীচৈতন্যের কৃপায় ও প্রেরণায় শুরু করিয়াছেন বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব এই দুইখানি নাটকের রচনা। স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায় প্রভুর এই দুই পার্ষদ ব্রজরস-সাধনার সিদ্ধ সাধক, বৈষ্ণবীয় নাট্যকাব্যের মর্মী সমালোচক। প্রভুর একান্ত ইচ্ছা রূপের নাটকের রস ইহারা আস্বাদন করুন এবং প্রশস্তি জানাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করুন।

রামানন্দ রায়ের নির্দেশমতো রূপ তাঁহার নাটকের এক একটি অংশ পাঠ করিতেছেন আর প্রভু এবং ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাহা আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন।

শ্লোক শুনিয়া রাম রায় এক একবার উল্লসিত হইয়া প্রশংসা করিতে থাকেন, আর রূপ সংকোচে আড়ষ্ট হন। বলেন, "আপনার বৈদগ্ধ্যের প্রভা হচ্ছে সূর্যের প্রভার মতো, আর আমার রচনা যেন খদ্যোতের আলো। আমায় উৎসাহিত করুন, কিন্তু প্রশংসা ক'রে লজ্জা দেবেন না।"

নাটকের শ্লোকগুলি শুনার পর রামানন্দ রায় সোল্লাসে বলেন, "প্রভু, এ তো কাব্য নয়, এ হচ্ছে অমৃতের প্রস্রবণ। নাটকের সব লক্ষণ ও সিদ্ধান্ত এতে সুপরিস্ফুট হয়েছে, সামগ্রিকভাবে রূপের এ রচনা দুটি হয়েছে সর্বতোভাবে রসোত্তীর্ণ। যে কোনো রসিক লোকের কর্ণ এ শুনে তৃপ্ত হবে, চিত্ত হবে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত। কিন্তু প্রভু, রসবস্তুর পেছনে রয়েছে তোমার শক্তি, নইলে এমন মাধুর্যমণ্ডিত সৃষ্টি সম্ভব নয়।"

শ্রীচৈতন্য বার বার রূপের কবিত্বশক্তি ও মাধুর্যরস এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের দৈন্য, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের বার বার প্রশংসা করিতে থাকেন।

রাম রায় সহাস্যে মন্তব্য করেন, "প্রভু, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, যা তোমার অভিরুচি অবলীলায় তাই তুমি সম্পন্ন করছো। ইচ্ছে হলে

কাঠের পুতুলও তুমি নাচাতে পারো। দেখতে পাচ্ছি, আমার মুখ দিয়ে যে রস যে তত্ত্ব তুমি বলিয়েছো, রূপের রচনায়ও রয়েছে তা। ভক্তদের প্রতি তোমার কৃপার অন্ত নেই। তাই তো ব্রজরসের প্রচার তুমি করাচ্ছো এই ভাবে।"

প্রভুর অনুরোধে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও অপর বর্ষীয়ান্ ভক্তেরা রূপকে আশীর্বাদ করিলেন, জানাইলেন সস্নেহ অভিনন্দন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক উড়িষ্যার এক ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীচৈতন্যের আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পুণ্যসঙ্গের লোভে স্বগ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া নীলাচলেই বাস করিতে থাকেন। শ্রীজগন্নাথের দর্শন, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণের জপধ্যান এই নিয়াই এই ভক্তের দিন পরমানন্দে কাটিয়া যায়। একদিন মিশ্র শ্রীচৈতন্যের কাছে নিবেদন করেন, "প্রভু, আমার প্রাণের একান্ত বাসনা, আপনার শ্রীমুখ থেকে একদিন কৃষ্ণকথা শুনবো। কবে আপনার অবসর হবে বলুন।"

প্রভু উত্তর দেন, "মিশ্র, তুমি মহা ভাগ্যবান্, কৃষ্ণকথা শোনবার ইচ্ছা তোমার মনে জেগেছে। কিন্তু কৃষ্ণকথা আমি আর তেমন কি জানি, এই কথার আসল ভাণ্ডারী হচ্ছেন রামানন্দ রায়। তুমি তাঁর কাছে যাও। তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে।"

অতঃপর প্রদ্যুম্ন মিশ্র একদিন রামানন্দের ভবনে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু ভৃত্যদের কাছে শুনিলেন, তিনি গৃহে নাই, দুইটি সুন্দরী কিশোরীকে নিয়া নিভৃত উদ্যানে খুব ব্যস্ত রহিয়াছেন। সেখানে প্রতিদিন তাহাদের তিনি নিজের নাটক জগন্নাথবল্লভম্-এর অভিনয় এবং নৃত্যগীত শিক্ষা দেন। ফিরিতে বেশ কিছুটা বিলম্ব হইবে।

আরো বিস্তারিত সংবাদ সংগ্রহ করেন প্রদ্যুম্ন মিশ্র। ইহা শুধু অভিনয় শিক্ষাদান নয়, ইহা রাম রায়ের ব্রজরস সাধনার, মাধুর্যময় ভগবানের সাধনার, এক বিশেষ অঙ্গ। সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া ঐ কিশোরী দেবদাসীদের তিনি স্বহস্তে গাত্রমার্জন করেন, শাড়ি ও ওড়না পরাইয়া দেন, প্রসাধন করান। শুধু তাহাই নয়, যাহাতে

অভিনয়ে, গীতে ও নৃত্যে গূঢ় অর্থ স্ফুরিত হয়, সঞ্চারী-সাত্ত্বিক-স্থায়ী ভাব প্রকটিত হয়, সেজন্য নিজে হাতে ধরিয়া সব শিক্ষা দেন।

সুন্দরী দেবদাসীদের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়াও কি রাম রায়ের চিত্তে কখনো বিকার দেখা যায় না? মিশ্র মহাশয়ের মনকে বার বার দোলা দিতে থাকে এই প্রশ্নটি।

সেদিন বহুক্ষণ পরে রামানন্দ রায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মিশ্র অপেক্ষা করিয়া আছেন শুনিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, করজোড়ে কহিলেন, "আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হয়েছে, আমার এ অপরাধ মার্জনা করুন। আপনি ভক্ত বৈষ্ণব, তদুপরি প্রভু শ্রীচৈতন্যের নিজ জন, আপনার পদধূলিতে এ ভবন পবিত্র হয়ে উঠেছে। আমি আপনার দাস, আজ্ঞা করুন কি আমায় করতে হবে।"

বৈষ্ণবীয় দৈন্য দেখাইয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রও উত্তর দিলেন, "আপনার মতো পরম ভাগবতের দর্শন পেলাম, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার কাছ থেকে কৃষ্ণকথা শোনবার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু আজ তো বেলা পড়ে এসেছে, এবার বিদায় নিচ্ছি। আর একদিন আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে ধন্য হবো।"

সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, মিশ্র এতক্ষণ উঠি উঠি করিতেছিলেন। তাছাড়া, ভৃত্যদের কাছে যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহার পর রাম রায়ের মুখে কৃষ্ণকথা শোনার উৎসাহ আর মোটেই নাই। উচ্চ-কোটির বৈষ্ণব সাধক হইয়া রাম রায় যেভাবে সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গ করিতেছেন তাহাতে তাঁহার সম্পর্কে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের মনে বরং একটা ধোঁকা লাগিয়াই গিয়াছে। তাই সৌজন্যমূলক কথাবার্তার পর তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রভু হঠাৎ সেদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে প্রশ্ন করিলেন, "কি হে, কি সংবাদ তোমার? রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তো? কৃষ্ণকথা কেমন শুনলে তাঁর মুখে? সে অমৃতের ভাগ আমাদের একটু দাও।"

মিশ্র উত্তর দিলেন, "না প্রভু, কৃষ্ণকথা আর রাম রায়ের মুখে শোনা হয় নি আমার।" অতঃপর সেদিনকার বৃত্তান্ত এবং নিজের মনের প্রতিক্রিয়ার কথা প্রভুকে সব খুলিয়া বলিলেন।

প্রভুর দৃষ্টিতে রামানন্দ রায় ব্রজরস সাধনার এক সিদ্ধপুরুষ। রূপসী তরুণীদের সহিত নির্জনে যত ঘনিষ্ঠতাই তিনি করুন, তিনি থাকেন সদা নির্বিকার। রাধাকৃষ্ণের লীলাধ্যানে সদা তিনি আবিষ্ট, তাই প্রাকৃতজনের মানসিক বিকার বা চাঞ্চল্য তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রামানন্দ রায়ের সাধন মাহাত্ম্যটি এই সুযোগে প্রভু ভক্তদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন, কহিলেন :

আমি ত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে রহে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় আমার তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য কথন॥
একে দেবদাসী আরো সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শন॥
তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ॥
নির্বিকার দেহমন কাষ্ঠ-পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণী-স্পর্শে নিবিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥
তাঁহার মনের ভাব তিঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥

কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টে এক করি অনুমান।
শ্রীভাগবতের শ্লোক[১] তাহাতে প্রমাণ॥
ব্রজবধূ সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি বিলাস।
যেই ইহা কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস॥
হৃদ্‌রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিন গুণ ক্ষোভ নাহি, মহাধীর হয়॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেম-ভক্তি সেই পায়।
আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্যে বিহরে সদায়॥
যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি॥
তার ফল কি কহিব কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়॥
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন॥

গৌড়ীয়া ও উৎকলীয় ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যের মুখে রাম রায়ের মাহাত্ম্য শুনিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন।

বৃদ্ধা ভক্ত মাধবী দাসীর কাছ হইতে ছোট হরিদাস সরু চাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন চৈতন্য প্রভুর ভোজনের জন্য। বৈরাগী হইয়া তিনি নারী সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এই অপরাধে প্রভু তাঁহাকে বর্জন করেন, অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে আত্মঘাতী হইতে হয়। আর রামানন্দের বেলায় প্রভুর এ কি ব্যবস্থা!

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের দিকে তাকাইয়া প্রসন্ন কণ্ঠে প্রভু শ্রীচৈতন্য বলেন, "মিশ্র, রামানন্দ রায় এ হেন ব্যক্তি! রাগানুগা সাধনে সিদ্ধ তিনি। তাই তো তাঁর মুখে কৃষ্ণকথা শোনার জন্য আমার এত লোভ। যদি তা শুনতে চাও, মিশ্র, তবে আবার তাঁর কাছে যাও। তাঁকে বলবে আমি পাঠিয়েছি তোমায়।"

প্রভুর কৃপায় রামানন্দের স্বরূপ এবার মিশ্রের কাছে উদ্‌ঘাটিত।

১ শ্রীচৈতন্য এখানে ভাগবতের ১০।৩৩,৩৯ শ্লোকের মর্মার্থ কহিতেছেন।

সোৎসাহে সেইদিনই তিনি উপস্থিত হন রায়ের ভবনে। যুক্তকরে বলেন, "প্রভুর নির্দেশে আবার আমি এসেছি আপনার কাছে, কৃষ্ণকথা শুনিয়ে আমার প্রাণ জুড়িয়ে দিন।"

নিভৃত কক্ষে মিশ্রকে নিয়া বসান রামানন্দ, প্রশ্ন করেন, "বলুন, কোন্ বিশেষ কথা শোনার জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত।"

করজোড়ে মিশ্র বলেন, "আমি দীনহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, ভাল-মন্দের কিছুই জানিনে। আপনি স্বয়ং প্রভু শ্রীচৈতন্যের উপদেষ্টা, আপনাকে আমি আর কি প্রশ্ন করবো? বিদ্যানগরে প্রভুকে ব্রজরসের তত্ত্ব বলেছিলেন, তাই আমায় বলুন।"

কৃষ্ণকথা শুরু হয়, বলিতে বলিতে রাম রায় আপনা বিস্মৃত হইয়া যান। প্রেমরসের ভাবতরঙ্গ উত্তাল হইয়া উঠে। বেলা তৃতীয় প্রহর গড়াইয়া যায়, তবু রায়ের হুঁশ নাই। সেবকেরা আসিয়া জানায়, দিবা অবসান হইয়া গিয়াছে, তবে রামানন্দ রায় ক্ষান্ত হন। বহুতর সম্মান দেখাইয়া মিশ্রকে বিদায় জ্ঞাপন করেন।

মিশ্রের জন্য শ্রীচৈতন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে প্রশ্ন করিলেন, "কিহে মিশ্র, কেমন লাগলো রাম রায়ের কৃষ্ণকথা?"

প্রত্যুম্ন মিশ্রের সারা অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে, আনন্দে তিনি উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন। কহিলেন, "প্রভু তুমি আমাকে কৃতার্থ করেছো, কৃষ্ণকথার অমৃত রসে করেছো আমায় নিমজ্জিত। রামানন্দ রায়ের কথা কি বলবো, প্রভু, তিনি মানুষ নন, দিব্যপুরুষ। কৃষ্ণভক্তিরসে সদা তিনি রসায়িত। আর একটা কথা বার বার বললেন রাম রায়, 'মিশ্র, একটা কথা জেনে রাখুন, কৃষ্ণকথার প্রবক্তা আমি নই, প্রভুই আমার মাধ্যমে বলছেন এই অমৃতময় কথা, কৃপালু তিনি, পৃথিবীতে এই অমৃত বিতরণের ইচ্ছা হয়তো তাঁর হয়েছে।'"

প্রভু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "রাম রায় বিনয়ের খনি, তাই তোমায় ওকথা বলেছেন। মহানুভব যাঁরা তাঁদের স্বভাবই এই, নিজেদের কৃতিত্বের কথা কখনো বাইরে প্রকাশ করেন না।"

সারাজীবন বিষয়ের আবর্তে থাকিয়াও রামানন্দ রায়, এমনতর উচ্চকোটির এক সিদ্ধ বৈষ্ণবে পরিণত হইয়াছিলেন। ব্রজরস সাধনার তত্ত্ব বর্ণনায় তাঁর জুড়ি সমকালীন উড়িষ্যায় কেহ ছিলেন না। সর্বাপেক্ষা বড় কথা, প্রভু শ্রীচৈতন্য নিজে রাম রায়ের সঙ্গকে পরমকাম্য বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া হইতেন আত্মবিস্মৃত।

রামানন্দ রায়ের পরিবারের উপর শ্রীচৈতন্যের কৃপাদৃষ্টি সতত নিবদ্ধ ছিল। রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথের প্রাণ রক্ষার মধ্য দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীনাথ রাজ-সরকারে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতেন, মালজাঠিয়া দণ্ডপাট নামক অঞ্চলের তিনি অধিকর্তা ছিলেন। রাজকর আদায় করিয়া সরকারী তহবিলে তাহা জমা দেওয়ার ভার ছিল তাঁহার উপর। এক সময়ে দেখা গেল, প্রায় দুইলক্ষ কাহন কড়ি তিনি বাকী ফেলিয়াছেন। এই বাকীর দায়ের জন্য এক বড় সংকট তাঁহার জীবনে ঘনাইয়া আসে।

সেদিন এক ভক্ত আসিয়া শ্রীচৈতন্যকে সংবাদ দিলেন, "প্রভু, রাম রায়ের ভ্রাতা গোপীনাথের আজ বড় বিপদ। রাজ-আজ্ঞায় তাঁহাকে চাঙে-এ চড়ানো হচ্ছে, এবার খড়্গাঘাতে তাঁহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করা হবে।"

চাঙ-এ চড়ানোর অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। এই দণ্ড দিতে হইলে অপরাধীকে একটি চাঙ বা বধ্য মঞ্চের উপর দাঁড় করানো হইত, নিচে পাতিয়া রাখা হইত সুতীক্ষ্ণ খড়্গ। তারপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মতো তাহাকে নিক্ষেপ করা হইত মঞ্চের তলদেশে, তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে তাহার দেহ হইত দ্বিখণ্ডিত।

চাঙ-এর কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য চমকিয়া উঠিলেন, জানিতে চাহিলেন বিস্তারিত তথ্য। ভক্তেরা কহিলেন, "প্রভু, রাজার সঙ্গে পাওনা দেনার ব্যাপারটা হয়তো বা মিটে যেতে পারতো, কিন্তু গোপীনাথের নিজের দোষে তা হতে পারে নি। সরকার থেকে টাকা আদায়ের চাপ দেওয়া হলে গোপীনাথ বলেন, 'যে টাকা ভেঙেছি, তা এক সঙ্গে আমি দিতে পারবো না। আমার দশ বারটি ভালো

ঘোড়া আছে, এগুলো আমি সরকারকে হস্তান্তর করবো। এভাবে ঘোড়ার মূল্যের সমপরিমাণ টাকা এখনি আদায় দেবো, আর বাকীটা শোধ করবো ধীরে ধীরে।' "

রাজ-সরকার এ প্রস্তাব মানিয়া নেন এবং টাকা আদায়ের ভার দেওয়া হয় রাজার এক পুত্রের উপর। এই রাজপুত্রটি গোপীনাথের ঘোড়ার মূল্য অত্যধিক কম করিয়া ধরিতে চাহিলে গোল বাধিয়া যায়। দর কষাকষির ফলে উত্তেজিত হইয়া গোপীনাথ বলিয়া ফেলেন, "আমার ঘোড়া ঘাড় ফিরায় না আর উর্ধ্বদিকেও ঘন ঘন তাকায় না। তবে তার দাম কম হবে কেন ?"

এ রাজপুত্রের একটি মুদ্রাদোষ ছিল, কথা বলিতে বলিতে গ্রীবা ঘুরাইয়া তিনি উর্ধ্বদিকে চাহিতেন, গোপীনাথ তাঁহার ঐ মুদ্রাদোষকে উপহাস করিয়া জটিলতার সৃষ্টি করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজপুত্র তাঁহার পিতা প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে আদেশ বাহির করিলেন, গোপীনাথকে চাঙ-এ চড়ানো হইবে।

ভক্তরা জানাইলেন, "প্রভু, রাজরক্ষীরা শুধু গোপীনাথকে নয় তোমার পরম ভক্ত বাণীনাথ প্রভৃতিকেও গ্রেপ্তার করেছে এবং গোপীনাথকে চাঙ-এ চড়িয়ে তার প্রাণবধ করতে উদ্যত হয়েছে। তুমি এদের উদ্ধার না করলে কে করবে ? রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার আদেশ ফেলতে পারবেন না। তুমি একটিবার মুখ ফুটে তাঁকে বল।"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীচৈতন্য কহেন, "রাজার প্রাপ্য ধন, যে তছরুপ করে, বিলাস বাহুল্য আর নর্তক নর্তকীদের পেছনে টাকা উড়ায় আমি তার জন্য কেন বলতে যাবো ? রাজার দোষ কি ? তাঁর প্রাপ্য অর্থ আদায় তো তিনি করবেনই। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, শ্রীজগন্নাথের দর্শনের জন্য নীলাচলের এককোণে পড়ে আছি। আমি এ ব্যাপারে কিছু করতে পারবো না। রাজাকে এ পার্থিব ব্যাপারে অনুরোধ জানাতেই বা যাবো কেন ?"

প্রভুর এমনতর অটল মনোভাব দেখিয়া স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তেরা প্রমাদ গণিলেন। সংকট যেরূপ ঘনীভূত হইয়াছে

তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপ ছাড়া উদ্ধারের কোনো আশা নাই। যদি একটিবার তিনি রাজাকে বলিয়া দেন, তবেই শুধু গোপীনাথ প্রাণে বাঁচিয়া যায়।

স্বরূপ কহিলেন, "প্রভু, সবাই জানে রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী তোমার আশ্রিত। বৃদ্ধ ভবানন্দ রায় তোমাকে কত শ্রদ্ধা করেন, ভালবাসেন। আর বাণীনাথ তো তোমার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে পড়ে রয়েছেন, তোমার এবং তোমার গৌড়ীয়া ভক্তদের সেবায় তিনি প্রাণপাত করছেন। রামানন্দের অপর ভ্রাতারাও তোমার প্রতি কত সশ্রদ্ধ। তোমার স্নেহের অধিকারী এ পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এ সময়ে তোমার কি কৃপা করা উচিত নয়? না—প্রভু, তোমার আর উদাসীন থাকা চলে না।"

প্রভু ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠেন, "তাহলে তোমরা চাও যে আমি রাজার দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষা মাগি, আর আঁচল ভরে টাকাকড়ি নিয়ে এসে গোপীনাথের দায় মিটাই। এই তো? কিন্তু আমি পাঁচ গণ্ডার পাত্র এক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ। ভিক্ষা চাইলেই রাজা আমায় দু'লক্ষ কাহন দেবে কেন তা বলতে পারো?"

ক্ষণপরেই এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া খবর দেয়, "প্রভু, গোপীনাথকে চাঙ-এ তোলা হইয়াছে, এবার রাজার রক্ষীরা তাহাকে খড়্গের উপর ফেলিয়া দিবে।"

উপস্থিত ভক্ত বৈষ্ণবেরা অধীর হইয়া উঠেন, বার বার শ্রীচৈতন্যকে জানাইতে থাকেন সনির্বন্ধ অনুরোধ, "প্রভু আর দেরি করলে সব শেষ হয়ে যাবে। অবিলম্বে যা হয় একটা কিছু তুমি করো।"

প্রভু ইতিমধ্যে কিছুটা নরম হইয়াছেন, নিতান্ত উদাসীনভাবে কহিলেন, "আমি ভিক্ষুক মানুষ, আমি কি করতে পারি? তোমরা যদি গোপীনাথের প্রাণ রক্ষা করতেই চাও, তবে প্রার্থনা জানাও শ্রীজগন্নাথের কাছে। ভালোকে মন্দ করার, মন্দকে ভালো করার, ক্ষমতা আছে-শুধু ঈশ্বরের। সবাই মিলে কাতর স্বরে তাঁকে নিবেদন করো। তবেই তো কাজ হবে।"

হরিচন্দন পাত্র প্রতাপরুদ্রের একজন বিশ্বাসী অমাত্য ; আবার প্রভু শ্রীচৈতন্যেরও পরম ভক্ত জন। তিনি তাড়াতাড়ি তখনি রাজার কাছে ছুটিয়া গেলেন। কহিলেন, "মহারাজ, গোপীনাথ অপরাধী ঠিকই, কিন্তু সে একজন পুরাতন রাজ-সেবক তো বটে, এই টাকার জন্য তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া মোটেই সমীচীন নয়। তাছাড়া, ভবানন্দ রামানন্দ এঁরা সবাই আপনার প্রাক্তন প্রিয় সচিব, উপকারী বান্ধব। এক্ষেত্রে গোপীনাথকে এ ধরনের চরম দণ্ড আপনি কেন দিচ্ছেন? তাকে বধ করলে কি আপনার প্রাপ্য টাকা আদায় হবে? বরং যে ঘোড়াগুলো সে দিতে চাচ্ছে, তা নিয়ে তা থেকে তার দেয় টাকার কিছুটা পরিশোধ হোক্, বাকীটা সে কিস্তিতে দিয়ে দিক্। এ ব্যবস্থায় তার প্রাণ রক্ষা হবে, রাজ-সরকারের অর্থও আদায় হয়ে যাবে। আপনি দয়া ক'রে তাই করুন।"

রাজা প্রতাপরুদ্র তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করেন হরিচন্দনের এ প্রস্তাব। বলেন, "তুমি ঠিক কথাই তো বলছো। এতে আমার আপত্তি হবে কেন? রাজ-সরকারের প্রাপ্য অর্থ আদায় হচ্ছে সব চাইতে বড় কথা। গোপীনাথের প্রাণ বধ ক'রে আমার কি লাভ? তাছাড়া, তার গোষ্ঠী আমার দীর্ঘদিনের সেবক।"

গোপীনাথকে চাঙ হইতে নামাইয়া আনা হইল, এবং বাণীনাথ প্রভৃতি অন্য ভ্রাতারাও মুক্তি পাইলেন।

সংবাদ নিয়া যাঁহারা আসা যাওয়া করিতেছেন সেই ভক্তদের শ্রীচৈতন্য প্রশ্ন করিলেন, "আমার সেবক, বৈষ্ণবদের সেবক, বাণী-নাথকেও তো ওরা বেঁধে নিয়ে গিয়েছে, বাণীনাথ তখন কি করছিল, বল তো?"

ভক্তেরা জানাইলেন, "প্রভু, বাণীনাথ সারাক্ষণ নির্বিকার হয়ে বসে ছিলেন, আর নিরন্তর জপ করছিলেন 'হরেকৃষ্ণ' নাম।"

এ সংবাদে প্রভু মহা পুলকিত। কহিলেন, "হাঁ এই তো চাই। ভক্ত বৈষ্ণব পরমপ্রভুর নাম নেবে, তাঁর কৃপার উপর নির্ভর ক'রে থাকবে, তবেই তো সর্বসংকট থেকে পাবে উদ্ধার।"

রাজার গুরু কাশী মিশ্রের আবাসে একটি নির্জন কুটিরে শ্রীচৈতন্য অবস্থান করেন। সেদিন কাশী মিশ্র প্রভুকে প্রণাম করিতে এবং কুশলাদি জানিতে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে দুঃখিত অন্তরে কহিলেন, "মিশ্র, এখানে দেখছি নানা উপদ্রব। শান্তিতে নিরুদ্বেগে বসে কৃষ্ণনাম জপ করবো, তার উপায় নেই, ভাবছি নীলাচলের অদূরে আলালনাথে গিয়ে এবার বাস করবো। সেখানে বসে শ্রীজগন্নাথের মন্দির চূড়া দর্শন করবো, আর কৃষ্ণনামে ডুবে থাকবো। তবে কিছুটা সোয়াস্তি যদি মিলে।"

"এসব কি বলছেন, প্রভু। এখানে আপনার ওপর উপদ্রব করবে, কার এমন সাহস!" ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠেন কাশী মিশ্র।

"এই তো ছাখো, মিশ্র। ভবানন্দ রায়ের পুত্রেরা রাজকর্ম করে। তাদের একজন, গোপীনাথ, রাজার প্রাপ্য অর্থ দেয় নি, তাই রাজা তাকে চাঙ-এ চড়িয়েছে। এ সংবাদ বহন ক'রে চার চারবার লোক ছুটে এসেছে আমার কাছে। বলেছে, এ সংকটে যা হয় একটু কিছু করুন। কিন্তু আমি কাঙাল সন্ন্যাসী, এসব ব্যাপারে আমার কি করবার আছে? এই তো গোপীনাথকে রাজা মুক্তি দিলেন, স্বীকার করিয়ে নিলেন, ধীরে ধীরে অনাদায়ী টাকা সে শোধ ক'রে দেবে। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি গোপীনাথ কথার সত্যতা না রাখে, রাজার প্রাপ্য অর্থ না দেয়, তবে তো আবার আমাকে এসব ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে। না মিশ্র, এ সব বিষয়-বার্তা শুনতে শুনতে আমার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আলালনাথে গিয়েই নিভৃতে আমি বাস করবো এবার।"

রাজগুরু কাশী মিশ্র প্রভুর পরম ভক্ত এবং আশ্রিত। তিনি তাঁহার চরণ ধরিয়া দৈন্যভরে বলেন, "প্রভু, তুমি বৈরাগ্যবান্ সন্ন্যাসী, অপরের কথায়, বিষয়ের কোনো কথায়, তোমায় কেন জড়ানো হবে? সাংসারিক লাভের জন্য তো ভক্তেরা তোমায় ভজনা করে না, করে তোমার কৃপার জন্য, তোমার শ্রেষ্ঠ দান প্রেমভক্তিধন লাভের জন্য। বিষয় সম্পর্কিত কাজের কথা বলে তোমার মতো ব্যক্তিকে যে ক্ষুব্ধ করে সে তো মহামূর্খ।"

"না মিশ্র, সম্প্রতি আমায় বিষয় সম্পর্কে এত কিছু কথা শুনতে হলো, তাই মনে উদ্বেগ হচ্ছে। আমি ভিখারী, আমার কাছে এসব প্রশ্ন নিয়ে আনাগোনা কেন?"

যুক্তকরে কাশী মিশ্র নিবেদন করেন, "প্রভু, সত্য কথা বলতে কি, তুমি ভক্তদের কৃপা ক'রে নির্বিষয় ও নির্বাসনা করতে পারো, প্রেমধন দিতে পারো, সেই জন্যেই তাঁরা তোমার কাছে বেশী আসে। প্রভু, তুমি তো জানো, তোমার জন্য রায় রামানন্দ প্রদেশ শাসকের কাজ ছেড়ে দিয়ে নীলাচলে এসে পড়ে আছে। তোমার আশ্রয় পাবার জন্য সনাতন রাজ-বিষয় রাজমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছে। তোমার সঙ্গ পাবার লোভে সপ্তগ্রামের কোটিপতি জমিদারের পুত্র রঘুনাথ এই শ্রীক্ষেত্রে পড়ে আছে। তোমার কৃপায় ভক্তিপ্রেমধন সে পেয়েছে, তাই কাঙালের জীবন যাপন করছে, ছত্রে মেগে খাচ্ছে দু' মুঠো অন্ন। আর ছ্যাখো, রামানন্দের ভাই গোপীনাথ নিজে কিন্তু তোমার কাছে বিষয় চাচ্ছে না। তার প্রাণ বিপন্ন দেখে তার সেবকেরা তোমার কাছে ছুটাছুটি করেছিল। না প্রভু, তোমার কাছে লোকে বিষয় প্রার্থনা করে না, শুদ্ধাভক্তি-ই চায়। যা হোক, তুমি আমাদের প্রতি নিষ্ঠুর হ'য়ো না, আমাদের ছেড়ে অন্যত্র যেয়ো না।"

"কিন্তু গোপীনাথের সব হাঙ্গামা তো একেবারে চুকে যায়নি, মিশ্র।"

"সে যদি রাজার বাকী টাকা না দেয়, আবার ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হবে। এই তো তোমার ভয়, প্রভু? তা নিয়ে তোমায় আর ঝামেলা পোহাতে হবে না, এবার যেমন শ্রীভগবান তাকে রক্ষা করেছেন, পরেও তিনিই তাকে দেখবেন।"

সেদিন দ্বিপ্রহরে রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি কাশী মিশ্রের গৃহে আসিয়াছেন। রাজার নিয়ম ছিল, যতদিন নীলাচলে থাকিতেন, দ্বিপ্রহরে মহাপ্রসাদ পাইবার পর চলিয়া আসিতেন স্বীয় গুরু কাশী মিশ্রের ভবনে। সেখানে গুরুর শয্যার পাশে বসিয়া তাঁহার পাদ-সম্বাহন করিতেন, আর শ্রবণ করিতেন শ্রীজগন্নাথের সেবা ও ভোগ-রাগাদির বিবরণ, এবং শ্রীবিগ্রহের নানা পুরাতন কাহিনী।

রাজা নীরবে বসিয়া গুরুর পদ সেবায় রত, এমন সময়ে কাশী মিশ্র প্রভু শ্রীচৈতন্যের কথা পাড়িলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে কহিলেন, "মহারাজ, প্রভুকে নিয়ে এক মহা মুশকিলে পড়া গেছে। তিনি স্থির করেছেন, নীলাচল ত্যাগ ক'রে আলালনাথে গিয়ে বাস করবেন।"

রাজা চমকিয়া উঠেন, দুঃখিত অন্তরে প্রশ্ন করেন, "সে কি কথা গুরুদেব, প্রভু কেন শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে যাবেন।"

মিশ্র এবার সুকৌশলে উপস্থাপিত করেন তাঁহার বক্তব্য। বলেন, "এই তো দেখুন, গোপীনাথের ব্যাপার নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। তাকে চাঙ-এ চড়ানো হলে অনেকে এসে প্রভুকে বললো সে কথা। সব ঘটনা জেনে তিনি তো মহা ক্ষুব্ধ। বললেন, ব্রহ্মস্ব অপহরণের মতো রাজধন অপহরণও মহাপাপ।—গোপীনাথ তাই করেছে। রাজা তাঁর প্রাপ্য টাকা আদায় করতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর দোষ কোথায়? এরা রাজার টাকা দেবে না, আবার আমাকে এসে বলবে উদ্ধার করার কথা, এ কি রকমের আচরণ? আলালনাথে গিয়ে পড়ে থাকাই বরং আমার ভালো, বিষয়ীর সম্পর্কে আসতে হবে না।"

"গুরুদেব, এজন্যই কি প্রভু নীলাচল ছেড়ে যেতে চান? প্রভুর দর্শনের জন্য, তাঁকে এখানে রাখার জন্য, যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে যে আমি প্রস্তুত। গোপীনাথের কাছে যে পাওনা আছে, তা নয় না-ই পেলাম। প্রভুর তুলনায় আমার যে কোনো বিত্ত বিষয়ই যে অতি তুচ্ছ। দুই লক্ষ কাহন তো কোন্ ছার, প্রভুর চরণে আমার এই রাজ্য, এই প্রাণ, আমি এই মুহূর্তে উৎসর্গ করতে পারি।"

উত্তরে কাশী মিশ্র বলেন, "না মহারাজ, রাজ-সরকারের প্রাপ্য অর্থ গোপীনাথকে ছেড়ে দেওয়া হোক্, তা কখনোই প্রভুর অভিপ্রেত নয়। বরং তা ছেড়ে দিলে তিনি অসন্তুষ্টই হবেন। আবার গোপীনাথ প্রভৃতি দুঃখ পান, তাও তিনি চান না।"

"গোপীনাথ একটা বড় ভুল করেছে, সে আমার পুত্র পুরুষোত্তম জানাকে অপমান করেছে। তাতেই সমস্যাটি এত জটিল হয়ে যায়,

তাকে চাঙ-এ চড়ানো হয়। যাক্, সে সব চুকে গেছে, আপনি এবার যে কোনো উপায়ে, বলে কয়ে প্রভুকে শান্ত করুন, সযত্নে তাঁকে নীলাচলে রাখুন। আপনি তাঁকে কথাটা এভাবে বুঝিয়ে বলুন যে, ভবানন্দ রায় আমার শ্রদ্ধেয়, রামানন্দকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাঁর ভাইয়েরা সবাই আমার অতি আপনজন, স্নেহের পাত্র। তাই গোপীনাথের কাছে যে পাওনা রয়েছে তা আমি মাপ ক'রে দিলাম।"

অতঃপর গোপীনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া প্রতাপরুদ্র কহিলেন, "গোপীনাথ, রাজ-সরকারের কাছে তোমার যে দেনা রয়েছে তা আর তোমায় দিতে হবে না। আর শোন, পূর্বতন মালজাঠিয়া অঞ্চলের রাজস্ব সংগ্রহের ভার আমি আবার তোমারই ওপর ন্যস্ত করলাম। এখন থেকে তোমার বেতন দ্বিগুণ করা হলো। যাও, আর যেন কখনো রাজ-সরকারের অর্থ নিয়ে গোলযোগ করো না।"

সঙ্গে সঙ্গে রাজা নেতধটির শিরোপা-বস্ত্র গোপীনাথ পট্টনায়কের মাথায় জড়াইয়া দিলেন এবং অমাত্যদের সমক্ষে সসম্মানে তাহাকে পূর্বতন পদে করাইলেন অধিষ্ঠিত।

শ্রীচৈতন্য অন্তর্যামী, গোপীনাথকে কেন্দ্র করিয়া যে সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে, যেভাবে তাঁহার উদ্ধার সাধন সম্ভব হইয়াছে, কোনো কিছুই তাঁহার অজানা নাই। প্রশান্ত বদনে আপন নিভৃত কুটিরে তিনি বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভক্তপ্রবর কাশী মিশ্র করজোড়ে নিবেদন করেন গোপীনাথের প্রাণরক্ষার কথা, ভবানন্দ রায়ের পরিবারের ধনপ্রাণ রক্ষার কথা।

প্রভু মনোকষ্টের ভান করিয়া কহিলেন, "মিশ্র, এ তুমি কি করলে বলতো? বৈরাগী সন্ন্যাসী আমি, শেষটায় আমায় রাজ-প্রতিগ্রহ করালে?"

কাশী মিশ্র রাজা প্রতাপরুদ্রের কথাগুলি প্রভুকে সবিস্তারে বলেন, আশ্বাস দেন বার বার, "প্রভু, ভবানন্দ রায়ের পরিবারের প্রতি রাজা চিরদিনই সদয়, বাণীনাথের মার্জনা তারই এক নূতনতর প্রকাশ।

তুমি অনর্থক খেদ করছো। রাজা তোমাকে অনুগ্রহ করেন নি, অনুগ্রহ করেছেন গোপীনাথ ও তার গোষ্ঠীকে।"

ভবানন্দ রায় তাঁহার পাঁচ পুত্র সঙ্গে নিয়া প্রভুর কুটিরে আসিলেন, দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া জানাইলেন তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। কহিলেন, "প্রভু, উৎকলের সবাই জানে আমরা তোমারই কিঙ্কর। কিন্তু এবার আমাদের ধন প্রাণ মান বাঁচিয়ে, নূতন ক'রে তুমি আমাদের সবাইকে কিনে নিলে। এবার সারা দেশে তোমার ভক্তবাৎসল্যের মহিমা প্রচারিত হয়ে গেল।"

সাশ্রুনয়নে করজোড়ে গোপীনাথ কহিলেন, "প্রভু, চাঙ থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে আমার দেহ দ্বিখণ্ডিত হবে, বিত্তবিষয় রাজা সব কেড়ে নেবেন, এই কথাই তো ছিল। সেস্থলে ফুটে উঠ্‌লো তোমার অলৌকিক কৃপালীলা। মৃত্যু আর লাঞ্ছনা তো তুমি ঠেকালেই, তদুপরি ব্যবস্থা ক'রে দিলে দ্বিগুণ উপার্জন, আর নেতধটির রাজগৌরব। নিতান্ত দুর্ভাগা হয়েও নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি, প্রভু। আমার মতো দুষ্টের উদ্ধার সাধন করেছ, তাই তো তোমার মহিমা আজ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। কিন্তু একটা বিশেষ প্রার্থনা আমার রয়েছে তোমার কাছে। আমার দুই ভাই রামানন্দ আর কাশীনাথ তোমার চরণে পড়ে আছে, আর বিষয় বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছে। আমাকেও কৃপা ক'রে সেই মুক্তি তুমি দাও।"

প্রভু উত্তরে কহেন, "পরিবারের সবাই নির্বিষয় এবং বৈরাগী হলে চলবে কেন, গোপীনাথ। বৃহৎ পরিবারের কত কুটুম্ব ও আত্মজন পোষণ রয়েছে, কত কর্তব্য রয়েছে, পিতা এখনো বর্তমান। সংসারে থেকেই তুমি ধর্মাচরণ করতে থাকো। আর একটা কথা মনে রেখো, রাজার প্রাপ্য তাঁকে অবশ্য দিতে হবে, উদ্বৃত্ত আয় যা তোমার থাকবে তারও করবে সদ্ব্যবহার।"

চারিদিকে তখন ভক্তদের হরিধ্বনি ও উল্লাস। ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী বিদায় নিলে, সবাই বলাবলি করিতে থাকে, প্রভুর কৃপালীলার ভঙ্গিটি কি চমৎকার। যতবার গোপীনাথের জীবন রক্ষার জন্য

আকুতি জানানো হইয়াছে তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নাই। একটিবার রাজাকে কোনো অনুরোধ জানান নাই, আর রাজগুরু কাশী মিশ্র, যিনি প্রভুর অন্যতম সেবক, তাঁকেও একটিবার তিনি সাধেন নাই। কোনোপ্রকার বহিরঙ্গ প্রয়াস ছাড়াই, নেপথ্যের ইঙ্গিতে এই বিস্ময়কর কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

ভক্তেরা একথাও উপলব্ধি করিলেন যে, প্রভুর এই অলৌকিক লীলার পশ্চাৎপটে রহিয়াছে রামানন্দ রায়ের প্রতি তাঁহার অপার অগাধ প্রেম ও সখ্যভাব। রামানন্দের শরণাগতি ও আত্মোৎসর্গই স্পন্দন তুলিয়াছে প্রভু শ্রীচৈতন্যের দিব্যসত্তায়, তাহাই ঘটাইয়াছে সেদিনকার এই অঘটন।

দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীচৈতন্য দুই বৎসর একাদিক্রমে নীলাচলে অবস্থান করেন। তারপর এই মহাধাম হইতে একবার গৌড়ে ভ্রমণ করিতে যান, অন্য বারে যান কাশী ও বৃন্দাবনে। এই দুইটি সফরকাল বাদ দিলে নীলাচলে তিনি বাস করেন প্রায় আঠার বৎসর। এই আঠারো বৎসরকাল প্রভুর ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে থাকিয়া রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর নানাভাবে তাঁহার সেবা করেন, দান করেন অন্তরঙ্গ সখ্য।

প্রভুর নীলাচল বাসের শেষ বারোটি বৎসরে অনুষ্ঠিত হয় তাঁহার বহুলখ্যাত গম্ভীরা-লীলায়। গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের বহিরঙ্গ জীবনকে তিনি সংহরণ করিয়া নেন; কৃষ্ণবিরহের আবেশ, দিব্যোন্মাদ ও ধ্যানতন্ময়তায় থাকেন বিভোর।

এই সময়ে তাঁহার প্রধান দুই সঙ্গী ছিলেন স্বরূপ দামোদর এবং রায় রামানন্দ। কৃষ্ণ বিরহের উন্মাদনায় প্রভু তখন প্রায়ই উত্তাল হইয়া উঠিতেন, স্বরূপ ও রামানন্দ নানা সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতেন। প্রভুর ভাবাবেগ অনুযায়ী রাম রায় কখনো কখনো ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতেন তাঁহার কাছে, কখনো বা স্বরূপ দামোদর তাঁহাকে গাহিয়া শুনাইতেন জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের

সমধুর সংগীত। কখনো বা রামানন্দ রায়ের রচিত 'জগন্নাথ বল্লভম্' শুনানো হইত তাঁহাকে।

কৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার যে দশ দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সবকয়টিই এসময়ে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় রাধাভাবে বিভাবিত শ্রীচৈতন্যের দেহে। সাধক কবি কৃষ্ণদাস বলিতেছেন :

—এই মত গৌররায় বিষাদে করে হায় হায়!
হা হা কৃষ্ণ তুমি গেলে কতি।
গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি॥
তবে স্বরূপ রাম রায় করি নানা উপায়
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন॥
গায়েন সঙ্গম গীত, প্রভুর ফিরাইল চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন॥
এইমত বিলাপিতে অর্ধ রাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে শোয়াইল॥
প্রভুকে শোয়াইয়া রামানন্দ গেল ঘরে।
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে।

এক একদিন প্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ঘরের মেঝেতে মুখ ঘষিয়া রক্তারক্তি কাণ্ড করেন, কখনো বা গভীর নিশিতে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া উদ্দাম প্রেমাবেশে বাহির হইয়া পড়েন। স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহাকে নিরস্ত করেন, কখনো তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের মিলনের রসমধুর শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া তোলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী পার্ষদ ও প্রেমিক ভক্ত নরহরি সরকার একটি পদে শ্রীচৈতন্যের এসময়কার বিরহ যাতনার বর্ণনা দিয়াছেন। স্বরূপ ও রাম রায়কে প্রভু বলিতেছেন যে, তাঁহার কৃষ্ণবিরহের মর্মব্যথা কেহই বুঝিতেছে না—

স্বরূপ দামোদর রাম রায়।
করে ধরি করে হায় হায়॥
কহে মৃদু গদ্‌গদ ভায।
ঘন বহে দীঘ-নিশাস॥
ধরম না বুঝে কেহ মোর।
কহে পহু হইয়া বিভোর॥
কেনে বা এ প্রেম বাড়াইলুঁ।
জীয়ন্তে পরাণ খোয়াইলুঁ

(পদকল্পতরু)

প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-খিন্ন জীবনের এই বারটি বৎসরে সহমর্মিতা, সময়োচিত শ্লোক বর্ণন ও সংগীতের মধ্য দিয়া স্বরূপ ও রামানন্দ তাঁহার যে সেবা পরিচর্যা করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল।

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় পার্ষদ, ব্রজরস সাধনার সার্থক সাধক, রামানন্দ রায়ের জীবনেও নামিয়া আসে ইষ্টবিরহের, গুরুবিরহের ঘন অন্ধকার। আনুমানিক ১৫৩৪ সালে মরজগতের সমস্ত বন্ধন তিনি ছিন্ন করেন, প্রবিষ্ট হন রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলাধামে।

স্বামী প্রেমানন্দ

রামকৃষ্ণমণ্ডলীর অন্যতম জ্যোতিষ্ক ছিলেন বাবুরাম মহারাজ—স্বামী প্রেমানন্দ। গুরুনিষ্ঠা, শুদ্ধাভক্তি ও মানব-প্রেমের দিক দিয়া এই সাধকের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। পরমহংসদেব ইঁহার সহজাত পবিত্রতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "বাবুরাম নৈকষ্য, ওর হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ, দেহে পাপকর্ম, মনে দুশ্চিন্তা হতে পারে না।" একদিন বলেন, "দেখলাম ও হচ্ছে শ্রীমতীর অংশ, ওর দেবীভাব।" বাবুরাম মহারাজের এই দিব্যপ্রেমময় শুদ্ধসত্ত্ব রূপটিই সেদিন স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহার গুরুর মানসপটে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রিয় গুরুভ্রাতা সম্বন্ধে অনেক সময় বলিতেন, "বাবুরাম অনন্ত ভাবময় ঠাকুরের শরীরের অংশ। আমি ওকে ঐ ভাবেই দেখি।"

তরুণ সন্ন্যাসী প্রেমানন্দের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ত্যাগ তিতিক্ষা ও কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ যেন মূর্ত হইয়া উঠে। ঠাকুরের মতো স্বামী প্রেমানন্দের হস্তও কাঞ্চনস্পর্শে হইত আড়ষ্ট ও সংকুচিত। দেবীর প্রণামী বা উৎসবাদির জন্য প্রদত্ত অর্থ স্বহস্তে তিনি স্পর্শ করিতে পারিতেন না, সঙ্গী সাধুদের কুড়াইয়া নিতে বলিতেন। নেহাত কখনো নিজেকে গ্রহণ করিতে হইলে, অঞ্চল পাতিয়া ধরিতেন, আর তখনি উহা মঠের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীর কাছে জমা না দিয়া তাঁহার স্বস্তি ছিল না।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের অন্তর্গত আঁটপুর বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থান। ঐ গ্রামে তারাপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের পুত্ররূপে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। তারাপ্রসন্ন বিত্তবান্ ব্যক্তি, আবার তেমনি ছিলেন ধর্মপ্রবণ। গৃহে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ স্থাপিত ছিলেন, এবং এই বিগ্রহের সেবাপূজা ভোগরাগের সুব্যবস্থা ছিল।

বাবুরামের জননী মাতঙ্গিনী দেবীও ছিলেন পরমা ভক্তিমতী। নয়নাভিরাম শিশু পুত্রটি হৃদয়ে যেন এক দিব্যলোকের বার্তা লইয়া উপস্থিত হয়। এই শিশুর জন্মের পূর্বে জননী নানা অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিতেন, বিস্মিত ও পুলকিত হইতেন। কখনও সূক্ষ্মদেহী দেবদেবীর আবির্ভাবে, কখনও বা অস্ফুট দিব্য সংগীত শ্রবণে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। তাই এই পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবার পর দেবতার এক বিশেষ কৃপা হিসাবেই তাহাকে তিনি গ্রহণ করিলেন।

বাল্যকালেই বাবুরামের পিতৃবিয়োগ হয়। ইহার পর কিছুকাল পর্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়েই তিনি লেখাপড়া করিতে থাকেন। অতঃপর উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় চলিয়া যান, সেখানে খুল্লতাতের অভিভাবকত্বে তিনি বাস করিতে থাকেন এবং শ্যামবাজারের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউসনে তাঁহাকে ভর্তি করা হয়।

এই স্কুলে তাঁহার সতীর্থ ছিলেন রাখাল, উত্তরকালের রামকৃষ্ণশিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ। রাখাল এবং এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (উত্তরকালে রামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা) সান্নিধ্যে আসার পর হইতে তাঁহার জীবনে শুরু হয় এক নূতনতর অধ্যায়।

সহজাত শুভ সংস্কার এবং ধর্মপ্রবণতা নিয়া বাবুরামের জন্ম। শুদ্ধসত্ত্ব কিশোর কি এক অজ্ঞাত তৃষ্ণায় চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান। হরিসভা ও সংকীর্তনের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রচুর, এজন্য তিনি নানা স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। কেশব সেনের ওজস্বিনী বক্তৃতা ও ধর্মপ্রেরণা তাঁহার তরুণ হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তুলিত। এই সময়ে একদিন জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায় দূর হইতে তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন ভিড়ের মধ্যে ঠাকুরের দিব্য মূর্তি তাঁহার অন্তরে রেখাপাত করে নাই।

ইতিমধ্যে বাবুরামের মাতা ও অগ্রজ তুলসীরাম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ভগ্নিপতি বলরাম বসু এবং ভগিনী কৃষ্ণভাবিনী দেবী ঠাকুরের চরণতলে আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এসব কথা তখনো বাবুরাম জানিতেন না।

বড় ভাই তুলসীরাম একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের দিব্য ভাবের কথা তুলিলেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি নাকি ভাব সমাধিতে ডুবিয়া যান।

"তুই একদিন যাবি নাকি তাঁকে দেখতে?" দাদা প্রশ্ন করেন। বাবুরাম সানন্দে সম্মতি জানান, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাওয়া আর ঘটিয়া উঠে নাই।

স্কুলের বন্ধু রাখালের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে সেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আসিয়া পড়ে। রাখাল কহিলেন, "আমি তো প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করছি রে।"

দক্ষিণেশ্বরের এই মহাসাধকের প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ জাগিয়া উঠে বাবুরামের মনে। তাই তাঁহার দর্শন মানসে রাখালের সঙ্গীরূপে তিনি একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বয়স তখন বিশ বৎসর।

ঠাকুর তখন দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে ধ্যানবিষ্ট হইয়া আছেন। কিছুকাল পরে রাখালের দেহে ভর দিয়া টলিতে টলিতে নিজ কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

ঐশ্বরিক ভাবে মত্ত, বাহ্যজ্ঞানহীন, মহাপুরুষের এই দর্শন বাবুরামের নয়ন সমক্ষে একটা নূতন দৃশ্যপট উন্মোচিত করে। যে অনুভূতি ও দর্শনের কথা এতকাল লোকমুখে শুনিয়াছেন এবং পুস্তকে পড়িয়াছেন, তাহারি প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেন সম্মুখস্থ ঐ সিদ্ধপুরুষের জীবনে।

কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইবার পর ঠাকুর বাবুরামের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। শুনিলেন, তাঁহার পরমভক্ত বলরামেরই আত্মীয়। আনন্দিত হইয়া ঠাকুর বলিলেন, "তুমি বলরামের আত্মীয়? তবে তো আমাদেরও আত্মীয়। তা বেশ, বেশ।"

কতক্ষণ পরে ঠাকুর বাবুরামকে নিকটে ডাকিলেন, বলিলেন, "এসো, আলোয় এসো। তোমার মুখখানি ভাল ক'রে দেখি।"

মুখ দেখার পর হাত পায়ের লক্ষণ মিলাইয়া দেখিলেন, কিছুক্ষণ হাতটি ধরিয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ বেশ ছেলেটি। বেশ।"

ঈশ্বরীয় কথাবার্তায় রাত্রি গভীর হয়। বাবুরাম, রাখাল এবং আর এক তরুণ ভক্ত রামদয়াল রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া যান।

কিন্তু শয়নের এক ঘণ্টার মধ্যেই ঠাকুর তাঁহার কক্ষের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। অর্ধবাহ্য অবস্থা। পরিধেয় বস্ত্রখানি বালকের মতো বগলে চাপিয়া ধরিয়াছেন, একেবারে উলঙ্গ। উৎকণ্ঠিত স্বরে রামদয়ালকে ডাকিয়া তুলিলেন, বলিলেন, "ওগো ঘুমুলে ? ছ্যাখো, নরেনের জন্য প্রাণটা গামছা নিংড়াবার মতো মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করতে বোলো। সে যে সত্বগুণের আধার। তাকে না দেখলে আমি থাকতে পারি না।'"

ঠাকুরের নানা অবস্থার সহিত রামদয়াল পরিচিত। বুঝিলেন, তিনি তখন দিব্য ভাবে আবিষ্ট। তাই নানা কথায় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্য বাবুরামের বুকে দোলা লাগাইয়া দেয়। একি অদ্ভুত প্রেম ঠাকুর রামকৃষ্ণের ! শুদ্ধসত্ব আধার তরুণদের জন্য এ কি আর্তি, একি ব্যাকুলতা ?

সে রাত্রে কিন্তু ঠাকুরের ভাবাবেশ আর কাটিল না। বার বার বাহিরে আসিয়া তরুণ শিষ্য নরেনের জন্য মর্ম-বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই আবার বাবুরামকে ডাকিয়া পাঠান ঠাকুর। ইহার পর ঘন ঘন যাতায়াতের মধ্য দিয়া উভয়ের আত্মিক বন্ধন গড়িয়া উঠিতে থাকে। কখনো সতীর্থ রাখালের সঙ্গে, কখনও মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিতেন। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের কাছে পাইয়া ঠাকুরের হৃদয়ও আনন্দে উচ্ছল হইয়া উঠিত, নানা তত্ত্ব, নানা ধর্মপ্রসঙ্গ নিয়া বিভোর হইয়া পড়িতেন।

বাবুরামকে এক এক দিন বুঝাইতেন, "মানুষের জীবন স্বাধীন কোথায় ? সকলই যে ঈশ্বরাধীন। কেশব সেনকে সেদিন বললাম, গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছে ছাড়া নড়ে না। ন্যাংটা (তোতা-

পুরীজী) অতবড় জ্ঞানী, সে জলে ডুবতে গেছলো। কিন্তু হাঁটু জলের বেশী গঙ্গায় তখন আর জল হয় না। মহামায়ার ইচ্ছা অন্যরূপ বুঝে তীরে ফিরে এল। তাই তো বলি,—মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী। আমি রথ, তুমি রথী!"

কথাগুলি বাবুরাম উৎকর্ণ হইয়া শোনেন, আর তাঁহার তরুণ হৃদয়ে সেগুলি চিরতরে অঙ্কিত হইয়া যায়।

বাবুরাম বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়া দক্ষিণেশ্বরে বেশীদিন থাকিতে পারেন না, অন্তরে তাই বড় দুঃখ। ঠাকুরের নিকট মাঝে মাঝে তাঁহার মনোবেদনা ব্যক্তও করেন। ঠাকুরও প্রার্থনা জানান ইষ্টদেবী ভবতারিণীর কাছে, "মা, ওকেও টেনে নাও, ও অত দীনভাবে থাকে। তোমার কাছে আসা যাওয়া করছে!"

রাখালের অসুখ, কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন না। ঠাকুরের নিত্যকার সেবার জন্য ভক্তগণ রহিয়াছেন, কিন্তু সমাধিস্থ অবস্থায় বিশেষ দেহরক্ষীর প্রয়োজন। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, আজন্ম শুদ্ধাচারী, বাবুরামের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সেদিন বলিলেন, "এ অবস্থায় কাউকেই ছুঁতে দিতে পারি না। তুই থাক্, তাহলে ভাল হয়।"

মুহুর্মুহু ঠাকুর মহাভাবে নিমগ্ন হইতেন। এই সময়ে বাবুরাম ছাড়া কেহ স্পর্শ করিলে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন। বাবুরামের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা ঠাকুরের দেবদেহের নিকষ পাথরে সেদিন এমনি ভাবে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছিল।

বাবুরামের মা একদিন পরমহংসদেবকে প্রণাম করিতে আসিলে ঠাকুর বলিয়া বসিলেন, "ওগো তোমার এই ছেলেটিকে ইখানকে দাও।"

মাতঙ্গিনী দেবী তো এ প্রস্তাব শুনিয়া কৃতার্থ, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "সে তো ভালো কথা, ঠাকুর। আপনার কাছে বাবুরাম থাকলে তার জন্য কোনো দুশ্চিন্তাই আর আমার থাক্‌বে না।"

গৃহের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়া গেল, তাই এখন হইতে বাবুরাম

দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। অবস্থিতিও দীর্ঘতর হইতে লাগিল। সম্মুখে প্রবেশিকা পরীক্ষা, কিন্তু পড়াশুনার মনোবৃত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের সম্মুখে আসিলেই এক দিব্য চেতনায় তাঁহার সমগ্র সত্তা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অতীন্দ্রিয় রাজ্যের হাতছানি আসে বার বার, অপার্থিব আনন্দে হৃদয় হয় ভরপুর।

কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বারী কঠোর, মাশুল আদায় না করিয়া সে পথ ছাড়িবে কেন? বাবুরাম অকৃতকার্য হইলেন। ঠাকুরের কানে এসংবাদ পৌঁছিল। অবলীলায় তিনি তা উড়াইয়া দিলেন, বলিলেন, "বেশ তো, ভালই তো। ও পাশমুক্ত হলো। জানতো,—যার য'টা পাস্, তার ততটা পাশ (বন্ধন)।"

বাবুরামের কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ্য নাই। ভাবিলেন, ভগবান মঙ্গলময়, এ তিনি ভালই করিলেন। স্কুলের বিদ্যা ছাড়িয়া বাবুরাম ধরিলেন আত্মিক জীবনের পথ।

পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার ও সহজাত পবিত্রতা নিয়া বাবুরামের জন্ম, তারপর দৈব কৃপায় লাভ করিয়াছেন ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর স্নেহময় সান্নিধ্য। এই সান্নিধ্য এবার তাঁহার সাধন প্রস্তুতির পক্ষে পরম সহায়ক হইয়া উঠে।

শিষ্য সম্বন্ধে সদাসতর্ক সদ্‌গুরু বাবুরামকে বুঝান—"ত্যাখ, ধর্মের গতি বড় সূক্ষ্ম। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সূতার একটু রোঁ থাকলে ছুঁচের ভেতর তা যায় না।"

কখনো বা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ঠাকুর বলিতে থাকেন, "সাধনের অবস্থায় কামিনী দাবানলের স্বরূপ, কালসর্পের সমান। সিদ্ধাবস্থায়, ভগবান দর্শনের পরে, তবে মা আনন্দময়ী। তখন মারই এক একটি রূপ বলে বুঝবি।"

তরুণ সাধকের হৃদয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের আচার আচরণ সত্যকার পবিত্রতা ও সাত্ত্বিকতার ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়।

উত্তরকালে বাবুরাম মহারাজ এসময়কার স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরের মেজেতে মাদুরে

শুয়ে আছি। রাত্রি দুপুর একটার সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, ঠাকুর ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে থুথু করে চারদিকে মুখামৃত ফেলছেন, আর বলছেন, 'দিসনি মা দিসনি মা।' মা যেন ধামা পুরে নাম যশ নিয়ে তাঁকে দিতে এসেছেন, তাই ঠাকুর বলছেন, দিসনি মা, দিসনি মা।"

পবিত্রচেতা নিরভিমান বাবুরামের অন্তর-পট হইতে ঠাকুরের যশ-বিতৃষ্ণার এ দুর্লভ চিত্রটি কোনোদিনই আর অপসৃত হয় নাই।

স্বাভাবিক জীবনের মমত্ব ও আত্মিকযোগ উভয়েরই মধ্য দিয়া ঠাকুরের স্পর্শ বাবুরাম এবং অন্যান্য তরুণ ভক্তদের উজ্জীবিত করিয়া থাকিত। একবার ঠাকুর ভক্ত মণি মল্লিকের গৃহে কীর্তনরঙ্গে মাতিয়াছেন। মাতৃনামে মত্ত ও আবিষ্ট অবস্থায় দীর্ঘ সময় কোথা দিয়া কাটিয়াছে সে দিকে হুঁশ নাই। হঠাৎ বাবুরামের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, বুঝিলেন, সে ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে। অথচ ঠাকুরের আগে সে কিছুতেই আহার করিবে না। নিজে ভোজন করিবেন বলিয়া ঠাকুর তখনি কতকগুলি সন্দেশ আনাইলেন। উহা হইতে কণামাত্র গ্রহণ করিয়া বাবুরামকে দিয়া দিলেন সবটা প্রসাদ। শুদ্ধসত্ত্ব তরুণ ভক্তদের প্রতি এমনি ছিল তাঁহার স্বাভাবিক মমত্ববোধ।

ঠাকুরের নির্দেশে, তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া, পঞ্চবটিমূলে গভীর রাত্রিতে বাবুরাম একটানা ধ্যানজপ করিতেন। সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে সুন্দর সুঠাম তনু, রক্তাম্বর পরিহিত, এই নবীন সাধক সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন।

সাধক বাবুরাম একদিন পরমহংসদেবকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহার যেন সত্বর ভাবসমাধি হয়। ঠাকুর ইষ্টদেবী ভবতারিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর কহিলেন, "বাবুরামের কথা মাকে আমি বললুম, তা মা বললেন, ওর ভাব হবে নি, ওর জ্ঞান হবে।"

কিন্তু অন্যান্য গুরুভাইদের কাহারো কাহারো ভাবসমাধি হইতেছে, বাবুরামের মনে তাই স্বস্তি নাই। ঠাকুরের কাছে প্রায়ই তিনি কাঁদাকাটি করিতেছেন। ঠাকুর পড়িলেন মহা বিপদে। অন্তরঙ্গ

ভক্তদের বলিতে লাগিলেন, "তাই তো কি হবে। এটা (ভাবসমাধি) না হলে যে ও আর আমায় মানবে নি।" ভাবখানা এইরূপ, যেন বাবুরাম নামক নবীন সাধক অভিমানভরে তাঁহাকে না মানিলে এই ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষের আর উপায় নাই। আসল কথা, বাবুরাম ঠাকুরের আত্মার আত্মীয় হইয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার মান অভিমানের ভয়ে তিনি অনেক সময় থাকেন শঙ্কিত।

নবীন শিষ্যদের সম্বন্ধে ঠাকুর ধ্যানে যাহা জানিয়াছিলেন মাস্টার মহাশয়ের কাছে একদিন তাহা খুলিয়া বলিলেন, "বাবুরামকে দেখলাম —দেবীমূর্তি। গলায় হার, সখী সঙ্গে।···স্বপ্নে ও কি পেয়েছে; ওর দেহ শুদ্ধ, একটু কিছু করলেই ওর হয়ে যাবে।"

কিছুদিন পরের কথা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন বাবুরামকে নিকটে ডাকিলেন, তারপর তাঁহার মুখে কারণের ছিটা দিয়া বলিলেন, "যা, আজ তোর পূর্ণাভিষেক হয়ে গেল।" শিষ্যদের দিব্যশক্তি বা চৈতন্য প্রদানের ভঙ্গিটি ঠাকুরের এমনি সহজ ও অনায়াস ছিল।

কৃপাসিন্ধু ঠাকুর তাঁহাকে আরো কৃপা করিতেছেন না, ইষ্টদর্শন ও সমাধি ত্বরান্বিত হইতেছে না, এই ক্ষোভ মাঝে মাঝে আসিয়া যায় বাবুরামের মনে। ঠাকুর একদিন স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ছাখ্‌রে, পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটি পড়ে গেছে, জায়গাটি ঠিক ক'রে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়। শাস্ত্রের মর্ম গুরুমুখে শুনে নিয়ে তারপর সাধন করতে হয়। এই সাধন ঠিক ঠিক হলে তবে হয় প্রত্যক্ষ দর্শন।"

সাধক বাবুরাম সদ্‌গুরুর কৃপায় তাঁহার হারানো রত্নের সন্ধান জানিয়াছিলেন, সেটির উদ্ধার সাধনেও হইয়াছিলেন সক্ষম।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। অমাবস্যার তিথি ও কালীপূজার দিনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট রহিয়াছেন। হঠাৎ একসময়ে প্রিয় শিষ্য বাবুরামকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া সহাস্যে ধীরে ধীরে ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, "সব দেখলুম, কে কতদূর এগিয়েছে। রাখাল, মাস্টার, সুরেন্দ্র, বাবুরাম অনেককেই

দেখলুম।...সবাইর হয়ে যাবে দেখলুম। সব দেখলুম ঘুপটি মেরে রয়েছে।” বলা বাহুল্য, ভক্তেরা তাঁহার একথায় নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

ইহার পর ঠাকুর দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন। অন্যান্য ভক্তদের মতো বাবুরামেরও মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়ে। জীবনের একমাত্র পরম আশ্রয়টি নয়ন সম্মুখ হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া যাইতেছে। সাধক বাবুরাম এক একবার হতাশা ও বিষাদে ভাঙিয়া পড়িতেছেন। আবার কখনো উপলব্ধি করিতেছেন, ঠাকুর তাঁহার ভক্তদের কল্যাণের জন্যই এই উৎকট রোগ নিজ দেহে ধারণ করিয়াছেন। তরল ঔষধ ও পথ্য গলাধঃকরণে যাঁহার দুঃসহ দেহকষ্ট দেখা যায়, আবার ঐশ্বরীর প্রসঙ্গে অথবা সমাধিস্থ অবস্থায় দেখেন তাঁহার সেই দেহে অনির্বচনীয় দিব্য জ্যোতির প্রকাশ। বাবুরাম প্রায়ই এই দৃশ্য লক্ষ্য করেন, আর অন্তরে জাগিয়া উঠে ঠাকুরের অধ্যাত্ম-স্বরূপের প্রকৃত পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই একদিন জানাইয়া দেন, “এই গলার অসুখ, এরও একটা মানে আছে। এখানে বাড়ি ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত এবার এখানে দলে দলে আসছে। সকলে কি দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারতো?”

অতঃপর ঠাকুরকে কাশীপুরের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁহার সেবা-পরিচর্যাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম-সন্তানদল ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পান।

ঠাকুর তখন যেন ভক্তদল মধ্যে ঐশী-কৃপার এক অমৃত নির্ঝররূপে অধিষ্ঠিত।—শিষ্যদের বিশুদ্ধ আধারে আপন দিব্যশক্তি অকৃপণ করে তিনি ঢালিয়া দিতেছেন।

অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত বাবুরামও ঠাকুরের এই করুণাধারায় স্নাত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইতে থাকেন।

ভক্ত বুড়ো গোপাল এই সময় উত্তরাখণ্ডের তীর্থস্থান দর্শন করিয়া

ফিরিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, কয়েকটি সাধুকে ভোজন করাইবেন। ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন, "কোথায় আর সাধু খুঁজে বেড়াবি? এখানেই সব রয়েছে। এই ছোকরাদের খাওয়ালেই হবে।"

পরমহংসদেবের ইঙ্গিতমতো তিনি গেরুয়া বস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা, চন্দন, প্রভৃতি আনয়ন করিলেন। ঠাকুর স্বহস্তে অন্তরঙ্গ ভক্তদল, নরেন, রাখাল, বাবুরাম প্রভৃতিকে সন্ন্যাসবেশের এই সব উপকরণ বিতরণ করিলেন। বাবুরাম এবং তাঁহার গুরুভাইদের হৃদয়ে চরম ত্যাগের মন্ত্র চিরদিনের মতো ঠাকুরের কৃপায় অঙ্কিত হইয়া গেল।

এই সময়কার কথা উল্লেখ করিয়া বাবুরাম মহারাজ উত্তরকালে বলিয়াছেন, "আমাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কয়েকজনকে কিছু ক্রিয়া শিখাইয়া দিয়া ঠাকুর একদিন বলিলেন, যা এখন থেকে তোরা চণ্ডালের বাড়ি খেলেও দোষ হবে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর বরাহনগরে ত্যাগীভক্তদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল ঠিক করা হয়। ঠাকুরের আশীর্বাদ ও ভক্তদের প্রীতিবন্ধনের মধ্য দিয়া রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর উন্মেষ এবার ধীরে ধীরে ঘটিতে থাকে। অন্যান্য গুরুভাইদের সহিত ত্যাগ তিতিক্ষাপরায়ণ বাবুরামও এই সময়ে চরম পরীক্ষা প্রদান করেন। দারিদ্র্য ও অবহেলার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভক্তদলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের পথটি উন্মুক্ত হইতে থাকে।

এই সময়ে একবার নরেন্দ্রনাথ অন্তরঙ্গ গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়া বাবুরামের পিতৃগৃহ আঁটপুরে গিয়াছিলেন। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত্রিতে বাবুরামদের প্রাঙ্গণে সবাই ধুনি জ্বালাইয়া ধর্মালোচনা ও ধ্যানজপে বসিতেন। এইখানেই নরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সকলে স্থির করিলেন, ঠাকুরের অন্তরঙ্গ তরুণ ভক্তদের কেহই আর গৃহে ফিরিবেন না। নরেন্দ্রনাথের ত্যাগদৃপ্ত কণ্ঠ বাবুরাম প্রভৃতি গুরুভাইদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিল।

ধুনির সম্মুখে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ সেদিন বলেন, "ঠাকুরের প্রেরণা আমাদের ভাবী জীবনের ইঙ্গিত। তিনি যে ত্যাগমন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত ক'রে গিয়েছেন, আমাদের সকলের হস্তে গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে অঙ্গুলীসঙ্কেত করেছেন, সেই ত্যাগ-মার্গেই আমরা চলবো। ঠাকুরের সুমহান্ উদারভাব জগতে প্রচার করতে যদি আমাদের প্রাণ যায় তাও স্বীকার। তবুও আমরা ঘরে ফিরবো না।" ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মানসিক প্রস্তুতি এভাবে নরেন্দ্রনাথের এ সংকল্পবাণীর মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে।

আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসার পর সংসারত্যাগী ভক্তেরা বিরজা-হোম করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। পরমহংসদেব বলিতেন, "বাবুরাম শ্রীমতীর অংশে জন্মেছে।" সেই কথা স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নামকরণ করিলেন—স্বামী প্রেমানন্দ। রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে প্রেমঘন এক সিদ্ধসাধক রূপে অবস্থিত থাকিয়াই স্বামী প্রেমানন্দ তাঁহার দিব্য-প্রভাব বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন।

নবীন সন্ন্যাসীর দল পরমত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা ও আদিষ্ট ধ্যান জপে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহাদের এই সময়কার কঠোর তপস্যা ও ত্যাগ তিতিক্ষার পরীক্ষার কথাপ্রসঙ্গে প্রেমানন্দ মহারাজ উত্তরকালে প্রায়ই বলিতেন—"আজ যে এত বড়মঠ দেখছো; কোথায় এর আরম্ভ! ঠাকুর যখন অপ্রকট হ'লেন, লাটু আর কয়েকটি ছেলে কোথায় দাঁড়ায় তার স্থান নেই। শেষে সুরেশ মিত্তির বরানগরে একটি বাড়ি ঠিক ক'রে দিলেন। নিচের একতলাটা অব্যবহার্য, উপরের তলায় ছিল তিনটে ঘর। ঠাকুরের কোনোদিন বা দুটো নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হত, কি আর জুটবে? একবেলা ভাত কোনোদিন জুটতো, কোনোদিন জুটতো না। থালা বাসন তো কিছু নেই। বাড়ির সংলগ্ন বাগানে লাউ গাছ, কলা গাছ ঢের ছিল কিন্তু দুটো লাউপাতা কি একখানা কলাপাতা কাটতে গেলে উড়ে মালী যা তা গাল দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হতো। তেলাকুচো পাতা সেদ্ধ আর ভাত, তা আবার মানপাতায় ঢালা—কিছু খেলেই গলা কুটকুট করতো।

স্বামী প্রেমানন্দ

এত যে কষ্ট তাতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ভক্তের সংখ্যা দুটি একটি ক'রে বাড়তে লাগল। পূজা ধ্যান সর্বক্ষণ চলছে।'

ঠাকুরের দেহান্তের পরেও প্রেমানন্দের উপর হইতে তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি অপসৃত হয় নাই। আলমবাজার মঠে ত্যাগী ভক্তেরা তখন বাস করিতেছেন। প্রেমানন্দজী আমিষ আহার করিতেন এবং যাঁহারা মাছ, মাংস ভোজন করিতেন তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। এসময়ে এক-রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, জ্যোতির্ময় মূর্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিতেছেন, "হ্যাঁরে শালা! তুই মাছ খাস্‌নি বলে বড় সাধু হয়েছিস, আর ওরা মাছ খায় বলে ওদের ঘেন্না কচ্ছিস? দাঁড়া, আজ তোর চোখ গেলে দেব।"

আতঙ্কে প্রেমানন্দ মহারাজের ঘুম ভাঙিয়া গেল। মাছ মাংস খাওয়ার জন্য যাহাদের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, প্রথমে মনে মনে তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর বাহিরে গিয়া তৎক্ষণাৎ দুই একটি মাছের আঁইস মুখে স্পর্শ করাইলেন। সেইদিন হইতে আমিষ-ভোজীদের তিনি আর নিন্দা করিতেন না।

পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাজ দিকে দিকে প্রসারিত হইতে থাকে। এ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের আরব্ধ কর্মের প্রধান ধারক বাহকরূপে চিহ্নিত হন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং প্রেমানন্দ। ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ প্যারিস হইতে স্বামী তুরীয়ানন্দকে লিখিয়াছিলেন,—"গঙ্গাধর, তুমি, কালী, শশী, নূতন ছেলেরা—এদের ঠেলে ঐ রাখাল ও বাবুরামকে কর্তা করে দিচ্ছি। গুরুদেব এদের বড় বলতেন।"

নিবেদিতার নিকট লিখিত এক পত্রেও দেখা যায় স্বামীজী লিখিতেছেন, "এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তারপর এ দায়িত্ব প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর পড়বে।"

স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধে মহাপুরুষ মহারাজ লিখিয়াছেন, "স্বামীজীর

অদর্শনের কয়েক বৎসর পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে মঠ ও মিশনের কার্যোপলক্ষে ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তখন বাবুরাম মহারাজই মঠের সমস্ত কাজকর্ম দেখিতেন। মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের নিত্য শিক্ষাদান ও সমাগত ভক্তমণ্ডলীদের ধর্মোপদেশ তিনি অতি প্রীতির সহিত প্রদান করিতেন। মঠের সাধু ব্রহ্মচারী এবং বাহির হইতে সমাগত ভক্তেরা সকলেই তাঁহার আদর যত্ন ও অমায়িক ব্যবহারে একবাক্যে বলিতেন যে, প্রেমানন্দ স্বামী যেন মঠের মা, অমন স্নেহ যত্ন আমরা কোথাও পাই না। কিরূপভাবে মঠ চালাইতে হইবে, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কিরূপে ঠাকুরের ভাব প্রচার করিতে হইবে, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা বিশেষ করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তিনিও তাহা নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা পূর্বক অনেক পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন।"

মঠ ও মিশনের ধারক শক্তি এবং সূত্রধাররূপে স্বামী প্রেমানন্দের সাধনা কাজ করিয়া যাইত। ঠাকুর পূজা, ভাঁড়ারের কাজ ও নূতন ব্রহ্মচারীদের সহিত আলুর খোসা ছাড়ানো ও গোবর পিণ্ড পাকাইতে যেমন তাঁহার উৎসাহ ও দক্ষতা ছিল, নূতন মঠবাসীদের ধ্যান জপ ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেও তেমনি ছিল তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি।

সেদিন একদল ব্রহ্মচারী সাধু জপধ্যান সারিয়া ঠাকুর ঘর হইতে বাহির হইতেছেন। ইঁহাদের একজন স্বামী প্রেমানন্দকে প্রণাম করা মাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি রে, ডোমপাড়া থেকে এলি?"

প্রকৃতপক্ষে সেদিন ঠাকুরঘরে বসিয়া এই তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহার মনকে জপে বসাইতে পারে নাই, নিষিদ্ধ বিষয়বস্তুতে তাহা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। প্রেমানন্দজীর মন্তব্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল। এভাবে এই অন্তর্যামী সন্ন্যাসী তরুণ সাধুদের রক্ষা করিতেন, পরম স্নেহে ও যত্নে তাহাদের অধ্যাত্ম-প্রগতির পথ খুলিয়া দিতেন।

শুদ্ধাভক্তি ও প্রেমভক্তির সাধনায় নবাগত সাধুদের প্রেমানন্দজী উদ্বুদ্ধ করিতেন, আশ্বাস দিতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপার কথা বলিয়া।

শুধু উপদেশ দিয়াই মহারাজ ক্ষান্ত হইতেন না, নিরভিমানতা ও প্রেমের জীবন্ত আদর্শ নিজ জীবনে রূপায়িত করিয়া দেখাইতেন।

সেবার এক উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সমবেত হইয়াছেন। উঠানের উপর জুতা রাখিয়া মঠের চারিদিকে সবাই ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছেন। হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠিল। নূতন দুই তিনজন ব্রহ্মচারী আগন্তুকদের পাদুকাগুলি হাতে না উঠাইয়া পায়ে ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে দিতে থাকে। প্রেমানন্দ মহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, বলেন, "ভক্তের জুতা মাথায় ক'রে তুলবি, তা না তোরা পায়ে ক'রে তুলছিস্। জানিস্ না, ভক্তই ভগবান, ভক্তের সেবাই ভগবানের সেবা? সাধু হতে এসেও অহমিকা গেল না, বাবা! এই অহঙ্কার দূর করবার জন্য সাধক অবস্থায় ঠাকুর নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও কাঙালীদের এঁটো পাতা মাথায় ক'রে গঙ্গার জলে ফেলে আসতেন; কৈবর্তদের পায়খানা লুকিয়ে সাফ করতেন। আর তোদের বুঝি অপমান বোধ হয়, ভক্তের জুতা হাতে ক'রে সরাতে? অহঙ্কার ভিতর থেকে না গেলে ভগবান লাভ হবে কি, চাঁদ?"

মঠ ও মিশনের শ্রীবৃদ্ধি ক্রমে বাড়িতে থাকে। ইহা দর্শনে মাঝে মাঝে এই বৈরাগ্যবান্ সাধকের অন্তরে শঙ্কার আলোড়ন উঠিত। সেবার এক ভক্তকে তিনি লিখেন, "সাধু হয়ে আবার এই ঘর বাড়ি ক'রে থাকা—কি সব আমরা করছি! এ ঘোর বিড়ম্বনা, মহামায়ার প্যাঁচ। অবিদ্যা কত রকমের ফাঁদই পেতে খেলাচ্ছেন তার ইতি-অন্ত নেই। রক্ষা করো ঠাকুর রক্ষা করো!"

কখনও কখনও তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, "ঠাকুর ছিলেন, ত্যাগীর বাদশা। 'আজ যদি ঠাকুর পুনরায় দেহ ধারণ ক'রে এখানে আসেন, মঠধারী আমাদের সব গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে দিতে বলবেন, 'বেটারা সব মঠধারী সাধু হয়েছিস, বেরো শালারা।' "

আবার তখনই তাঁহার মনে পড়িত ঠাকুরের প্রচারিত আদর্শ সম্পর্কে স্বামীজীর ব্যাখ্যান ও ভাষ্য। বলিতেন, "ঠাকুরের অবর্তমানে আমরা যে রকম কঠোর তপস্যা করেছিলাম, এখনকার ছেলেরা তা

পারবে না বলে স্বামীজী এই মঠ তৈরি করলেন, সাধকদের চাট্টি ডাল ভাতের ব্যবস্থা ক'রে। কলিতে অন্নগতপ্রাণ কিনা।"

বেলুড় মঠে আগত একটি ভিখারীকে একবার স্বামী প্রেমানন্দ দয়াপরবশ হইয়া একটি কচি লাউ প্রদান করেন। ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া ব্রহ্মানন্দ মহারাজ প্রেমানন্দকে ডাকাইয়া কহেন, "বাবুরামদা, ওকে ওটা দিয়েছো কার হুকুমে ?"

প্রশ্নটি শুনামাত্র ক্রুদ্ধ প্রেমানন্দজী একখানি গামছা কাঁধে করিয়া মঠ ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। ফটকের সামনে আসিয়াছেন, এমন সময় ঘটে এক বিস্ময়কর অলৌকিক কাণ্ড। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্ম মূর্তিতে আবিভূ ত হন তাঁহার সম্মুখে, তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন, "কোথায় যাচ্ছ, চাঁদ ?"

অভিমানাহত প্রেমানন্দজীর ক্ষোভ দুঃখ মুহূর্তে কোথায় চলিয়া গেল। সদ্‌গুরুর কৃপার স্পর্শে তখন তাঁহার দেহ পুলকাঞ্চিত, নয়নে প্রেমাশ্রুর ধারা। মনে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন, এই মন্দির, মঠ এবং চতুর্দিকস্থ যাবতীয় বস্তু, ভক্তদের দেহ মন প্রাণ, সমস্তই প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের—কাহারও কোনো পৃথক অস্তিত্বই নাই। কৃপাসিন্ধু নিজে আবির্ভূত হইয়াই সেদিন তাঁহাকে এ তত্ত্বটি বুঝাইয়া গেলেন।

ছুটিয়া গিয়া তখনি তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, কহিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ মহারাজ, এ সবারই তো মালিক ঠাকুর। তুমি ঠাকুরের সন্তান, স্বামীজী তোমাকে তাই সব অধিকার দিয়ে গেছেন। আমি কে ? তাঁর দাস মাত্র।"

নিরভিমান, প্রেমঘন প্রেমানন্দকে ব্রহ্মানন্দ পরম স্নেহে করিলেন আলিঙ্গনাবদ্ধ। অতুল ভাব সম্পদের অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন সত্তাটি প্রেমানন্দ মহারাজের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তো স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমময় দেহে দর্শন করিতেন ঠাকুরের দেহাংশ।

স্বামীজী মঠবাসী সাধুদের প্রায়ই বলিতেন, "বাবুরাম মহাসিংহ।

আমার কাছে কুঁচ্‌কে থাকে বলে ওকে সামান্য মানুষ মনে করিস নি। পরে ওকে দেখে বহু লোকের চৈতন্য হবে। ওর মতো প্রেমিক ঈশ্বর-বিশ্বাসী তুনিয়া ঘুরে দেখতে পারবি কিনা সন্দেহ। রাখাল, বাবুরাম এরা প্রত্যেকে ধর্মশক্তির এক একটি কেন্দ্রের মতো।"

অপর গুরু ভাইরাও স্বামী প্রেমানন্দের প্রতি নিবিড় ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। স্বামী সারদানন্দ অসঙ্কোচে একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর ঈশ্বরকোটি বলে তোমাদের নির্দেশ করেছেন, তোমরা হুকুম করবে, আর আমরা পালন করব।"

মৃত্যুর পূর্বে শশী মহারাজ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, এই প্রিয় গুরু-ভ্রাতারই পাত্রাবিশিষ্ট ভোজনের জন্য অনুরোধ জানান। এসময়ে তাঁহার এক সেবককে বলিয়াছিলেন, "বাবুরামদা ও ঠাকুর আলাদা নয়, বুঝলি! বাবুরামদা'র প্রসাদ ঠাকুরের প্রসাদ। দে তুই আমায় তাঁর প্রসাদ দে।"

গুরুভাইরাই শুধু যে এই মহাপুরুষকে চিনিয়াছিলেন তাহাই নয়, তাঁহার প্রেমের স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া বহু সাধু, ভক্ত ও গৃহীজনের চৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে, নূতনতর অধ্যাত্ম-সত্তায় তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

সদাই প্রেমিকের ভাবময়তা ও দৈন্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলেও এই সার্থক সাধকের মধ্যে দেখা যাইত সত্যকার আত্ম-প্রত্যয় ও বলিষ্ঠতা। মঠের তরুণ ভক্তদের উদ্দীপিত করিয়া প্রায়ই বলিতেন, "নাহং নাহং নাহং, তুঁহু, তুঁহু, তুঁহু, যতক্ষণ এইভাব ঠিক ঠিক না হয়, ততক্ষণ আয় মা সাধন সমরে!"

একবার মালদহের এক উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া প্রেমানন্দ বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার বক্তব্যের নির্যাস ছিল, জীবের সেবা ও ত্যাগ তিতিক্ষাই ধর্ম। ভাষণ শেষে কয়েক জন শ্রোতা বলিয়া উঠেন, "আমরা প্রেমভক্তি সাধন সম্পর্কে শুনতে চেয়েছিলাম আপনার মুখ থেকে। তাই আমাদের বলুন।"

সুপ্ত সিংহ যেন গর্জিয়া উঠিল। প্রদীপ্ত নয়নে দৃঢ়কণ্ঠে স্বামী প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে শুনবে, কাকে বলবো প্রেমভক্তির কথা ? বলতে পারেন আপনারা, প্রেমভক্তির কথা শুনবার অধিকারী কে আছে এখানে ?"

"হাজার হাজার লোকের মধ্যে এমন অধিকারী কি একজনও এখানে নেই," বলিয়া উঠেন এক ভক্ত শ্রোতা।

প্রেমানন্দ মহারাজ আত্মপ্রত্যয় ভরা কণ্ঠে বলিয়া চলিলেন, "তাই যদি না বুঝবো তো এতকাল সাধু হয়েছি কেন ? মুখ দেখেই সব বুঝতে পারি। তাহলে শুনুন এক কাহিনী : এক অভিনব পশারী প্রেম ফিরি ক'রে যাচ্ছে,—প্রেম, প্রেম নেবে গো, প্রেম ? লোকের ভিড় জুটে গেল দুধারে। মূল্য কি ? পশারী হাঁকলো—'মাথা ! হ্যাঁ, প্রেম নিতে হলে মাথা দিতে হবে।' প্রেমভক্তির কথা আপনারা শুনতে চান। উত্তম। কিন্তু এজন্য যে মাথা দিতে হবে। সর্বস্ব ত্যাগ করতে কেউ রাজী আছেন ? সর্বস্ব বিলিয়ে দিলে তবেই না এর অধিকারী হওয়া যায় !"

বিস্মিত জনতা উদ্দীপিত সিংহের আননের দিকে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

ত্যাগপূত প্রেমের এই একনিষ্ঠ সাধনা রামকৃষ্ণশিষ্য বাবুরাম মহারাজের জীবনে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রেমসিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার প্রেমের স্পর্শে বহু অঙ্কুরকে পরিণত করিয়াছিলেন বনস্পতিতে।

তরুণ কর্মী ও সাধকেরা ছিলেন প্রেমানন্দ স্বামীর প্রাণস্বরূপ। ইহাদের এক একটি হৃদয়কে প্রেমাবেগে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে, এক একটি জীবনকে প্রেমে পুণ্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে কি অপার ধৈর্য ও নিষ্ঠা নিয়াই না তিনি সদা তৎপর থাকিতেন। বেলুড় মঠের প্রকাশিত স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলীতে তাঁহার অন্তরঙ্গতার সুরে ভরা চিঠিপত্রগুলিতে ইহার পরিচয় মিলে।[১]

---

১ স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী : প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
২৭।১১।১৪

পরমস্নেহাস্পদেষু—

তোমরা হৃষীকেশে অনেকগুলি জুটেছ—গাজন নষ্ট না হয়। লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইও না। এইটি বিশেষ নজর রাখবে। তোমরা সবাই সিদ্ধ হয়ে যাও, শ্রীশ্রীপ্রভুর ও পরম উদার স্বামীজীর নাম নেবার উপযুক্ত হও। তোমরা বঙ্গদেশের আদর্শ ত্যাগী, এইভাবে তোমাদের জীবন প্রস্তুত করিতে হবেই হবে। কেবল পরের ঘাড়ে তীর্থে ভ্রমণ, উত্তম ভোজনও দুচারটি বচন ঝাড়বার জন্য তোমাদের জন্ম নয়। ঘোর তপস্যায় লেগে যাও, অভিমান ধ্বংস ক'রে বস্তু লাভ ক'রে তবে ফিরবে। ভারত, কেবল ভারত কেন, সারা ভুবন তোমাদের দেখে অবাক হবে, আচার্যের স্থানে বসাবে। তবেই তোমরা বেলুড় মঠের সাধুভক্ত। নতুবা পেটের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোরা সাধু হিন্দুস্থানে প্রচুর। হও পবিত্র, হও অকপট, আর প্রাণ থেকে প্রার্থনা কর, প্রভু রক্ষা কর, প্রভু রক্ষা কর বলে। পরম দয়াল প্রভু বল দেবেন, বিশ্বাস দেবেন, শ্রদ্ধা দেবেন। অন্তর থেকে ডাক, তিনি শুনবেনই শুনবেন। রা—, অ—, গি—, প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে ও তুমি জানবে। আমি ভাল এ বড়াই রাখিনে। আমি এসেছি শিখতে—শেখার শেষ নেই, অন্ত নেই। ঠাকুর আমাদের সৎ মন বুদ্ধি দিন্—এই প্রার্থনা।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
প্রেমানন্দ

মঠ বেলুড়
২৯।৬।১৫

পরম প্রীতিভাজনেষু—

…তোমার সেবা-শুশ্রূষা দেখিয়া কে না মোহিত হইবে? "সেবা বন্দি আউর অধীনতা, সহজে মিলি রঘুরাই।"

সেবা কি একটা সামান্য জিনিষ! ঠাকুর গাইতেন—"আমার ভক্তি যেবা পায়, সে যে সেবা পায়, তারে কেবা পায় সে হয় ত্রিলোকজয়ী।"

ভয় কি? তুমিও ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে ত্রিলোক জয়ী হয়ে যাচ্ছো। খুব ঠাকুরের ও ভক্তের সেবায় লেগে থাক। ধন্য হয়ে যাও, কৃতার্থ হয়ে যাও। ভয় ডর দূর হয়ে যাক। তোমাদের দেখে লোকে বলুক্ এরাই পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দেবতা। খালি দীন হীন হলে হবে না। মহাবীর হনুমানের মত রামভক্ত প্রাণ অন্তর্বহিঃরাম-গত প্রাণ হতে হবে। ঠাকুর তোমাদের সব ভার নিয়েছেন। তোমাদের ঐ সখের ভাবের চাক্‌রী টাক্‌রীগুলোর ভাবনা ক'রো না। তুমি ওসব ভার ভগবানের উপর দিয়েছ। নির্ভীক হয়ে থাক।

শুভাকাঙ্ক্ষী
প্রেমানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়
২৮শে ভাদ্র, ১৩২২

পরমস্নেহাস্পদেষু—

আমি দেখছি তোমাদের উপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা। তুমি একান্তে একা একা বেশ আছ, প্রাণভরে প্রভুকে ডেকে যাও। সিদ্ধ হও, জীবন্মুক্ত হও, ভক্তি-প্রেমে উন্মত্ত হয়ে মেতে যাও। লোকে ভাল বলুক মন্দ বলুক, খেয়াল ক'রো না। এই জীবনে এই শরীরে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার চাইই চাই। তখন তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে ভগবদ্বাণী—অহঙ্কার, অভিমান, দেশ ছেড়ে পালাবে।

দেখছ না মানুষে কি চায়? কেবল চায় ঐহিক সুখ-সম্পদ ভোগ ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বর আছেন ক'জন প্রাণ থেকে বিশ্বাস করে? আর যদি বিশ্বাস করে, ক'টা লোক তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়? বাবা! যা লোকমান্য, কামিনী কাঞ্চন দিয়ে রেখেছেন, এ ছাড়িয়ে উঠে এমন বীর কটা আছে?

সৃষ্টি অনন্ত, ভাব অনন্ত। অপরের দোষ দেখতে দেখতে আমাদের ভিতর সেই দোষ ধীরে ধীরে এসে পড়ে। আমরাও লোকের দোষ দেখতে কিংবা, দোষ শোধরাতে আসি নাই, এসেছি

কেবল শিখতে। সর্বদা পরীক্ষা করিব কি শিখিলাম। চতুর্দিকে দেখ্‌ছ ত কত বিজাতীয়, কত বিধর্মী ভাব রয়েছে। তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার বল? এসেছি আম খেতে, পেট ভরে আম খাবার চেষ্টা করা যাক্। এই ভাল। আর তোমার আমার কথা লোকে কৃপা ক'রে শুনে মাত্র। নিজেদের ধারণা কত হল তারই ঠিক নাই, তা আবার অন্যে নিলে কিনা জান্‌বার ইচ্ছা। ভুলের উপর কি ভুল! এসে পড়েছি কোথায়, একবার চিন্তা করি এস। প্রচারের কাজ নাই। এখন পালাতে পাল্লে হয়। বাপ্। ভাগ্যক্রমে এ সময়টায় এসে পড়া গেছে, তাই রক্ষে, নতুবা চারিদিকে ত কেবল দাবানল, বাড়বানল, আর জঠরানল। এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে তুমি কি করতে পার? পার যদি প্রেমিক হও, আনন্দ পাবে, শান্তি পাবে।

'প্রেমিক চায় নাক' জাতি, চায় না সুখ্যাতি, সে ভাবে পূর্ণ, হয় ক্ষুণ্ণ রট্‌লে অখ্যাতি। আবার চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হ'লে, আসমানেতে বানায় ঘর। প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর। ও ভাই, থাকে না তার আত্মপর।'

সে মানুষের দোষগুণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভাল বেসে বেসে মরে; মরেই বা কেন? ভালবাসায় যে অনন্ত জীবন—অমরত্ব লাভ হয়। একবার দ্বাপরে প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধারানী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের লীলা দেখিয়ে অমর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা, এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভালবাসা অমূল্য ধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ন লুটে নিয়ে আণ্ডিল হয়ে যাই। এই জিনিষ লড়াই ক'রে কেড়ে নিবার যো নেই—অবশ্য পশুবলের কথা বলছি জান্‌বে। বিশ্বাস-বল, শ্রদ্ধা-বল চাই এ ধন লাভ করতে হলে। সম্মুখে ঠাকুরের আদর্শ জীবন, তোমরা কতই ভাগ্যবান্। কিন্তু মা সব ভুলিয়ে দেন, গুলিয়ে দেন, এই এক মহা মোহ। তবে শরণাগতকে রক্ষা করেন, সদ্বুদ্ধি, সৎমন সৎসঙ্গ দানে।

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ

বেলুড় মঠে প্রতিদিন পাঠ হয়। এই পাঠের কাজ যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয় এবং সবাই নিষ্ঠাভরে ইহাতে যোগ দেয় এজন্য প্রেমানন্দ স্বামীর উৎসাহের সীমা ছিল না।

সেদিন অনেকে সময় মত আসেন নাই। প্রেমানন্দজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তোদের আজ এত দেরি হ'ল কেন? রোজ রোজ এমনিভাবে ডেকে বসাতে হবে নাকি?"

সকলেই চুপচাপ। একজন তরুণ সাধু কৈফিয়ৎ হিসাবে বলিলেন, "সময় মত আসব কি, মহারাজ, এখানে যত বাইয়ের লোক আসে ও থাকে। তাদের মধ্যে এমন সময় কেউ কেউ বা শুয়ে থাকে, কেউ বা ঘুমিয়েও থাকে।"

স্বামী প্রেমানন্দ মমতা ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "আহা! আহা! এরা ঘুমুবে না? এমন ঘুম আর কোথায় হবে? এমন মুক্তবায়ু, গঙ্গার হাওয়া কোথায় আছে? জানিস্, সংসারে এদের কত চিন্তা ভাবনা, কত জ্বালা যন্ত্রণা? জ্বলে পুড়ে এখানে আসে একটু প্রাণ জুড়াতে, শান্তি পেতে। এমন শান্তির স্থান আর কোথায় আছে? বলছিস এরা সব ঘুমায়! আর ঘুমোলেই বা। তোরা সব আছিস কি করতে! তোরা সব বাড়ি ঘর ছেড়ে, সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে এসেছিস যে জাগাতে রে। ঠাকুর, স্বামীজী এসেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে জাগাতে। তোরা যে সব তাঁদেরই কাজ করতে এসেছিস। তোরা যে এই মোহানিদ্রাগ্রস্ত দেশকে জাগাবি—এই জগৎকে জাগাবি। আর এই কয়জন লোককে জাগাতে পারবি না? তোদের জাগ্রত দেখলেই যে এদের সব ঘুম ভেঙে যাবে।"

দেখা গেল, কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে দিব্য প্রেমের আভা, চোখ দুটি পরম করুণায় ছলছল। সকলেরই হৃদয়ে স্পর্শ লাগিয়াছে এই প্রেমের, নতমস্তকে নীরবে তাঁহারা বসিয়া আছেন। বেশ কিছুটা কাল পাঠকক্ষে বিরাজিত রহিল এক অপূর্ব নিস্তব্ধতা। স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমপূর্ণ এবং ওজস্বিনী বাণীর অনুরণন তখনো চলিতেছে শ্রোতাদের অন্তরে।

এ সময়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও বাণী বাংলার দিকে দিকে এমন কি গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যদের দর্শনের জন্য, তাঁহার লীলাকথা শোনার জন্য সবাই সমুৎসুক। এ সময়ে ঠাকুরের নব ভক্তদের নিকট হইতে আহ্বান আসিলেই প্রেমানন্দজী তাহাদের কাছে ছুটিয়া যাইতেন, জাগাইয়া তুলিতেন অপূর্ব আত্মিক প্রেরণা। পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া ঢাকা এবং ময়মনসিং জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে সহস্র সহস্র ভক্ত তাঁহার পুণ্যময় সান্নিধ্য পাইয়া উপকৃত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার এই জয়জয়কার দেখিয়া এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন :

"...আমরা দুই তিন দিন হইল ঢাকা প্রভৃতি ঘুরিয়া মঠে ফিরিয়াছি। পূর্ববঙ্গে শ্রীশ্রীপ্রভুর লীলার ধুম দেখিয়া আনন্দিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। ও দেশের ছেলেরা বেশ মেতেছে ঠাকুর ও স্বামীজীর নামে। আসুক আরও উৎসাহ—অদম্য উদ্যম। যাক্ ভেসে দেশ ভক্তি প্রেমের হিল্লোলে! ভাবের বন্যা আসুক, ডুবে যাক্ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান; কেউ না বাদ যায় চুনো পুঁটি পর্যন্ত; দ্বেষাদ্বেষি দূর ক'রে মাতুক ইউরোপ, আমেরিকা ভাব, মহাভাব লাভ করতে। সায়েন্স (জড় বিজ্ঞান) আনন্দ ও শান্তি প্রচারে নিশ্চয়ই অক্ষম। ঠাকুরই ছদ্মবেশে শান্তির পথ দেখাবার জন্য, মূর্খের সাজে এসেছিলেন, পাণ্ডিত্যের গর্ব চূর্ণ করবার জন্যই তাঁর আবির্ভাব। হও সরল, মন মুখ এক ক'রে তাঁর চিন্তা কর। এই শরীরেই প্রভুর দর্শন লাভ ক'রে ধন্য হতে হবে তোমাদের। তাঁর নামে অসীম শক্তি অনুভব করবে। আসুক তোমাদের ভিতর দৃঢ়তা। বিশ্বাস কর—তোমাদের মধ্যেই অনন্ত শক্তি বিদ্যমান। ভগবান্ তোমাদের মধ্যে মহত্ত্ব ও উদারতা দিন—এই প্রভুর নিকট প্রার্থনা[১]।"

সেবাকর্ম যে শুধু দুমুঠো অন্ন বিতরণের জন্য নয়, মহত্ত্ব ও দেবত্ব দিবার জন্য, এই তত্ত্বটি মিশনের কর্মীদের হৃদয়ে সদাই তিনি গ্রথিত করিয়া দিতেন। একটি পত্রে এ সম্পর্কে লিখিতেছেন :

১ স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী : প্রকাশক, স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

...গতকল্য রাত্র হতে এখানে বেশ বৃষ্টি হয়েছে। বোধহয় তোমাদের ওখানেও এই বৃষ্টি বাদ যাবে না। বিশ্ব-বিধাতা ভগবান্ না দিলে মানুষের দানে লোকের অভাব কখনই মিটে না। এই সব দুঃখ কষ্ট রোগ শোকের মধ্যেও প্রভুর লীলা দেখবার চেষ্টা কর। তিনি পরম কল্যাণময়। আমরা মাটির খেলনা নিয়ে ভুলে আছি। কামিনী কাঞ্চন, মান ইজ্জত পেয়ে সব বিস্মরণ! তাই কৃপানিধান দয়া ক'রে মহামারী দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ আমাদের মধ্যে 'বহুজন হিতায়' আনেন। শেখ, দেখে দেখে কেবল শিক্ষা কর। কেবল মাত্র দুমুঠো চাল দেবার জন্য ঠাকুর তোমাদের ওখানে পাঠান নাই—মহত্ত্ব ও দেবত্ব দেবার জন্য। উচ্চমন, উদার হৃদয় কেমন ক'রে লাভ করতে হয় শিখে নাও। এমন সুযোগ আর পাবে না। এযুগের অবতার বলেছেন, 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।' এভাব প্রত্যক্ষ কর, মানবজীবন ধন্য কর, স্বামীজীর কৃপায় তোমরা আদর্শ জীবন লাভ কর। বুঝছ না আমরা কি এখানকার কর্তা?' ভগবৎ শক্তির বিকাশ এখানে, সেই শক্তিবলে তোমরা ঐ সব কাজ করতে সমর্থ। জান না কি, স্বামীজী লিখে গেছেন, 'তিনি সূক্ষ্ম দেহে এই সঙ্ঘের মধ্যে বর্তমান?' বিশ্বাস কর সেই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষের আদর্শবাণী। বিশ্বাস কর! তোমাদের কর্ম-পাপ কেটে যাবে, পরাভক্তি লাভ হবে, জীবন্মুক্ত হয়ে যাবে। কি হে! তোমরা কি সাধারণ লোক? ভুলে গেছ কি যে আদ্যাশক্তির কৃপা লাভ করেছ? জগতের কটা লোকের এ সুযোগ সৌভাগ্য হয় বল? আমার খুব ভাল লাগে 'নাহং নাহং' ভাব! আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি রথ তুমি রথী—কৃপাময় কেবল এইটুকু বোঝাচ্ছেন রোজ রোজ। মহারাজ বলেন—তোমাদের কোটি কোটি জন্মের তপস্যা হয়ে যাচ্ছে ঐ নিষ্কাম নিঃস্বার্থ কর্মে। এ কেবল স্তোকবাণী নয়, সত্যকথা জান্‌বে। হরিকে ধরে হরির শক্তিতে হরির সেবা করছ। ঐ মূর্খ জড়প্রায় গণ্ডগ্রামে ঠাকুরের লীলা দেখে অবাক হচ্ছ! এ কার ঐশ্বর্য মনে কর? এর মধ্যে কি কিছু শিখ্‌বার নেই? বলি, তুমি

কে মাধাই দাস যে লোকে তোমার মুখে ঠাকুরের কথা শুনতে উদ্‌গ্রীব ? এইখানেই প্রভুর শক্তির বিকাশ। তুমিও সেই দেববাণী শুনাতে মেতে যাও নাকি ? সাধন ভজন কার নাম ? অনন্ত আকাশে লম্বা লম্বা কল্পনা জল্পনা নিয়ে থাকলেই কি বড় হওয়া চলে ? কবিত্ব ছেড়ে কাজে লেগে যাও। জীবন দেখাও, আদর্শও রয়েছে সামনে, ভয় কি ? হও আগুয়ান, তোমরা লক্ষ্যস্থানে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে।

(পত্রাবলী : ঐ)

পবিত্রতা ত্যাগ বৈরাগ্য এবং মায়ামোহ বর্জনের উপর স্বামী প্রেমানন্দ অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেন। সেবার পূজায় মহা-অষ্টমীর দিন বেলুড়ে দোতলার বারান্দায় বসিয়া আছেন। জগজ্জননী মহামায়ার ভাবাবেশে তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম। আশে পাশে উপবিষ্ট ভক্তদের বলিতে লাগিলেন, "ভগবান কি জানিস ? পবিত্রতাই সাক্ষাৎ ভগবান্। ভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস যদি থাকে, তবে আর ভয় নেই। যা কিছু দরকার সব এসে যায়। সংসারটা কি রকম জানিস ? ঠিক কুকুরের লেজের মতো। তাকে যতই টানাটানি কর, সংসারের দুঃখ দৈন্য অশান্তি কখনো একেবারে দূর হবে না। সংসারে মিথ্যাচরণ, হিংসা, দ্বেষ আর রেষারেষি লেগেই আছে। আহা, মহামায়ার কি খেলা ! কেমনটি ক'রে বাহ্য চাকচিক্য দিয়ে সকলকে মায়ার মোহে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন। মায়ার ডোরে সব বাঁধা, তাই সকলে ভুলে আছে।"

ভক্ত ধীরেন্দ্র, উত্তরকালের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেদিন নিবেদন করেন, "মহারাজ, কিভাবে থাকব একটু দয়া ক'রে বলে দিন।"

"কিভাবে থাকবি ? খুঁটি ধরে থাকবি—পবিত্রতারূপ খুঁটি।" গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিয়া উঠেন প্রেমানন্দ স্বামী।

"মাঝে মাঝে 'আমি আমার' এই অভিমান, অহঙ্কার কত কিছু যে উঁকি মারে !"

দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "কেন ? ফোঁস্ ফোঁস্ ভাব একটু থাকবে না ? নইলে যে কাজ হয় না। তবে ভেতরটা খুব নরম

কোমল রাখা চাই। বাইরে একটু শক্ত থাকবেই। জানবি আর বলবি—আমি প্রভুর দাস, আমায় মঠের সকলে ভাল ব'লে জানেন, আমি কি এর বিরোধী ভাব নেব! আমি ঠাকুরকে ডাকি, তাঁর কথা ভাবি, তবু শালা খারাপ ভাব আসবি? এভাবে আবার নিজেকেও ফোস্ ফোস্ করতে হয়।"

একবার জনৈক জিজ্ঞাসু ছাত্র মহারাজকে প্রশ্ন করে, "ঠাকুরের লীলাকথা যা শোনা যায়। এসব ব্যাপার না দেখলে যেন বিশ্বাস হতে চায় না। আর বিশ্বাস না হ'লে তো সবই মিথ্যা।"

স্বামী প্রেমানন্দ উত্তরে বললেন, "আচ্ছা, আদালতের জজ তো ভাল সাক্ষীকে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে বিশ্বাস করেন। মনে কর্ তুই জজ—আর আমি সাক্ষী। আমি বলছি, আমি সচক্ষে দেখেছি, ঠাকুরের কি অপূর্ব ভাব, কি তীব্র ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কর্ম! সবই কি সকলে দেখতে পায়রে? কেউ দেখে, কেউ শোনে, কেউ বা পড়েও বিশ্বাস করে। চাই বিশ্বাস অচল অটল। সরল বিশ্বাস না হলে কিছুই হয় না। একটি ছেলে বি-এ পড়ে, বীরভূম জেলায় বাড়ি। বে-থা করেছে। আমায় মাঝে মাঝে পত্র দেয়। কয়েকদিন হ'ল আমায় লিখেছে—ভয়ানক ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে, খুব অশান্তি ভোগ করছে। কাতর হয়ে আমায় আশীর্বাদ করতে লিখে। আমি তাকে লিখি—তুমি ঠাকুরের শরণাপন্ন হও, আমি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি তোমায় শান্তি দিন। পত্র পেয়ে কি সুন্দর উত্তর দিয়েছে।

তখনি একজন ব্রহ্মচারীকে ঐ পত্রটি আনয়ন করিতে বলিলেন। সেটি পড়িয়া তৃপ্তির হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কেমন সুন্দর লিখেছে—উপদেশ অনুযায়ী ঠাকুরের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে ডাকা অবধি দেখছি চাঞ্চল্য কোথায় দূর হয়ে গেছে—ইন্দ্রিয়গুলি যেন কেঁচো হয়ে আছে, ইত্যাদি। চাই বিশ্বাস, বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহুদূর। বুঝলি[১]।"

১ স্বামী প্রেমানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর, হুগলী

সে-বার এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, "মহারাজ, সহজে ঈশ্বরের ধারণা কি ক'রে হয় ?"

সাধনোজ্জ্বলা বুদ্ধি আর গুরুনিষ্ঠার দিক দিয়া প্রেমানন্দজী ছিলেন অনন্য। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি উত্তর দিলেন, "ঈশ্বর-ফিশ্বরের হোম্‌রা-চোম্‌রা একটা ধারণা না ক'রে ঠাকুরকে ডাক্। তাঁকে স্মরণ মনন কর্, তাঁকে ধ্যান কর্। ঠাকুরের শরণাপন্ন হোস্ না কেন ? তিনি যে কল্পতরু, বাবা ! ঠাকুর স্বামীজীরই অন্ত পাই না, তা আবার ঈশ্বর ! ঠাকুরের বিষয়ে স্বামীজীই কি কম গোঁড়া ছিলেন ? কৃষ্ণই বল, চৈতন্যই বল, বুদ্ধই বল, আর যার যার কথাই বল না কেন, এমনটি আর হয় নি। ঠাকুর সর্বভূতে চৈতন্য দেখতেন। দূর্বার ওপর দিয়ে কোনো কিছু নিয়ে গেলে, দাগ পড়লে তিনি কষ্ট পেতেন, নূতন কাপড় চড়চড় ক'রে ছিঁড়তে প্রাণ পড় পড় ক'রে উঠত। সমাধি অবস্থায় কোনো অপবিত্র লোক ছুঁতে পারত না।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে মহারাজ এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। সকলেই অবাক বিস্ময়ে নির্নিমেষে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার কথা শুরু করিলেন, বলিলেন ঠাকুরের একদিনকার দিব্যভাবের উদ্দীপনার কথা, "আহা ! প্রভুর কি অপার দয়া ! আমার মাকে (গর্ভধারিণীকে) লক্ষ্য ক'রে একদিন ঠাকুর বলছেন—যদি কিছু মানত করতে হয় তবে এখানে (ঠাকুরের নিজ শরীর দেখাইয়া) মানত করলেই সব হবে। চাই বিশ্বাস। বিশ্বাস শেষ জন্মের লক্ষণ।"

মঠ ও মিশনের কাজ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর প্রদর্শিত পথে শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শটি স্বামী প্রেমানন্দ সারা মনপ্রাণ দিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধৃতির পিছনে ছিল সদ্‌গুরুর কল্যাণবহ কৃপা। অনেক সময় এই কৃপার স্পর্শ ঠাকুরের অলৌকিক আবির্ভাবের মধ্যে দিয়াও তাঁহার জীবনে পৌঁছিয়াছে।

একবার দু' একজন নবাগত ব্রহ্মচারীকে পুনঃপুনঃ চেষ্টা সত্ত্বেও যথোচিত পথে আনিতে না পারিয়া মহারাজ অত্যন্ত ব্যথিত হন।

তিনি তাহাদিগকে যাহা বলিতেন, তাহারা তাহা মানিয়া চলিতে পারিত না; ফলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সকল নবাগত অবাধ্য ছেলেদের লইয়া ঘর করা এক বিড়ম্বনা। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলেও তাঁহার বিড়ম্বনার শেষ হইল না, তাঁহার সস্নেহ উপদেশাদি যেন ব্যর্থ হইল। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া মঠ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। একদিন মঠ ত্যাগ করিবার জন্য মঠের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, কিন্তু কোথায় যাইবেন কিছুই কিন্তু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। ফটকে আসিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া ফটকে দণ্ডায়-মান। বাবুরামকে মঠ পরিত্যাগে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "হ্যাঁরে বাবুরাম, আমায় ফেলে তুই কোথায় যাচ্ছিস?" তৎক্ষণাৎ বাবুরাম মহারাজ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।[১]

নূতন গৃহীভক্ত ও সন্ন্যাসী সাধক, উভয়ই স্বামী প্রেমানন্দের নিকট হইতে সাধন সম্পর্কিত উপদেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণবহ চিঠিপত্রে ইহার অজস্র প্রমাণ মিলে। একটি চিঠিতে এক ভক্ত মহিলাকে মহারাজ লিখিতেছেন:

মা—তোমার চিঠি পড়িলাম। মার নিকট হইতে দীক্ষা লইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। জগৎকে কৃপা করিবার জন্য তাঁর মানব দেহধারণ।

ভা-এ আশ্রমস্থাপন করতে ইচ্ছা করেছ উত্তম। তবে নিজ নিজ দেহ মধ্যে আশ্রম স্থাপনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 'ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের বৈঠকখানা'—শ্রীশ্রীপ্রভুবাক্য। কেবল বাক্য নয়, প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যদি মানুষ হতে পার, তবে টাকার অভাব হবে কেন? কেবল অর্থের জন্য অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হয়ে সর্বভূতে ভগবান দর্শন ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করবার চেষ্টা কর। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর—জীবের মোহান্ধকার ঘুচাবার শক্তি এক তাঁহারই। হীনের হীন

১ স্বামী প্রেমানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম, আঁটপুর হুগলী।

তুমি আমি। ভগবানের কৃপায় কেমন ক'রে আমাদের মোহান্ধকার ঘুচবে, তাহারই চেষ্টা করা দরকার। আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান, এইটি উপলব্ধি করবার জন্য যে কর্ম তাহা বন্ধনের জন্য নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, বন্দনা, রোদন, নিবেদন ইত্যাদিতে কৃপালাভ হয়। পবিত্রতাময় প্রীতি ও ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে যাক তোমাদের জীবন। দেহটা দেবমন্দিরে পরিণত করো, আদর্শ জীবন দেখে লোকে অবাক হয়ে যাক্, ইহাই তো শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে তুমিও জানবে না আমি একটা বড় কাজ করছি। আমি আমার অভিমানই অবিদ্যা মোহ। প্রভুর কৃপালাভে মোড় ফিরিয়ে দাও, দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে।

বা—কে বিশেষ ক'রে পড়াশুনা করতে বলবে। অধ্যয়নে সাধ্য সাধনের সহায় হবে। সে বালক—তাকে বুঝিয়ে দেবে, মূর্খ হলেই ভক্ত হয় না। ভাবপ্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক হলেই হয় না, বাবা। ভাব শক্তি কি ছড়াছড়ি যাচ্ছে ধন? ধর্ম কর্ম ছেলেমানুষি ব্যাপার? শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার জন্য, মানের জন্য, অর্থের জন্য যে শিক্ষা সেটা কুশিক্ষা, আর ধর্ম লাভের জন্য, শাস্ত্রপাঠের জন্য, শাস্ত্রের মর্মার্থ উপলব্ধির জন্য যে শিক্ষা তাহা সুশিক্ষা, ইহা অবশ্য অবশ্য কর্তব্য[১]।"

অপর একটি চিঠিতে মহারাজের প্রেমভক্তির ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। তিনি লিখিতেছেন, "মালা জপা ভাল, তুমি ঠাকুরের নাম ক'রে যাবে—আমাদের অত বিধি মানতে হবে না। যারা মানে মানুক। আমাদের চাই রাগ মার্গের ভজন সাধন,—যেমন ছিল ব্রজগোপীদের। 'সখি, তোদের হল কথার কথা আমার যে অন্তরের ব্যথা, আমার ত না গেলে নয়।' হতে হবে ব্যাকুল, উন্মাদ এরই নাম রাগ মার্গের ভজন। এখন ভগবৎ কৃপায় ভক্তি প্রেমের বান এসেছে ঠাকুরের আবির্ভাবে। যাও ভেসে, যাও মেতে, ভয় নাই, ভয় নাই। দাও

১ পত্রাবলী: ঐ

ঝাঁপ—অমর হবে। হে জীব, নবজীবন লাভ করো, নূতন রাস্তায় এগিয়ে চল। জয় শ্রীপ্রভুর জয়, জয় শ্রীভক্তের জয়।"

নূতন সাধকদের জীবনে অশান্তির জ্বালা ও নৈরাশ্য মাঝে মাঝে আসিয়া দেখা দেয়, তাহাদের আত্মিক প্রস্তুতির ভিৎ-ও অনেক সময় নড়াইয়া দেয়। ইহাদের জন্য স্বামী প্রেমানন্দের বলিষ্ঠ আশ্বাসবাণী তাঁহার বিভিন্ন পত্রে রহিয়াছে :[১]

"তোমার পত্র পেয়ে সকল অবগত হলাম। ঠাকুরের কথা তো পড়েছ?—'খানদানি চাষা' হতে হবে। একবছর ধান হল না বলে যে হাল গরু বিক্রি ক'রে বসে থাকতে হবে, তার মানে কি? লেগে থাকতে হবে। ধ্যান জমবে না বলে একেবারে হতাশ্বাস হওয়া ভক্তের লক্ষণ নয়। ভক্ত প্রভুকে সুখে দুঃখে, রোগে শোকে, শান্তি অশান্তিতে, সকল সময়েই ধরে থাকে। জানতো, 'মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, আর জগৎগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে'—একথা ঠাকুর বলতেন। সেই জগৎগুরুকে ধরে থাকতে পারলে তিনি শুদ্ধা বুদ্ধি দেন, তাঁহার পাদপদ্মে অনুরাগ, প্রেম প্রভৃতি দান করেন। অতএব যে সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন রাখে তার আর কিসের দরকার।"

গুরু, ইষ্ট, ধ্যান, জপ প্রভৃতি সম্পর্কে নবীন ভক্ত সাধকদের যে সব চিঠিপত্র তিনি দিতেন, তাহা ছিল তাহাদের সাধনপথের পরম সহায়ক :

"...তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু মধ্যে মেদিনীপুর গমন করায় উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। বড় বড় সাধকেরও জপ ধ্যানে বসিলে মন চঞ্চল হয়, উহা কেবল তোমার নয়। এজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা, বন্দনা কখনও বা ধীরভাবে মনকে তাড়না করিতে হয়। আবার মন যে স্থানেই যাক না কেন সর্বত্রই ব্যাপক-ভাবে আমার ইষ্ট রহিয়াছেন, বুঝিতে হয়।

উহাতে কোনো ভয়ের কারণ নাই জানিবে, ঈশ্বর কৃপায় যেদিন মন স্থির সেইক্ষণেই সমাধি। গুরু ও ইষ্ট মূলত একই জানিয়া ধ্যান

১ পত্রাবলী : ঐ

করিবে। যখন যেটি ভাল লাগিবে তাতেই ধ্যান করিয়া যাও। পরে তোমার মন শুদ্ধ ও নির্মল হলে ঐ মনই গুরু হয়ে সব বলে দেবে। পদ্ম এখন থাক্। হৃদয়ে ধ্যান করিয়া যাও। যিনি গুরু তিনিই ইষ্ট, যখন যেটি খুশী ধ্যান করো, তাতে দোষ নাই। একটিতে নিষ্ঠা এলেই হল। ধৈর্যের সহিত অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়ের দমন করার নাম—ব্রহ্মচর্য। বাহিরের সংস্কারে কি হইবে?"

"...তোমার চিঠি পড়িলাম। তোমার ধ্যান শীঘ্রই হইবে, কোনো ভয় নাই। যে ভগবানকে চিন্তা করে ঈশ্বরই তাহাকে ধ্যান করবার শক্তি ও সামর্থ্য দেন। সৎসঙ্গ, সৎমন, সৎবুদ্ধিও তিনি প্রেরণ করেন। তুমি ধ্যান করিতে বিরত হইও না। মনই সৎসঙ্গ, সদ্‌গুরুর কাজ করিয়া রাস্তা দেখাইয়া দিবে। অবসরমতো তোমার পত্র পাইলেই উত্তর দিব। তুমিও সকল কথা নির্ভয়ে খুলে লিখিও কোনও ভয় ভাবনা নাই। যাহারা ঈশ্বর বিশ্বাসী তাদের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম, ক্রোধ করবে কি? চিন্তা করবে আমরা ভগবৎ-দাস, বিশ্বনাথের সন্তান, মদনান্তক শূলপাণির ছেলে। তবেই দেখবে ঐ কামক্রোধগুলো দেশছাড়া হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা।—

রাম রম্ভা তিলোত্তমা যদি মন ছলে,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মন কভু নাহি টলে।

এই মহামন্ত্র সর্বদা আওড়াবে, সব শঙ্কা চলে যাবে।

যে রূপ তোমার ভাল লাগে তাহা হৃদয় মধ্যে বসাইয়া ধ্যান ক'রে যাও। একটু জোর ক'রে মশারীর মধ্যে বসিয়া ধ্যান করিও। অভ্যাস হ'য়ে গেলে ধ্যান না ক'রে থাকিতে পারিবে না। উহাতে মজা পাইবে। তোমার খুব ভক্তি বিশ্বাস হউক ইহাই শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট আমার প্রার্থনা। ভগবান তোমায় রক্ষা করুন সর্বদা।"

"...এরই মধ্যে অত উতলা হচ্ছ কেন? ঠাকুর একটি গান গাইতেন—

"মন কর পণ প্রাণাবধি, ত্যজ মান অপমান,
জ্যান্তে মর, সহজ মানুষ ধরবি যদি।"

দেখ, বাবা, যদি কোনো কাজে সিদ্ধি চাও তার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কত্তে হবে ; নতুবা ঠাকুরের নাম নিয়ে আর কেবল হৈ-চৈ ক'রে এই মহামূল্য জীবনটা বৃথা নষ্ট করা কি তোমার মতো আক্কেলবন্ত লোকের সাজে ? যখন লেগেছ তখন নিশ্চয়ই ওটাকে পাকা ক'রে তবে অন্য কাজ। কথামৃতে কি পড় নাই, চাষার ক্ষেত্রে জল আনার বিষয় কি রোক্। কি নিষ্ঠা! কি ত্যাগ! এ যে জ্বলন্ত জীবন্ত ব্যাপার! ঐ উপদেশগুলো কি কেবল পুস্তকেই থাকবে না কাজে দেখাতে হবে ? তোমাদের যে এক একটা আদর্শ নিয়ে লক্ষ্য স্থির ক'রে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে। যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভই যে তোমাদের প্রভুর শিক্ষা। এসেছ যখন এ ঘরে, নাম যদি লিখিয়ে থাক এ খাতায়, তখন তো আর পেছুলে চলবে না চাঁদ ? ঐ স্থানে বসে কেবল একমনে সর্বসিদ্ধিদাতা প্রভুকে ডেকে যাও, সব পাবে। সব পাবে কোনো ভয় নাই, কোনো চিন্তা নাই। দেখ্‌চ না, ভগবৎ-শক্তি তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সর্বদা বিদ্যমান! তাছাড়া, শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজীর সম্বন্ধে তোমরা পড় নাই কি ? কেমন ক'রে নিঃসম্বলে একা বন্ধুহীন দেশে গিয়ে কি কাজ ক'রে এলেন ? এ কি সত্য না স্বপ্ন ? তোমরা কি সেই মহাপুরুষের অনুসরণ কত্তে প্রস্তুত ? নতুবা যাও, যেমন সহস্র সহস্র সাধু এই ভারতে কেবল পেটের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!···যদি তোমার ও কাজ ভাল না লাগে যথা ইচ্ছা চলে যাও, তোমার সহিত আমাদের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। আমাদের ভালবাসা জানিবে।"

মঠের অতিথি-সৎকার, নবাগত ভক্তদের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সব কিছুর ভার নিয়া থাকিতেন প্রেমানন্দ স্বামী, তাই অনেকে বলিতেন,—এ যেন মঠের মা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে মঠবাড়ির বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া একখানি চেয়ারে তিনি অনেক সময় বসিয়া থাকিতেন। গঙ্গাবক্ষে কোনো নৌকা আসিতে দেখিলেই তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া

গঙ্গার ঘাটের সোপানের উপর থাকিতেন অপেক্ষমাণ। নৌকা ঘাটে ভিড়িবামাত্র আরোহীদের বলিতেন, "দেখগো, ঠাকুরঘর বন্ধ হয়ে গেছে। তোমরা গঙ্গায় স্নান ক'রে প্রসাদ পেয়ে বিশ্রাম করো। তারপর ঠাকুরঘর খুললে দর্শন ক'রো।"

একথা বলার পর তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেন রান্নাঘরে। উনুনে আগুন দিয়া, হাঁড়িতে জল চাপাইয়া তবে তাঁহার কিছুটা স্বস্তি। ভক্তেরা ছুটিয়া আসিয়া বলিতেন, "মহারাজ, এ আপনি কি করছেন? আপনি ওপরে যান, আমরা খাবার তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"

তিনি সহাস্যে বলিতেন, "আমার আর কি কাজ? এই ভক্ত-সেবাই আমার কাজ।"

ভক্তেরা জোর করিয়া রান্নার ভার নিয়া নিতেন, খিচুড়ি তৈরি করিয়া অতিথিদের খাওয়ানো হইত। সপ্তাহে চার পাঁচ দিন এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যাইত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই অসময়ে আসিয়া-পড়া আগন্তুকদের বিরুদ্ধে প্রেমানন্দজীর কোনো নালিশ ছিল না, মুখমণ্ডলে ছিল না কোনো বিরক্তির ভাব।

মঠের নিত্যকার কর্ম ও প্রেমানন্দজীর মধুর সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ করিয়া সত্যানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন, "তখন প্রত্যহ সকালবেলা কুটনো কুটতে সবাইকেই প্রায় উপস্থিত হ'তে হ'ত। সে সময় তিনি নানাপ্রকারে ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা ব'লে আমাদিগকে মুগ্ধ ক'রে রাখতেন। বাগানে তরিতরকারি আনার সময় সর্বদাই আমি তাঁর সঙ্গে থাকতাম। সেই সময় আমাদের মঠের সামনে বহু জেলেদের নৌকা থাকতো। তিনি বাগান থেকে ডেঙো ডাঁটা কুমড়ার ডাঁটা এনে তাদের ডেকে ডেকে দিতেন, আর তারা প্রায়ই দু'একটা ক'রে ইলিশ মাছ ঠাকুরের ভোগের জন্য দিত। তিনি বলতেন, "আমরা আর কি দিই—এর পরিবর্তে দেখ, ইলিশ মাছ দিচ্ছে। সদ্‌ব্যবহারই সাধুর ভূষণ।"

মঠের নূতন কর্মী ও সাধকদের প্রেরণা দিতে এবং উদ্দীপিত

করিয়া তুলিতে প্রেমানন্দজীর জুড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন :

...সর্বদা মনে রেখে চলিও যে, তুমি প্রভুর সন্তান, তাঁর দাস। তোমার মধ্যে যেন হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা স্থান না পায়। সহ্য করাই যেন তোমার জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন এই সহ্যগুণের এক অপূর্ব আদর্শ। ঠাকুর তাঁর সহিষ্ণুতার কত কথাই শুনিয়েছেন। শেষে কইতেন, 'শ, ষ, স—যে সয় সেই রয়, যে না সয় সে নাশ হয়। তিনটে শ, ষ, স কেন জানিস? হে জীব, সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর; আর না সইলে নাশ নিশ্চয়।' আমরা ঠাকুরের সংসারে শিখতে এসেছি এই—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

নারায়ণবোধে জীবের সেবা করতে আমাদের জন্ম; এই আমাদের সাধন, ভজন, ত্যাগ, তপস্যা। লোকের ভালমন্দ দেখবার আগাদের সময় কই? উহা আমাদের ধর্মবিকাশ।

সকলের সুবিধাজনক স্থান একটা চাই। দরিদ্র, দুর্বল, পতিত, মূর্খ—এদেরই আপনার ক'রে নিতে হবে। এও বলি—একদলকে ভালবাসতে গিয়ে অন্য বড় লোকদের ঘৃণা না করিয়া বসি। এদিকেও দৃষ্টি রাখবে। 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়' সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলতে হবে, বাবা—এই শ্রীশ্রীপ্রভুর ও বিবেকানন্দ স্বামীর শিক্ষা।

স্থায়ী স্থান দেখে যেতে তোমার ইচ্ছা, ইহার নাম দৃঢ় নিষ্ঠা। এই নিষ্ঠা না থাকলে মানুষ নিজের ও দেশের উন্নতি করতে পারে না। আমাদের দেশ কিরকম হবে জান? 'স্বদেশোভুবনত্রয়ম্।' এই একটা দেশ আমাদের নয়, সারা পৃথিবীই আমাদের দেশ, জানতে হবে। সমস্ত জীবের জন্য প্রার্থনা করতে হবে, কাজ করতে হবে। 'আমি' 'আমার'—অজ্ঞান, মোহ, ইহা দূর করা চাই। প্রভু তুমি, তোমার জগৎ, আমি তোমার একজন সেবক মাত্র। কথায় উদার

নয়, কাজে দেখাতে হবে। আবার ঠাকুরের পাত্‌কো কাটার নিষ্ঠা চাই—এক জায়গায়।

তুমি সাধনায় সিদ্ধ হও—ইহা আমার অন্তরের প্রার্থনা জানবে। আধা ক'রে ছাড়া ভাল নয়। তোমাদের দেখে লোকে অবাক হয়ে থাকবে না? না হ'লে ঠাকুরের নাম গ্রহণের বিশেষত্ব কি? যখন ভয় পাবে তখন ঠাকুরকে প্রাণভরে ডাকবে, তিনিই দয়া ক'রে শক্তি ভক্তি সাহস ও বল দিবেন।

নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ মানুষের প্রতি স্বামী প্রেমানন্দের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা ছিল অপরিসীম। বেলুড় মঠে নিধিয়া নামে এক পুরাতন ভৃত্য ছিল। গরু বাছুরের দেখাশোনার ভার ছিল তাহার উপর।

সাধু উমানন্দ লক্ষ্য করিলেন, নিধিয়া দুধ দুইবার পর ঘটিতে অনেকটা জল ঢালিয়া দিল। উদ্দেশ্য ঐ পরিমাণ দুধ সে চুরি করিবে।

স্বামী উমানন্দ তো মহাক্রুদ্ধ। পায়ের জুতা খুলিয়া অপরাধীকে তিনি মারিয়া বসিলেন। তারপর নিধিয়াকে উপস্থিত করা হইল প্রেমানন্দজীর সম্মুখে। উমানন্দ চাহেন তখনি এ ভৃত্যকে বিদায় দেওয়া হোক্‌।

মহারাজ তখন বলিলেন, শুন্‌লুম, "তুই তো ওকে জুতো দিয়ে মেরেছিস্‌, তাতে শাস্তি হয় নি? ও এতদিন মঠে আছে, ওকে এখন চাকরি হ'তে সরিয়ে দিলে ওর বাচ্চা-কাচ্চারা না খেয়ে ম'রবে। এ কথা একবারও ভেবেছিস? মানুষ তো আর সাধু হ'তে এবং তোদের এখানে চাকরি ক'রতে আসবে না। যা—নিধিয়াকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।"

নিধিয়াকে মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, "দুধে জল মিশিয়েছিস্‌?"

'হাঁ, মিশিয়েছি' বলিয়া প্রেমানন্দ মহারাজের পায়ে পড়িয়া সে কাঁদিতে লাগিল। মহারাজ বলিলেন, "যা, আর কোনো দিন এরূপ কাজ ক'রবি না,—আজ ক্ষমা ক'রলাম।"

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ একদিন প্রেমানন্দকে বলিলেন, 'বাবুরামদা—তোমার পায়খানাগুলি এমন নোংরা হয়েছে যে, আর যাওয়া চলে না! একটা ধাঙড়কে ডাকিয়ে এগুলি পরিষ্কার ক'রে ফেলাও।"

প্রেমানন্দ উত্তরে কহিলেন "ভাই, শীঘ্রই করিয়ে দেব।"

কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে ধাঙড়কে আর পাওয়া গেল না। অতঃপর একদিন দেখা গেল স্বামী প্রেমানন্দ নিজেই গামছা পরিয়া চুনের বালতি ও পোঁচড়া হাতে নিয়া পায়খানার দিকে যাইতেছেন। একজন নবীন সাধু তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত হইতে এগুলি লইতে গেলে তিনি বলিলেন, "ওরে, এসবই ঠাকুরের কাজ। আচ্ছা, তুই কর।" এইরূপ শত শত নিরভিমানিতার দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে রহিয়াছে।

এই নিরভিমানতা ও আত্মত্যাগ ও সহনশীলতার বাণী ছড়ানো রহিয়াছে প্রেমানন্দ মহারাজের লিখিত অজস্র পত্রে। এক ভক্ত কর্মীকে তিনি লিখিতেছেন :

…লোক চালান কঠিন ব্যাপার। বিশেষ শক্তি সম্পন্ন না হলে মুস্কিলে পড়তে হয়, অভিমান অহঙ্কার এসে জোটে। কৌশল হচ্ছে আমিত্ব ভুলে তুমিত্ব প্রতিষ্ঠা। 'তুমি কর্তা, আমি অকর্তা' 'ঈশ্বর বস্তু আর সব অবস্তু' এই সব প্রাণে ধারণা চাই। ভিতর বার ভালবাসায় পূর্ণ করতে হবে। আমায় ঠাকুর ভালবাসায় কিনে নিয়েছেন—আমাদের সবাইকেই তাই। অন্তর্বহিঃ ভালবাসা। গালাগাল মন্দও ঐ ভালবাসার জন্য। নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু। প্রভু আপনিই সব, গাল দিব কাকে? সবই যে তিনি, ধূলির একটু কম বেশী মাত্র। মঠে কোনও অশান্তি বা অমঙ্গল হলে সাক্ষাৎ শিব স্বামীজী আমায় গালাগাল দিতেন, কত মন্দ বলতেন। কিন্তু সে ভালবাসার অন্ত নাই, পার নাই, সীমা নাই। তখন ভাবতুম, কেন আমায় মন্দ বলেন আমার কি দোষ? এখন দেখছি স্বামীজী ঠিকই বলতেন, আমিই সকল দোষের মূল। এই দুষ্ট 'আমি'কে দূর করা চাই। নইলে নিস্তার নাই, কল্যাণ নাই। তার পর দেখছি আমার

দোষগুলো অনেকে আপনা আপনি বেশ নকল করতে শিখেছে; কিন্তু ভেতরটা দেখতে চেষ্টাই করে না। আর করবেই বা কি! একটা দোষের পুঁটুলি বই আর কি আছে আমার ভিতর, তাই তোরাও ঐ রকম হচ্ছিস্। যারা ঠাকুরের নাম করবে—তাদের জগৎজয়ী হতে হবে—আপনাকে প্রভুর পায়ে সম্পুর্ণরূপে বিক্রয় করতে হবে।

আশ্রমে যদি কোনো গোল বাধে, জানিস্ সে সব তোমার ও আমার দোষ। সব অপরাধ 'আমার' স্বামীজীর এই মত। চাঁদ, তুমি ভাল হও, আরও ভাল হও। আপন আপন দোষ্গুলি শুধরাতে চেষ্টা করো। ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে কাঁদ, প্রার্থনা করো। প্রভো! দয়া ক'রে গাদগুলো, ময়লা মাটিগুলো উড়িয়ে পুড়িয়ে দাও। অন্য উপায় নাই। ওখানে যদি কোনো অশান্তি আনয়ন করো সে দোষ তোমার জানবে। কি জন্য এ সাজ পরেছো মনে মনে সর্বদা বিচার করিও। পাগলামি ছেড়ে দাও, কিংবা ভগবানের নামে পাগল হও। খুলে যাক্ তোমার দিব্য দৃষ্টি প্রভুর দয়ায়। ভালবেসে সকলকে কিনে ফেল—এই হচ্ছে জ্ঞান, এই হচ্ছে ভক্তি নবযুগের। তোমরা আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—শুভাকাঙ্ক্ষী প্রেমানন্দ

ঢাকা-বিক্রমপুরের বিদ্গাঁয়ে সেবার শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিপূজা উপলক্ষে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্থানীয় ভক্তেরা প্রেমানন্দজীকে সেখানে নিয়া গিয়াছেন। সহস্র সহস্র ভক্ত সেখানে জড়ো হইয়াছেন, কিন্তু প্রসাদ পাইবার ঢালাও ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা করেন নাই। দর্শনার্থীরা নিজ নিজ ব্যয়ে ভোজন করিবেন ও উৎসবের আনন্দে অংশগ্রহণ করিবেন। প্রেমানন্দজীর ইহা ভাল লাগিল না, অন্তরঙ্গ ভক্ত ধীরেন্দ্রকে কহিলেন, "কারু সঙ্গে হয়তো আধ পয়সাও থাকবে না, এরা কি শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব দেখতে এসে এমনি ফিরে যাবে? হ্যাঁরে, যারা ভোগ দিয়ে খেতে পারবে না, কেউ কি তাদের খাওয়াবার ভার নেয় নি?"

"পাছে সমবেত ভক্তগণের কোনো অসুবিধা হয়, কেহ অভুক্ত থাকে, এই চিন্তায় প্রেমিক মহাপুরুষ অধীর হইয়া পড়িলেন, মনে

হইল তাঁহার যেন আহারে প্রবৃত্তি নাই। আহার প্রস্তুত, আসনে উপবেশন করিবেন তখনও এই কথাই বার বার বলিতেছিলেন। এমন সময় একজন সেবক আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুইজন ধনী ব্যবসায়ী উৎসবে সমাগত সকলকে যথাশক্তি সেবা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ যেন আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার শ্রীমুখে সরল হাসি দেখা দিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন "যা, বেশ হয়েছে সকলে জয়ধ্বনি দিগে যা।"

প্রেমানন্দ মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া একবার উত্তরবঙ্গ মালদহের ভক্তেরা বিরাট উৎসব সম্পন্ন করিলেন। মালদহের প্রসিদ্ধ ফজলী আম তখনো তেমন লাগে নাই। উৎসব শেষে মহারাজ বালক-ভক্তদের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া উদ্যোক্তাদের কহিলেন, "ঠাকুরের নামে উৎসব করতে এরা মালদহ এসেছে, আর আম খেয়ে যাবে না এ কেমন কথা?"

এক স্থানীয় ভক্ত বলিলেন, "এখনও এখানকার আমের সীজন হয় নি।"

মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "তা কি জানি, বাবু, কিন্তু এরা দেশে গেলে যখন এদের খেলার সাথীরা বলবে—মালদহে গিয়ে কেমন আম খেলি? তখন এরা কি বলবে? আম ছাড়া মালদহের উৎসব, তাও আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে সে কেমন হবে?"

আম ছাড়া উৎসব যেন প্রেমানন্দ স্বামীর ভাল লাগিতেছিল না। প্রতাপচন্দ্র শেঠ ওখানকার একজন বিরাট ধনী ও বহু বড় বড় আমবাগানের মালিক। উৎসবের সময় মহারাজকে দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া পড়িলেন। মহারাজ সস্নেহে শেঠজীর পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার উঠাইলেন ছেলেদের আম খাওয়ানোর কথা।

শেঠজী চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন, "শেঠজীর পেটে যা হাত বুলিয়ে দিয়েছি, দেখবি আম এল বলে—ঝুড়ি ঝুড়ি আম আসবে।"

তাহাই কিন্তু ঘটিতে দেখা গেল। অন্যান্য আমবাগানের মালিকদের সহিত পরামর্শ করিয়া শেঠজী পাকা আম সংগ্রহ করিবার ভার নিলেন। ফলে ঝুড়ি ঝুড়ি আম চারিদিক হইতে আসিতে লাগিল। সকলেই ইচ্ছামতো মত্ত হইল রসাল ফজলী ভক্ষণে।

উৎসব শেষে একদিন মহারাজ শেঠজীকে বলিলেন, "শেঠজী, ছেলেদিগকে নিজহাতে আম পেড়ে খেতে না দেখলে কি আনন্দ হয়? কাছে কি আপনার বাগান নেই?"

শেঠজীর আঁধুয়া পুষ্করিণীর চারিদিকে একটি অনতিবৃহৎ আম-বাগান ছিল। ঐ বাগানে বৃন্দাবনী ও অন্যান্য ভাল ভাল আমের গাছ ছিল। শেঠজী মহারাজার মনোরঞ্জনের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বিকালবেলা বাবুরাম মহারাজ অন্যান্য স্বামী ও অভ্যাগতদের শতাধিক লোক সঙ্গে লইয়া শেঠজীর আমবাগানে গেলেন। বাগানে প্রবেশ করিয়া সকলেরই বিপুল আনন্দ হইল। বাবুরাম মহারাজ সঙ্গীয় সকলকে মহাবীরের মতো আম পাড়িয়া খাইতে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। সকলেই ইচ্ছামতো আম খাইতে লাগিল। মহারাজের আনন্দ আর ধরে না। তিনিও নিজহাতে ছাতা দিয়া গাছের ডাল নোয়াইয়া ধরিয়া ছেলেদের আম পাড়িয়া লইতে বলিলেন।

শেঠজীও আনন্দে বিভোর হইয়া 'যে যত খেতে পারেন নিতে পারেন নিন' বলিয়া আরও আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত আম্রোৎসব চলিল[১]।

ভক্ত জীতেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "মহারাজ আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুই কি ডায়ল্যুট্ হয়ে যেতে পেরেছিস?' তিনি যে প্রেমে ঠাকুরের সহিত একেবারে ডায়ল্যুট হইয়া গিয়াছিলেন, একেবারে মিশিয়া গিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চিত। তিনি তাঁহার 'অহং'টাকে মারিয়া ফেলিয়া ঠাকুরের সঙ্গে যে এক হইয়া গিয়াছিলেন,

---

১ স্বামী প্রেমানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম।

ইহা তাঁহার প্রতিটি হাবভাব হইতে বুঝিতে পারা যাইত। তিনি সর্বদা 'নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ'—এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেন।

…সমস্ত দিন উৎসবের নানা বিষয় তাত্ত্বধান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মহারাজ একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর ভাবে লাল হইয়া গিয়াছে এবং এক দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল, জানালা দিয়া বহুলোকে একদৃষ্টে তাঁহাকে দেখিতেছিল। এমন সময় বাবুরাম মহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপর হইতে 'হরি ভাই'কে (স্বামী তুরীয়ানন্দ) ডাকিয়া আনিতে বলিলে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিচের ঘরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, "আপনি কেবল উপরেই থাকতে চান, মাঝে মাঝে নিচে নেমে আমাদিগকে দয়া করতে হয়।"

হরি মহারাজ বলিলেন, "আমরা কখনও উপরে আবার কখনও নিচে থাকি, কিন্তু তুমি তো নিচ-উপরের পার হইয়া গিয়াছ।"

"মঠের পশ্চিম দিকের বারান্দায় পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং বাবুরাম মহারাজ বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। আমি একাকী সেই সময়ে সেখানে গিয়া শুনিতে পাইলাম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ বাবুরাম মহারাজকে বলিতেছেন, 'তোমার এখনও একটু 'ইয়ে' আছে।' এই কথা বলিয়াই রাজা মহারাজ উপর তলায় উঠিয়া গেলেন।

ব্রহ্মানন্দজী উঠিয়া যাইবার সময় বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে শুনাইয়াই বেশ জোরের সহিত বলিতে লাগিলেন, "আমি সিদ্ধের সিদ্ধ, আমি নিত্যসিদ্ধ। আমি স্বামীজীর চেলা, স্বামীজীই আমাকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঠাকুরের কথা শুনাতে বলেছেন।" বুঝিলাম ঠাকুরের প্রচার সম্বন্ধে কোনো কথা তাঁহাদের মধ্যে হইতেছিল। ঠাকুরের লীলা ও শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার একটা ভাব বাবুরাম মহারাজের মধ্যে ছিল। তাঁহার মুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়া কত লোক যে ভক্ত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভক্ত জীতেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় প্রেমানন্দ মহারাজের নিজস্ব সিদ্ধি ও আত্মস্বীকৃতির এক প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাবুরাম মহারাজ কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। আমাদের মধ্যে একজন (প্রকাশবাবু) দীক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে ধমক দিয়া শ্রীশ্রীমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তদানুসারে তিনি ও আমি ১৯১৪ সনের ৺পূজার পরে একদিনেই শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ করি। ঐ বৎসরই হউক বা তাহার পরে একদিন বিকালবেলা আমি বেলুড় মঠে গিয়াছি। বাবুরাম মহারাজ উপর তলার বারান্দায় ছিলেন। আমি গঙ্গার উপর দিয়া মঠের বাড়িতে ঢুকিতেছি—বাবুরাম মহারাজ উপর হইতে আমাকে ডাকিয়া বসিলেন, 'প্রসাদ নিয়ে যেও।'

আমি ভিতরে গিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যে ঘরে থাকে সেখান হইতে প্রসাদ ধারণ করিয়া উপরে বাবুরাম মহারাজের নিকট গেলাম।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রসাদ নিয়েছ?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়াছি।'

তিনি তখন একজন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, 'ইহাকে প্রসাদ দাও।' জানিলাম উহা বাবুরাম মহারাজের প্রসাদ। এইভাবে তিনি নিজের প্রসাদ আর কোনো দিন আমাকে খাইতে দেন নাই।

প্রসাদ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট গেলে তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যিনি ঠাকুরের ভিতর ছিলেন, যিনি স্বামীজীর ভিতর ছিলেন, তিনিই এর ভিতর (অর্থাৎ তাঁহার নিজের ভিতর) আছেন।" এই প্রকার কথা তাঁহার মুখ হইতে পূর্বে আর কখনও শুনি নাই।

কালাজ্বরের আক্রমণে প্রেমানন্দজীর শরীর রুগ্ন ও দুর্বল হইয়া পড়ে। মঠের গুরুভাইরা শরীর সারানোর জন্য তাঁহাকে দেওঘরে পাঠাইয়া দেন। সঙ্গে গেলেন স্বামী সত্যানন্দ এবং অপর দুইটি সেবক। স্বামী সত্যানন্দ এ সময়কার কথা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন:

"দেওঘরে গিয়ে স্টেশনের গায়েই শচীনবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়িতে আমাদের স্থান হ'ল। ওখানে যাওয়ার পরদিনই বাবুরাম মহারাজ

তাঁর জিনিসপত্র দেখতে আরম্ভ ক'রলেন। তাঁর কোনো ট্রাঙ্ক বা স্যুটকেস থাকত না। তাঁর ছিল একটা ক্যানভাস-এর ব্যাগ, তাতে লোহার একটা তালাচাবি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো। দেওঘর গিয়েই ব্যাগটা অত্যন্ত বড় হয়ে গিয়েছে দেখেই—আমায় বললেন, 'কি রে! ব্যাগটা আমার এত বড় হয়ে গেছে যে!' তাতে আমি বললুম, শৌর্যেনবাবু ছ'টা আদ্দির ফতুয়া, ছ'খানা কাপড় ও চারখানা গামছা দিয়েছে।"

তখন তিনি বললেন, "তুই আমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে এ সব নিলি কেন?"

বলুলম, 'আপনার কটা জিনিসপত্র থাকে, আমার তো জানা নাই।'

তখন তিনি বললেন, "ছাখ, তোকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার সাধারণতঃ চারখানা ছ'হাতি কাপড়, চারটা ফতুয়া, দু'খানা গামছা ও একখানা গায়ের চাদর—এই ব্যাগে থাকবে। এর বেশী ব্যাগে রাখবি না। আর আমার নাম ক'রে যদি ভক্তদের কারও কাছে কোনো জিনিস বা টাকা পয়সা চাস্, তবে সেই মুহূর্তে তোকে আমার এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। আমি এ-সব পছন্দ করি না[১]।"

নিজের শরীর প্রায় বিধ্বস্ত, বেশীর ভাগ সময়েই শয্যাশায়ী থাকেন, তবুও আগন্তুক, অতিথি বা ভক্তদের সেবা পরিচর্যার জন্য প্রেমানন্দজীর দুশ্চিন্তার অবধি নাই। কলকাতার ট্রেন আসিবার সময় হইলেই তাঁহার সেবককে স্টেশনে পাঠাইয়া দিতেন। কহিতেন, "ছাখ তো কোনো ভক্ত এলো কিনা। এলেই ডেকে নিয়ে আসবি। স্টেশন থেকে ফিরে এসে তোরা খাবি, একটা হাঁড়িতে গরমজল বসিয়ে রেখে যা, যদি কেউ এসে পড়ে তার জন্য চারটি চাল চাপিয়ে দিবি।"

বেলুড় আশ্রমে থাকার সময় অতিথি ভক্তদের জন্য যেমন উৎকণ্ঠা তাঁহার ছিল, এখানেও ঠিক তেমনি।

১ স্বামী প্রেমানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দ আশ্রম।

মহাপুরুষ মহারাজ সেদিন পীড়িত গুরুভাইকে দেখিতে দেওঘরে আসিয়াছেন। একসময়ে রহস্যভরে কহিলেন, "বাবুরাম মহারাজ, তুমি দেখছি এখানে হোটেল খুলে বসেছ।"

উত্তর হইল, "তারকদা, বাবুরাম যতদিন থাকবে, তার হোটেল সঙ্গেই থাকবে। আমি তো এজন্য কারুর কাছে আধ পয়সা চাইনে। আমি দেখি, ঠাকুরই আনেন, ঠাকুরই খান, ঠাকুরই খাওয়ান। আমি তো দেখছি, ভক্ত ভগবান, ভাগবত—একে তিন, তিনে এক। যদি এ ব্যাটাদেরও এরূপ মতিগতি হয় তবে তো এরা ধন্য হয়ে যাবে।"

রুগ্ন প্রেমানন্দ মহারাজকে ভাল ভাল ফল খাওয়ানোর জন্য ভক্ত রামকৃষ্ণ বোস তখন মহা ব্যস্ত। প্রায়ই কলকাতা হইতে প্রচুর ফল মিষ্টি আনাইয়া দিতেন। মহারাজ একদিন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, "তুমি যে সতীশকে হিসাব শুনাচ্ছিলে, তাতে আমার মনে হচ্ছিল, রোজ আট দশ টাকার ফল খাচ্ছি। আমি সাধু, এরূপ ফল খেলে আমার প্রাণ বাঁচবে, এ কেউ বলতে পারে? আমার মনে হচ্ছিল, তুমি যেন আমাকে একদিন বিষ খাইয়েছ। কাল হতে আমি ফল টল আর খাব না। কোথায় আমরা গাছতলায় থাকবো, তা না—এইসব।"

এ কথা শুনিয়া রামকৃষ্ণবাবু প্রেমানন্দজীর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মহারাজ কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "এখানে থেকে গরীবদের অবস্থা দেখে আমার প্রাণ বড্ড ব্যাকুল হয়েছে। তুমি এদের কিছু লোককে এক পেট ক'রে দই চিড়া খাওয়াও আর একখানা ক'রে নতুন কাপড় দান করো।"

রামকৃষ্ণ বোস তৎক্ষণাৎ শিরোধার্য করিয়া নিলেন মহারাজের এই নির্দেশ।

প্রেমানন্দ স্বামীর শরীর ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে। ভবানীপুর গদাধর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা যোগেশ ঘোষ মহাশয় তখন

দেওঘরে। চিন্তিত হইয়া তিনি একদিন দেওঘরের সাধু বালানন্দ স্বামীকে নিয়া আসিলেন প্রেমানন্দ মহারাজকে দেখানোর জন্য। বালানন্দজী জড়িবুটি ও দৈবী চিকিৎসা জানিতেন। প্রেমানন্দ স্বামীকে পরীক্ষা করার পর তিনি কহিলেন, "মহাত্মা! সাধুর যদি শরীরের দিকে আকর্ষণ না থাকে তা'হলে শরীর কখনো থাকে না। আপনি দয়া ক'রে এ শরীরটার উপর একটু নজর দিলেই এটা সেরে যাবে।"

শান্তস্বরে প্রেমানন্দ বলিলেন, "দেখুন, আর এই শরীরটার উপর এখন একেবারেই মমতা নেই। আমার এ শরীরটাকে যেন একটা পচা কুমড়োর মতো মনে হচ্ছে। এটার কথা ভাবলেই যেন গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে, ওর দিকে কিছুতেই মন দিতে পারি না।"

বিদায় নিবার কালে বালানন্দ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের সেবকদের বলিয়া গেলেন, "এ শরীর থাকবে না—শীঘ্রই যাবে।" মহারাজকে কোনো দৈবী ঔষধাদি আর তিনি দিলেন না।

পূর্ববাংলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রচার করিতে গিয়া প্রেমানন্দ স্বামীকে অতি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় এবং সেখানকার জলো আবহাওয়ায় কালাজ্বরে তিনি আক্রান্ত হন। এই রোগের আক্রমণে ভুগিয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়ে এবং শেষ পর্যায়ে তাঁহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে আনিয়া রাখা হয়। এখানে আসার পর হঠাৎ তিনি আক্রান্ত হন মারাত্মক ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জায়।

এবার তাঁহাকে কলকাতায় বলরাম বসুর ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু এখানকার অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের প্রচেষ্টায় কোনো ফলোদয় হওয়া দূরে থাকুক, রোগের তীব্রতা দ্রুত বাড়িয়াই চলিতে থাকে।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই তারিখে সংকট শেষ পর্যায়ে আসিয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে ছুটিয়া উপস্থিত হন প্রেমানন্দজীর শয্যার পাশে। গুরুভাই ও ভক্তশিষ্যদের চোখের জলে ভাসাইয়া, প্রেমভক্তি-সিদ্ধ রামকৃষ্ণতনয় প্রেমানন্দজী চিরতরে ত্যাগ করেন এই মরধাম।
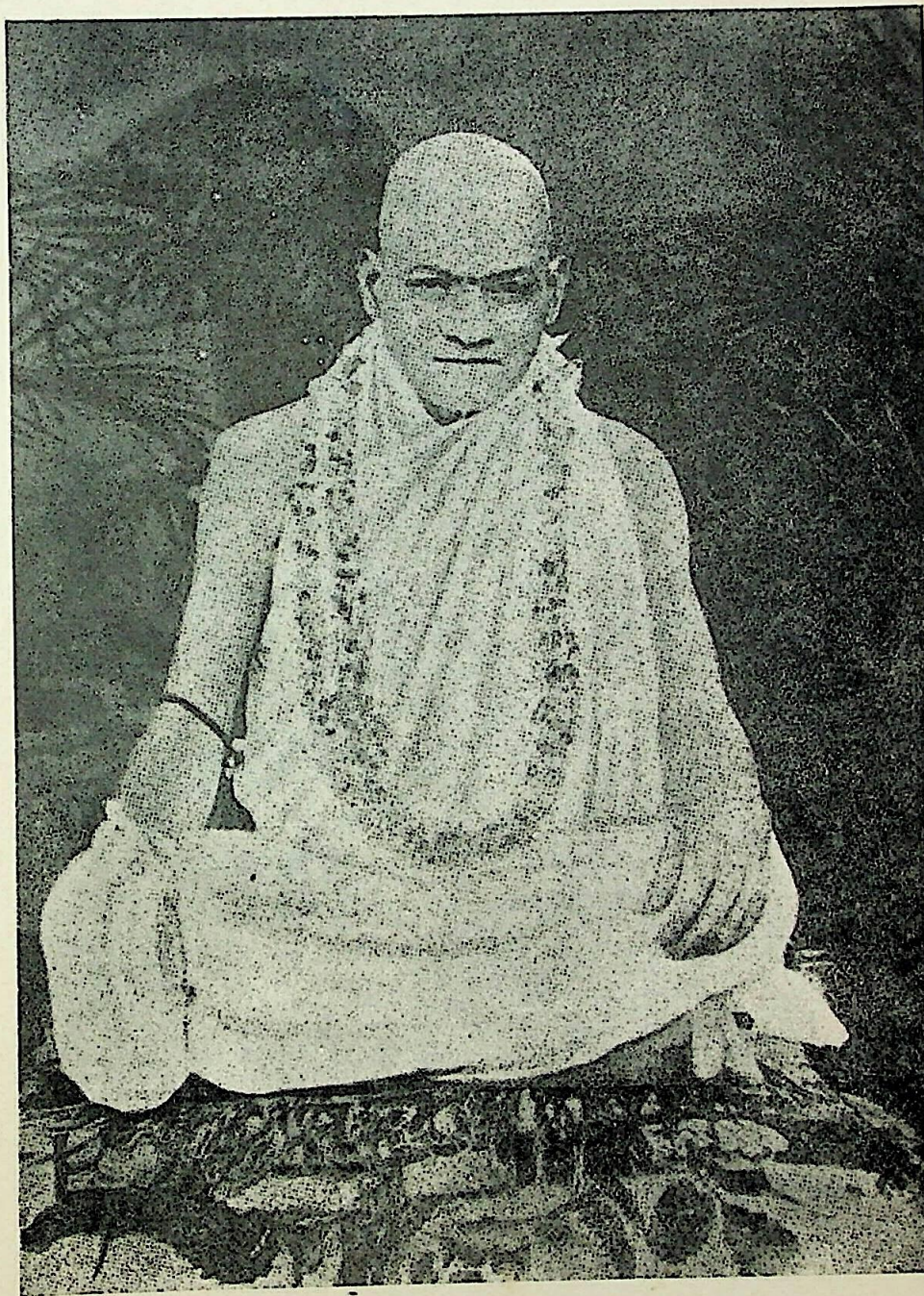
রামদাস বাবাজী

রামদাস বাবাজী

ফরিদপুরের অখ্যাত অজ্ঞাত কিশোর রাধিকারঞ্জনের জীবনে হঠাৎ একদিন লাগে ত্যাগ-বৈরাগ্যের হাওয়া, অবলীলায় ঘর সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়েন বৈষ্ণবীয় সাধনার পথে। পরম সৌভাগ্যবান্ ছিলেন রাধিকারঞ্জন, তাই আত্মকৃপা, গুরুকৃপা ও ঈশ্বরকৃপার বিরল সম্মিলন দেখা যায় তাঁহার জীবনে, সিদ্ধ মহাত্মা রামদাস বাবাজীরূপে ঘটে তাঁহার পরম অভ্যুদয়।

'অন্তরে রস আস্বাদন ও বাহিরে জীব উদ্ধারণ' এই কল্যাণময় ব্রতটি উদ্‌যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেন বাবাজী মহারাজ। এ সংকল্প তাঁহার পূর্ণ হয়, অগণিত নরনারী তাঁহার প্রেমভক্তির রসে হয় অভিসিঞ্চিত।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর শহরের নীলটুলি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে রামদাস বাবাজী জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দুর্গাচরণ গুপ্ত, মাতা—সত্যভামা দেবী।

এক পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত হইয়া দুর্গাচরণ ও তাঁহার স্ত্রী বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন বাস করেন। তাপিত চিত্ত ক্রমে শীতল হয়। গৃহে ফিরিবার পরের বৎসর যে পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হয়, বৃন্দাবনের পুণ্যময় স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্য পিতা মাতা তাহার নাম রাখেন রাধিকারঞ্জন!

বাল্যকাল হইতেই রাধিকার জীবনে নানা সদ্‌গুণ পরিস্ফুট হইতে থাকে। পরোপকার এবং ঈশ্বরভক্তি ছিল তাঁহার সহজাত। সুকণ্ঠ ও সুরজ্ঞ ছিলেন তিনি, তেমনি ছিলেন সুদক্ষ আঁতাই—যাত্রা বা বাউলের দলে যে কোনো ভক্তিসংগীত শুনিলে তৎক্ষণাৎ সেই সুরে লয়ে সে গান তিনি গাহিয়া শুনাইতে পারিতেন।

স্কুলের লেখাপড়ায় রাধিকার কোনোদিনই তেমন মনোযোগ

দেখা যায় নাই, অথচ ক্লাসের পরীক্ষায় প্রায়ই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। কিন্তু স্কুলের বিদ্যা তাঁহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পর তাহাতে ছেদ পড়িয়া যায়।

রাধিকার বালক জীবনের এক বড় সৌভাগ্য, পূতচরিত তরুণ ভক্ত-সাধক জগদ্বন্ধুর বন্ধুত্ব লাভ। জগদ্বন্ধু ফরিদপুরেরই লোক, বয়সে তিনি রাধিকা হইতে কয়েক বৎসরের বড়। কিন্তু এই বয়সেই ব্রজরস সাধনার ধারা তাঁহার জীবনে বহিতে শুরু করিয়াছে, কীর্তন ও ধ্যান মননের মধ্য দিয়া প্রচুর অধ্যাত্মশক্তি তিনি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। শুভ সংস্কারযুক্ত বালক রাধিকারঞ্জনকে জগদ্বন্ধু প্রগাঢ় স্নেহে আবদ্ধ করিলেন, নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে শুরু করিলেন তাঁহার জীবনধারার নিয়ন্ত্রণ।

রাধিকার বাড়ির লোকদের মোটেই পছন্দ নয় যে হরিনাম-পাগল জগদ্বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সে মেলামেশা করে। তাই উভয় বন্ধুর সাক্ষাৎ ও সাহচর্য সাধারণত অনুষ্ঠিত হইত গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

আলাপ পরিচয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই জগদ্বন্ধু একদিন উপদেশ দিলেন রাধিকাকে, "ছাখ্, মানুষ যদি কেবল কথা শেখে তাতে কি হবে? নিজের জীবনে সেসব কথার আচরণ চাই। আর সেই কথার আদর্শ দিয়ে জীবনকে গঠন করা চাই, না হলে সেসব কথা শুধু কথার কথাই হবে, তার কথায় প্রাণ থাকবে না। তার কথা কেউ শুনবে না। মরা কথায় কি কারো চৈতন্য হয়? জীবন্ত কথা চাই। জীবন্ত কথা কইতে হলে নিজেকে জীবন্ত হতে হয়। প্রাণ থাক্‌লেই জীবন্ত হয় না। ও তো বায়ুর নড়াচড়া। শোন! আগে দেহ মন বাক্যের সংযম চাই। সংযম পবিত্রতা থাকলেই হরিভক্তি থাকবে। জীবনটাই হবে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ, দয়ায় ভরা। এর আগে তোকে প্রহ্লাদ ধ্রুবের কথা বলেছিলাম ঐজন্যে। তাঁদের জীবনে এগুলি সবই ছিল।"

সাধন জীবনে সংযম যেমন চাই, তেমনি চাই ঈশ্বরের জন্য ভক্তি,

প্রেম, ধ্যান মনন। তাই আর একদিন জগদ্বন্ধু কহিলেন, "ছাখ্, তুই সকাল সন্ধ্যায় অন্তত এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা ক'রে ধ্যান করবি। নিজের ও অপরের জন্য রোজ সকাল সন্ধ্যায় শ্রীহরির স্মরণ করবি। সব বিঘ্ন তোর দূর হয়ে যাবে।"

ফরিদপুরের উপান্তে বাসকারী বুনো ও সাঁওতালেরা দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত এবং নির্যাতিত। এসময়ে মিঃ মিডি নামে এক খ্রীষ্টান পাদ্‌রী তাহাদের ধর্মান্তরিত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরও এবিষয়ে প্রচণ্ড উৎসাহ, ঐ পাদ্‌রীকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন।

অন্ত্যজ ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের খ্রীষ্টান করার এই প্রয়াসের কথা শুনিয়া জগদ্বন্ধু চঞ্চল হইয়া উঠেন। অশিক্ষিত বুনো ও সাঁওতালদের হিন্দুধর্মের আশ্রয়ে রাখার জন্য তিনি তৎপর হন। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় শহরে এক বিরাট কীর্তন দল গঠিত হয়। নিম্নবর্ণের লোকেরা যেদিন খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইবে, সেইদিনই পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী হিন্দু সমাজের সর্ববর্ণের সমন্বয়ে এক কীর্তন বাহিনী সাড়ম্বরে শহর পরিক্রমা করিতে শুরু করে।

সেদিনকার এই কীর্তন উৎসব শত শত বুনো সাঁওতালের মতি-গতি ঘুরাইয়া দেয়। পঞ্চমবর্ণের হিন্দু হিসাবে তাহারা স্থান পরিগ্রহ করে হিন্দু সমাজে।

পাদ্‌রী মিডি সাহেবের পরিকল্পনা ব্যর্থ করার মূলে ছিলেন তরুণ সাধক জগদ্বন্ধু, আর রাধিকারঞ্জন ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়ক। এই দিনের কীর্তনে রাধিকার ধর্মজীবনের একটা প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা সকলের চোখে স্পষ্টতর হইয়া উঠে। সারা প্রাণমন দিয়া কীর্তন অনুষ্ঠান করার পর কিশোর রাধিকার মনও আনন্দে তৃপ্তিতে হয় ভরপুর। তাছাড়া জগদ্বন্ধুর সহকারীরূপে এই কল্যাণকর উৎসব সম্পন্ন করায় বৃদ্ধি পায় তাহার আত্মপ্রত্যয়।

রাধিকার বাড়ির লোকেরা কিন্তু তাঁহার একাজে সেদিন মোটেই

খুশী হইতে পারে নাই। পরদিন তাঁহার দাদা মায়ের কাছে ভ্রাতার পাগলামির বিবরণ দিয়া শ্লেষের স্বরে বলেন, "মা, শুনলে তো তোমার গুণধর পুত্রের কীর্তি। লোকে এবার আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিচ্ছে। বলছে,—বাউল বৈষ্ণবের দল ক'রে রাধিকা রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছে। উনি এবার পতিত উদ্ধারের কাজে মেতেছেন। আমরা তো আগেই বলেছিলাম, ওকে এখান থেকে না সরালে ভবিষ্যতে একটা খ্যাপা বাউলের দল ক'রে বসবে। ওই হতচ্ছাড়া জগদ্বন্ধুটার সঙ্গে মিশেই তোমার রাধিকা গোল্লায় যেতে বসেছে।"

বরিশালের স্কুলে এবং তারপর ব্রাহ্মণকান্দার এক টোলে রাধিকারঞ্জন কিছুদিন পড়াশুনা করিলেন। মেধা ও বুদ্ধি তাঁহার যথেষ্ট, কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষা ও পাঠক্রমের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া থাকার মতো ছেলে তিনি নন। কতকটা নিজের জন্মগত শুভ সংস্কার আর কতকটা জগদ্বন্ধুর ভাগবত জীবনের প্রভাব তাঁহাকে সংসার সম্পর্কে উদাসীন করিয়া তুলিয়াছে।

এ সময়ে জগদ্বন্ধুর সঙ্গে একবার তিনি পাবনায় যান। দুই বন্ধুই হরিপ্রেমে মাতোয়ারা এবং কীর্তন গাহিতে পরম উৎসাহী। কয়েকটা দিন সেখানে ভজন ও কীর্তনে অতিবাহিত হয়। পাবনার প্রবীণ বৈষ্ণব দীনবন্ধু দাস বাবাজী এবং সিদ্ধ হারাণ ঠাকুরের সঙ্গে জগদ্বন্ধুর মাধ্যমে রাধিকা পরিচিত হন। এই দুই মহাপুরুষকে তাঁহার সংগীত শুনাইয়া তিনি আনন্দ দেন, লাভ করেন তাঁহাদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ।

দীনবন্ধু বাবাজীই হঠাৎ একদিন রাধিকারঞ্জনের নব নামকরণ করেন, রামদাস। সিদ্ধ বৈষ্ণবের প্রদত্ত এই নামেই জগদ্বন্ধু রাধিকাকে অভিহিত করিতে থাকেন এবং এই রামদাস নামেই সাধক ও ভক্ত-সমাজে ধীরে ধীরে রাধিকারঞ্জন সুপরিচিত হইয়া উঠেন।

জগদ্বন্ধুর সঙ্গীরূপে রামদাস একবার নবদ্বীপ দর্শনে যান। এসময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ষোল বৎসর। এই সুযোগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী,

কৃষ্ণানন্দ স্বামী এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবীণ সাধকের সঙ্গে রামদাস পরিচিত হন, তাঁহার কীর্তনের মাধুর্য, আবেশ এবং আখর এই সব মহাত্মাদের আনন্দ বর্ধন করে, ইহাদের স্নেহ ও কৃপায় রামদাস ধন্য হন।

পরের বৎসর, জগদ্বন্ধুর আগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায় রামদাস রওনা হন তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত তীর্থ বৃন্দাবনধামের দিকে। তখন তিনি সতের বৎসরের তরুণ যুবা। হাতরাস স্টেশনে পৌঁছানোর পর জগদ্বন্ধুর এক পত্র তিনি প্রাপ্ত হন। বৈরাগ্যময় জীবনের দিগ্‌নির্দেশ রহিয়াছে তাঁহার এই পত্রে: প্রিয় রামদাস! তুমি একাকী বৃন্দাবনে যাবে। বৈরাগী একাকীই যায়, একাকীই আসা যাওয়া করে। কাহারও অপেক্ষা করে না, কাহাকেও অনুরোধ করে না, তার কাহারও সহিত বিরোধ হয় না। সে সর্বদা সহজ সত্যবস্তু উপলব্ধি করে। প্রভুর অনন্ত বিভূতি। তাহার মধ্যে ছয়টি প্রধান। বৈরাগ্য তাহাদের মুকুটমণি। তুমি সেই বৈরাগ্যের আশ্রয় পাইয়াছ। সর্বদা নির্ভয়, সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া থাকিবে। মাধুকরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবার চেষ্টা করিবে। কোথাও স্থূল ভিক্ষা করিও না। শ্রীগোবিন্দের পুরাতন মন্দিরেই প্রথমে যাইও। যথা সময়ে সমস্তই জানিতে পারিবে। আমার সহিতও যথা সময়ে তোমার সাক্ষাৎ হইবে। ইতি—তোমার 'বন্ধু'।

মহাধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া রামদাসের আনন্দের আর সীমা নাই। ঝুলনযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এ সময়ে, নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত ভক্ত বৈষ্ণব ও আচার্যেরা এই মহাতীর্থে ভিড় করিয়াছেন। মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া শ্রীবিগ্রহ এবং সিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শন করিয়া রামদাস প্রাণমন সার্থক করিতে থাকেন।

ঝুলনযাত্রার পরে বৈষ্ণবেরা দলে দলে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হন। রামদাসও তাঁহাদের দলে ভিড়িয়া যান, আংশিকভাবে এ পরিক্রমা সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসেন বৃন্দাবনে। পরিক্রমার পথে গাঁঠুলীগ্রামে অবস্থান করার কালে রামদাস এক সূক্ষ্মদেহী সিদ্ধ

বৈষ্ণবের মাধ্যমে অন্নপূর্ণার সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হন। শ্রীকুণ্ডে এবং প্রেম সরোবরে স্নান করার সময়ও তাঁহার মানসপটে জাগিয়া উঠে রাধা-কৃষ্ণের দিব্যলীলার অনুভূতি। এই অনুভূতির মাধুর্য তরুণ সাধকের অন্তর রসায়িত করিয়া তোলে।

অতঃপর জগদ্বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হন শ্রীবৃন্দাবনে। উভয় বন্ধুতে মিলিয়া রাধাবাগের ছত্রিশগড় কুঞ্জে অবস্থান করিতে থাকেন, বিগ্রহ দর্শন, লীলা অনুধ্যান ও কীর্তনানন্দের মধ্য দিয়া তাঁহাদের দিন কাটিতে থাকে পরম আনন্দে।

কিছুদিন পরের কথা। যমুনার পুণ্যসলিলে অবগাহনের পর দুই বন্ধু পথ চলিতেছেন। এ সময়ে জগদ্বন্ধু রামদাসকে কহিলেন, "যা, মাধুকরী সেরে আয়।" সঙ্গে সঙ্গে একাকী চলিয়া গেলেন কুঞ্জের দিকে।

'এত ভোরে মাধুকরী কোথায় পাবো'—রামদাস নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন নারী কণ্ঠের এক মধুর আহ্বান।

পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন বিশ পঁচিশ বৎসরের এক সুন্দরী তরুণী। সঙ্গে তাঁহার এক পরিচারিকা।

তরুণীটি ভক্তিভরে রামদাস বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, তারপর পরিচারিকার হাত হইতে একটি ঠোঙা নিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। কহিলেন, "বাবা, কৃপা ক'রে আপনি এ প্রসাদটুকু নিন্।"

ঘটনার আকস্মিকতায় রামদাস কিছুটা বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। ঠোঙাটি হাতে নিয়া নীরবে তিনি চলিয়া আসিলেন শিক্ষাগুরু জগদ্বন্ধুর কাছে।

"তোর হাতে ওটা কিরে ?" প্রশ্ন করেন জগদ্বন্ধু।

রামদাস ঠোঙাটি খুলিয়া দেখান। প্রচুর পুরি, কচুরি, লাড্ডু ও ক্ষীরের পেঁড়া উহাতে রহিয়াছে। জগদ্বন্ধু এক কণিকা প্রসাদ হাত দিয়া তুলিয়া নিলেন, অর্ধেকটা নিজে গ্রহণ করিলেন, অপর অর্ধেক পুরিয়া দিলেন রামদাসের মুখে। তারপর নির্দেশ দিলেন,

"এক্ষুনি যমুনায় চলে যা। যমুনাকে প্রণাম করবি, প্রসাদকে প্রণাম করবি, তারপর ঠোঙাটা জলে ফেলে দিয়ে আসবি।"

রামদাসের চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ। ভাবিতেছেন, "প্রসাদ পরম পবিত্র বস্তু, চিন্ময়, তা জলে বিসর্জন দেওয়া হবে, এ কেমন কথা?"

অন্তর্যামী জগদ্বন্ধু তাঁহার মনের কথা বুঝিলেন, হাসিয়া কহিলেন, "ছ্যাখ, শ্রীমূর্তি আর প্রসাদ তো ভিন্ন বস্তু নয়। কিন্তু শ্রীমূর্তি তো বিশ্বের সর্বত্র আত্মগোপন ক'রে রয়েছেন। ভক্তের আগ্রহ অনুসারেই শ্রীবিগ্রহ নিজ স্বরূপ প্রকট করেন, তার সঙ্গে কথা কন। ভক্তের ভক্তি ও আগ্রহ না থাক্‌লে শ্রীবিগ্রহ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করেন না। প্রসাদও তেমনি সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করেন না। ভক্তস্থানেই প্রসাদ গ্রহণ করবি, শুধু মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলবি।"

কথাগুলি রামদাসের অন্তরে দিব্যভাবের অনুরণন তুলিয়া দিল, অতঃপর প্রসাদের ঠোঙাটি যমুনায় ঢালিয়া দিয়া আসিলেন।

একদিন রামদাসকে সঙ্গে নিয়া জগদ্বন্ধু শ্রীগোবিন্দের আরতি দর্শন করিতে গিয়াছেন। মন্দিরে ঢুকিবার সময় কহিলেন, "দেখিস্, কোনো স্ত্রীলোক যেন আমার শরীর না ছোঁয়। খুব সাবধানে আমায় রাখবি।"

আরতির ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় মৃদঙ্গ করতাল ও ঝাঁঝের ঐকতান। দলে দলে ভক্ত নরনারী ভিড় করিয়া দাঁড়ায় মন্দির প্রাঙ্গণে। রামদাস ভাবতন্ময় হইয়া প্রভুজীর আরতি দর্শন করিতেছেন, অন্য কোনো দিকে তাঁহার হুঁশ নেই।

কিছুকাল পরে জগদ্বন্ধু তাঁহাকে ভিড় হইতে বাহিরে টানিয়া আনিলে তিনি বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। এবার লক্ষ্য করিলেন, জগদ্বন্ধুর চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ। কুঞ্জে ফিরিয়া আসার পর বুঝা গেল এই যন্ত্রণার তীব্রতা। জগদ্বন্ধু গায়ের চাদরটি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া বলিতে লাগিলেন, "আঃ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!"

"কি হলো তোমার?" এমন করছো কেন? হতচকিত হয়ে প্রশ্ন করেন রামদাস।

"বল্‌লাম, কোনো স্ত্রীলোক যেন এদেহ না ছোঁয়। তা তোর কি এদিকে কোনো খেয়াল ছিল?"

রামদাস বুঝিলেন, জগদ্বন্ধুর কথার মর্ম না বুঝিয়া, সতর্ক না থাকিয়া, তিনি অন্যায় করিয়াছেন। পবিত্র আধারে কামনা-বাসনাযুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ ঘটিলে কি তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করে—এ সত্যটি রামদাস সেদিন প্রত্যক্ষ করিলেন। দৃশ্যটি তাঁহার মনে চিরদিনের তরে অঙ্কিত হইয়া গেল।

নবীন বৈষ্ণব রামদাসের সাধন-প্রস্তুতির জন্য জগদ্বন্ধুর চেষ্টা ও সতর্কতার অন্ত ছিল না। তাঁহার নির্দেশে রামদাসের জপ তপ কীর্তন সব কিছু কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। কৃচ্ছ্র সাধনের বিধিও কম পালন করিতে হয় নাই। প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া যমুনা স্নান, দুই বেলা শিউলি পাতার রস (জগদ্বন্ধু ইহাকে বলিতেন সবুজ শরবত) রামদাসকে গলাধঃকরণ করিতে হইত, সেই সঙ্গে স্বল্পাহার ও উপবাসের কড়াকড়ি তো ছিলই। তিনমাস একত্রে উভয়ে একই কুঞ্জে বাস করিয়াছেন এবং এই সময়ের মধ্যে অভিজ্ঞ ও উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধন ভজনের অনেক কিছু রামদাসকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়াছেন।[১]

এসময়ে একাদিক্রমে প্রায় নয়মাস রামদাস ব্রজমণ্ডলে বাস করেন, এই নয়টি মাসে তিনি তাঁহার সাধনজীবনের ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছেন, দর্শন করিয়াছেন বহুজন বন্দিত সিদ্ধ বাবাজীদের, আর সেই সঙ্গে আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিয়াছেন বৈষ্ণবদের বহুঈপ্সিত পরম-মধুর ব্রজরস।

জগদ্বন্ধু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রিয় রামদাস তখনো বৃন্দাবনে। এবার তাহাকে এদিকে নিয়া আসা প্রয়োজন, তাই পাথেয় ও নির্দেশ পাঠাইতে বেশী দেরি হইল না। এসময়ে জগদ্বন্ধু

১ চরিত মাধুরী, ২য় খণ্ড: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী

তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের বলিতেন, "বৃন্দাবন থেকে একটি হরিনামের চারা আনাচ্ছি। ভাল বীজের চারা। এর আগে তাকে বৃন্দাবনে রেখে এসেছি। সেখানকার জল হাওয়ায় বেশ পুষ্ট হয়েছে, অল্-প্রুফ্ হয়ে গিয়েছে, শিগ্‌গীরই আসছে।"

কলকাতায় জগদ্বন্ধুর সহিত মিলিত হন রামদাস। জপতপ কীর্তন, নিত্যকার টহল ও বন্ধুর প্রেমময় সান্নিধ্য, সব কিছুর মধ্যেই আনন্দ রহিয়াছে। কিন্তু তবুও রামদাসের অন্তর ভরিয়া উঠিতেছে না, চঞ্চল হইয়া রহিয়াছেন পুণ্যধাম বৃন্দাবনে ফিরিবার জন্য।

তাঁহার এ মনোভাবটি জগদ্বন্ধুর দৃষ্টি এড়ায় নাই। একদিন তিনি কহিলেন, "তুই তো ব্রজে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছিস্, তা বুঝেছি। গ্যাখ্, নিজের খাওয়ার যোগাড় তো পশুপাখিরাও করে, যে দশ-জনকে খাইয়ে খায়, সেই তো খাঁটি মানুষ।" কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল অটল গাম্ভীর্যের মহিমা। রামদাসের অন্তরপটে শিক্ষাদাতা ও চির শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর এই বাণী প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিল চিরদিনের তরে। উত্তরকালে এই কল্যাণময় বাণীই তাঁহার সাধনজীবনকে পরিচালিত করিয়াছে ঈশ্বর নির্ধারিত পথে। নামাচার্য রামদাস, নামমূর্তি রামদাসরূপে ঘটাইয়াছে তাঁহার অভ্যুদয়।

একুশ বৎসর অবধি তরুণ রামদাস জগদ্বন্ধুর শিক্ষায় ও নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব সাধক ও নামমন্ত্রের প্রচারকরূপে গণ্য হন। বিশেষ করিয়া কলকাতা ও তাঁহার উপকণ্ঠে শত শত ভক্ত নরনারীর উপর তাঁহার আত্মিক প্রভাব বিস্তারিত হয়।

ইহার পর পর্যায়ে তাঁহার সাধনজীবন গড়িয়া উঠে শক্তিধর সিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য রাধারমণ চরণদাসজীর আশ্রয়ে। নামপ্রেম-দানের মধ্য দিয়া জীবোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন চরণদাসজী। নবাগত শিষ্য রামদাস বাবাজীর আগমনের পর হইতে তাঁহার এই দুরূহ ব্রত সহজ হইয়া পড়ে, রামদাসের অসামান্য কীর্তন প্রতিভা বাংলার দিকে

দিকে নবতর প্রাণতরঙ্গ তুলিয়া দেয়, শত শত মানুষের জীবনকে ভক্তিপ্রেমের রসে উদ্বেল করিয়া তোলে।

কীর্তনমূর্তি, মহানামের চারণ, রামদাস বাবাজীর কীর্তনবৈভব সম্পর্কে তাঁর এক শিষ্য লিখিয়াছেন, "কীর্তনকালীন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আখরগুলি কীর্তনের বিষয়বস্তুকে সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিত। তখন শ্রোতৃমণ্ডলী তার পরে কি আখর প্রকাশ পাবে, তার জন্য সর্ব মনপ্রাণ এক ক'রে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করত। সে এক অপূর্ব আকর্ষণ! সহজ সুমধুর সুর অথচ তার কি অপূর্ব প্রাণশক্তি, যার একই চরণ তাঁর মুখে বার বার শুনে মনে হত যেন নিত্যনূতন। এই নামকীর্তনের ফাঁকে ফাঁকে নিতাই-চৈতন্য ও রাধা-কৃষ্ণের লীলাগুণ এমনি নিপুণভাবে পরিবেশিত হত যে, শ্রোতৃবৃন্দ নামের মহিমাকে সহজে উপলব্ধি করতে পারত। সুরে সুরে ভাববল্লরী ছন্দায়িত হয়ে উঠতো, আর সেই প্রেমময়েরই বাণী ঝংকৃত হত অগণিত ভক্তজনের মর্মস্থলে।

বাবাজী মহারাজ গৌরপরিকরগণের ও আচার্যগণের লীলানুধ্যানের মরম কথাই ব্যক্ত করেছেন প্রেমের অনাবিল ছন্দে। শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্যের পদাঙ্কিত ভূমিতে পূর্বে যে সব লীলা হয়েছে, সেখানে নানা সময়ে উপস্থিত হয়ে সেই লীলাস্মৃতিকে জনচিত্তে এমনভাবে জাগিয়ে তুলতেন যেজন্য বৈষ্ণবজগৎ তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে যুগ যুগ ধরে।

"এই মহাবৈষ্ণবের আর একটি বিশেষ দান 'সূচক' কীর্তন। মহাপ্রভুর পার্ষদ ও তাঁর পরবর্তী আচার্যগণের তিরোধান তিথি উপলক্ষে গৌরচন্দ্রিকা কীর্তন ও তৎসহ সামান্য কিছু কীর্তন অনুষ্ঠানের হয়তো বা ব্যবস্থা ছিল, যার সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগই ছিল না। বাবাজী মহারাজ সেই সব তিরোধান তিথি ধরে তাঁদের জীবনলীলা ভাব ও সুরের ছন্দে পরিবেশন করতেন। এই কীর্তন 'সূচক কীর্তন' নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছে। এর ব্যাপকভাবে প্রচার করেন বাবাজী মহারাজই। আবার এই সূচক

কীর্তন গীত হওয়ার ক্রম, ভাব, ভাষা ও সুরের যে ছাঁচটি মানুষের মনের মূলে গিয়ে একটি রূপমাধুর্য লাভ করেছে, তাও তাঁর উদ্ভাবন।[১]

সিদ্ধ বৈষ্ণব, মহাপ্রেমিক আচার্য, চরণদাসজীর সঙ্গে যুক্ত হইবার পর হইতে রামদাসের জীবনে শুরু হয় এক নবতন অধ্যায়। চরণদাস বাবাজী বলিতেন,—"নাম আর নামী অভিন্ন—নামীকে মাটির মানুষের কাছে নামিয়ে আনো ভাই, তাঁর কৃপা-মাধুর্য বিতরণ করো বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু মানবের কাছে, নামের সদাব্রত খুলে দিয়ে জীবকে তরাও। এ যুগে এর চাইতে মহত্তর দান আর নেই।" এই কথাগুলি বৈরাগী নামপ্রেমী রামদাস বাবাজীর মর্মমূলে গিয়া প্রবিষ্ট হয়, নামপ্রেমের প্রচারকে সাধনার এক বিশেষ অঙ্গরূপে তিনি ধরিয়া নেন।

রামদাসকে আত্মসাৎ করার পর কয়েক বৎসর চরণদাসজী তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া নামপ্রচারে মত্ত হন, এবং এই প্রচারের মাধ্যমে রামদাসের বৈরাগ্যের প্রস্তুতি আরো দৃঢ়তর হইয়া উঠে। চরণদাসজী নিজেকে কোনোদিন গুরুরূপে শিষ্যদের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, করিয়াছেন দাদা-রূপে, নামপ্রেম সাধনপথের সতীর্থ ও সাথী-রূপে। গুরুর গুরুত্ব নিয়া চরণদাস কোনোদিনই শিষ্যদের হইতে নিজেকে দূরে রাখেন নাই, মর্যাদার উচ্চতর আসনে উপবিষ্ট হইয়া উপর হইতে কথা বলেন নাই। ভক্ত শিষ্যদের কাছে আসিয়া তিনি তাঁহাদের হাত ধরিয়াছেন, প্রেমাশ্রুপুরিত নয়নে, প্রেমকম্পিত দেহে, তাহাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের সাথী হইয়া মন্দিরে মন্দিরে রাস্তায় রাস্তায় কীর্তনানন্দ পরিবেশন করিয়াছেন। রামদাসকেও চরণদাসবাবাজী এমনিভাবে বুকে টানিয়া নিয়াছেন, দাদারূপে, মরমের মরমীরূপে, নামপ্রেম প্রচারের সাথীরূপে, তাঁহাকে নিয়া ঘুরিয়াছেন পথে পথে, শহরে ও জনপদে।

কীর্তন সফরে উভয়ে যখন বাহির হইতেন, কোথায় কোন্ অঞ্চল পরিক্রমা করিবেন, কোথায় কতদূরে গিয়া থাকিবেন তাহার কোনো

১ নামাচার্য রামদাস: সুশীলকুমার সেন

স্থিরতা ছিল না। পথে আহারের কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই। কীর্তনরসে উভয়ে প্রমত্ত হইয়া আছেন, আর অযাচক ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে ঠাকুরের ভোগ সংগৃহীত হইতেছে। সঙ্গী কীর্তনকারী ভক্ত এবং অভ্যাগতদের সেবার পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাই দিয়া চরণদাসজী ও রামদাসের উদরপূর্তি চলে। নিত্যকার টহলের পথে যে ভিক্ষা পাওয়া যাইত, পরের দিনের জন্য তাহার কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখার উপায় ছিল না।

এ সময়ে রামদাস বাবাজীর পরিধানে থাকিত শুধু একটি কৌপীন ও বহির্বাস, আর থলির মধ্যে—ইষ্টদেবের চিত্রপট, করতাল ও একখানা ভজনগ্রন্থ।

রামদাসের কীর্তন পরিক্রমার নিষ্ঠা ও ভাবাবেশ দেখিয়া, তাঁহার বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধন দেখিয়া গুরু চরণদাসজীর আনন্দের সীমা নাই। ত্যাগী পরম সাত্ত্বিক রামদাসের দেহ ছিল শান্ত সুঠাম ও শ্যামলশ্রী-সম্পন্ন। তাঁহার মধুর কণ্ঠ, ভাবাবেগ ও আখর সৃষ্টির স্বভাবজাত শক্তির আকর্ষণও ছিল অতি প্রবল। যেখানে যখন তিনি যাইতেন, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে শত শত লোক তাঁহার চারিদিকে ভিড় জমাইয়া ফেলিত। এই জনপ্রিয়তা দর্শনে গুরু চরণদাস শিষ্যের বৈরাগ্য সাধনার পরীক্ষাকে আরো কঠোর করিয়া তুলিতেন। কিন্তু প্রতিবারের পরীক্ষায়ই রামদাস উত্তীর্ণ হইতেন সসম্মানে। এভাবে ক্রমে তিনি পরিণত হন নিখাদ সোনায়।

গুরুর সঙ্গে সেবার বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন বাস করেন রামদাস, তাঁহার কৃপায় সেখানকার কয়েকটি সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য তিনি প্রাপ্ত হন। ব্রজরস সাধনার নানা নিগূঢ় তত্ত্ব ইঁহাদের কৃপায় তিনি শিক্ষা করেন। রামদাসও তাঁহার কীর্তন ও আখরের মাধুর্যে মহাত্মাদের প্রাণমন ভরিয়া তোলেন।

গুরুর সঙ্গে রামদাস বৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। অতঃপর চরণদাসজীর নির্দেশে এই কলিকাতা নগরীই হয় তাঁহার সাধনক্ষেত্র ও কর্মভূমি।

প্রেমপূরিত নয়নে চরণদাসজী প্রিয়তম শিষ্যকে একদিন বলেন, "ভাই রামদাস, রাধামাধবের কৃপায় যে নামকীর্তনের সুধা তোমার হৃদয় ও কণ্ঠ থেকে অবিরাম উদ্গত হচ্ছে, যা শুনে আমরা আনন্দে আত্মবিস্মৃত হচ্ছি, তা তুমি ছড়িয়ে দাও কলকাতার এই ঈশ্বরবিমুখ জনজীবনে। যে বস্তু তুমি পেয়েছো এবং পাচ্ছো, তা বিলিয়ে দাও পাষণ্ডীদের কল্যাণে, তবেই তো বুঝা যাবে তুমি প্রকৃত বৈষ্ণব কিনা। পরম বস্তু নিজে ভোগ না ক'রে যে অপরকে বিলায় সেই তো প্রকৃত বৈরাগী—প্রকৃত বৈষ্ণব।"

গুরুর এই কল্যাণময় বাণী শিরোধার্য করিয়া নেন রামদাস বাবাজী। নিজের বৈষ্ণবীয় সাধনার আদর্শ ও নামকীর্তনের ধারা এবার হইতে কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে অকৃপণ করে তিনি বিস্তারিত করিতে থাকেন।

রামদাস বাবাজী মহারাজের কীর্তন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহার এক শিষ্য লিখিয়াছেন:

"কীর্তন সাধনার এমন একটি রূপ রামদাসজী এ যুগে তুলে ধরেছিলেন যা অননুকরণীয়। কেবল সুরসম্পদে বা কণ্ঠের কৌশলে সে রূপের মাধুর্য আস্বাদন করা যায় না। যেমন বীণাযন্ত্রের এমন একটি বিশেষ স্থিতিকে বাদক সুরে বাঁধে যে একটু এধার ওধার হলেই সে ঝঙ্কার আর ফুটে ওঠে না, তেমনি সাধনরাজ্যের সিদ্ধির ক্ষেত্রে এমন একটি মাধুর্য স্তর আছে যেখানে না পৌঁছুলে প্রকৃত রসের সন্ধান মেলে না।

"কীর্তনের সুরধারার সঙ্গে তার নয়নের দু'কোণ বেয়ে যখন ঝরে পড়তো পুলকাশ্রুর ধারা, তখন কীর্তনের ভাষা জীবন্ত হয়ে জাগিয়ে তুলতো মানুষের হৃদয়ে অপূর্ব আলোড়ন। মনের মূলে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলতো অখিলাত্ম দেবতার সংবেদনময় মূর্তি।

"শাস্ত্রে আছে, নববিধাভক্তির মধ্যে নামসংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাধনমার্গের কোন্ পর্যায়ে পৌঁছুলে এ বস্তুটি কিভাবে মানুষের মর্মে মর্মে ছড়িয়ে পড়ে তা দেখবার সুযোগ বিংশ শতাব্দীর যুগেও সম্ভব

হয়েছে বাবাজী মহারাজের অমৃত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। বৈষ্ণব কবি দেবকীনন্দন দাস এই শ্রেণীর কীর্তনপাগল, নামপ্রেমের উদ্গাতা মহাত্মাদের কথা উল্লেখ ক'রেই বলেছেন—(তাঁরা) জগতে দুর্লভ হইয়া প্রেমধন লুটে[১]।"

সে-বার চরণদাস বাবাজী মহারাজ একদল ভক্তসহ বরানগরে বাস করিতেছেন, সঙ্গে রহিয়াছেন প্রিয় শিষ্য রামদাস। একদিন হঠাৎ এক দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি প্রেমভরে রামদাসকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। দুই নয়নে ঝরিতে থাকে পুলকাশ্রু। কিছুক্ষণ পরে এই আবিষ্ট অবস্থায়ই রামদাসকে বৈরাগীর বেশে তিনি সাজাইয়া দেন। তাঁহার হাতে তুলিয়া দেন তুলসীতরুর একটি মৃত্তিকা-ভাণ্ড আর একটি বৈরাগীর যষ্টি। গুরু এভাবে সেদিন রামদাস বাবাজীকে বেশাশ্রয় দান করেন, উন্নীত করেন সর্বত্যাগী দীনহীন এক কাঙাল বৈষ্ণব সাধকে।

মরধাম ত্যাগের দিন চরণদাস মহারাজ সস্নেহে রামদাস বাবাজীর হাতে তুলিয়া দেন তাঁহার নিজস্ব করতাল জোড়া। প্রেমাশ্রুপূরিত নয়নে বলেন, "ভাই রামদাস, এ করতাল তোমার জন্য রইলো, জীবের দ্বারে দ্বারে যাবে, কেঁদে কেঁদে নাম শুনাবে তাদের। এই হবে তোমার জীবনের প্রধান কাজ।"

করতাল জোড়া বুকের মাঝে চাপিয়া ধরেন রামদাস বাবাজী, দরদর ধারে নির্গত হইতে থাকে নয়নবারি, সেই সঙ্গে নাম বিতরণের সঙ্কল্পবাণী নূতন করিয়া উচ্চারণ করেন অস্ফুট স্বরে।

"রামদাসজী সারা জীবন ঐ করতালের মধুসংলাপে কত যে জীবের জীবনমূলে নামামৃত রস দান ক'রে সঞ্জীবিত ক'রে তুললেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি কোনো সঙ্ঘ গড়লেন না, সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করলেন না। তাই তাঁর অনুগামীরা হলেন শুধু তাঁর নামেই পরিচিত। লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার বা লীলাস্থলীর স্মারক মন্দির ভিন্ন কোনো নূতন মঠ বা মন্দির তিনি নির্মাণ করান নি। আরও বড় কথা। চরণদাসজীর কঠোর

১ নামাচার্য রামদাস: সুশীলকুমার সেন

আদেশ ছিল—নিজেকে বৈষ্ণব মনে না করা। সে জন্য কোনো বৈষ্ণব পঙ্গতে, প্রসাদ ভোজনের জন্য এক পঙ্‌ক্তিতে বসা তাঁহার নিষেধ ছিল। বরং ভক্তদের প্রসাদ পাইবার পর পথভিক্ষুকের মতো ভুক্তাবশেষ বৈষ্ণব অধরামৃত জ্ঞানে গ্রহণ করাই ছিল তাঁর নির্দেশ। সেজন্য বৈষ্ণব সেবার কোনো আমন্ত্রণে বাবাজী মহারাজ ও তাঁর অনুগামীরা যেতেন না। আমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষা করা হতো উক্তরূপ অধরামৃত গ্রহণ ক'রে। গুরুর আর একটি উপদেশ—আচণ্ডালে কুক্কুরান্ত করি, দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি।—এও রামদাসজী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে গিয়েছেন[১]।"

বৈষ্ণবীয় দৈন্য ও নিরভিমানতার সঙ্গে রামদাস বাবাজীর সাধন জীবনে মিলিত হইয়াছিল উদার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমন্বয়বোধ। বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের ইষ্ট ও মঠ মণ্ডলীকে যেমন তিনি সম্মান করিতেন, তেমনি নতমস্তকে অভিবাদন জানাইতেন খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মস্থানের প্রতি। এ প্রসঙ্গে বাবাজী মহারাজ সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর এক সন্ন্যাসীর মূল্যায়ন সকলেরই অনুধাবন যোগ্য :

"রামদাস বাবাজী মহারাজ বক্তা নন, বাগ্মী নন, দুর্দান্ত রাজনৈতিক কর্মী নন, মনে হয় নিরীহ গোবেচারী, শুধু ভগবানকেই সার করেছেন। কিন্তু কি শক্তিই না। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো এই নিরীহ লোকটির মধ্যে প্রবাহিত, যাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব কৃষ্টি আজ উচ্চশির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! এ সত্য কল্পনাবিলাসের সত্য নয়—এ ঐতিহাসিক সত্য। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পরিচয় অনেক ক্ষেত্রে দেখবার সুযোগ হয়েছে। সংকীর্তনের সময় রাজপথে বা পরিক্রমা পথে, মন্দির ও মসজিদের সম্মুখে, গীর্জা ও গুরুদ্বারের সম্মুখে আনত মস্তকে কিছুক্ষণ কীর্তন ক'রে তবে অগ্রসর হন। এতে এক অপূর্বতার সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীনভাবে সকলের চিত্তেই প্রকটলীলার স্ফূর্তি হয়। সকল স্থানেই তিনি অনন্ত ভাবময় পরমপুরুষেরই উপলব্ধি করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও তিনি

১ নামাচার্য রামদাস

পরম ভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর অনুগামী কয়েকজন ভিন্ন আর কয়জনের জীবনে এরূপ উদার সমন্বয় ভাব প্রকটিত হয়েছে তা জানি না[১]।"

বাবাজী মহারাজের তাত্ত্বিক দৃষ্টির উদারতার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ স্থাপনার বিতর্কে। হাওড়ার নদের-নিমাই মন্দিরে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু বৈষ্ণব আচার্য ইহার বিরোধিতা করেন, তাঁহারা বলেন পূর্বসূরী বা পূর্ব আচার্যেরা এই মূর্তিতে পূজার বিধান দেন নাই। বাবাজী মহারাজ সিদ্ধ বৈষ্ণব, স্বচ্ছ তাত্ত্বিক দৃষ্টির অধিকারী। তিনি তাঁর কীর্তন সভায় কীর্তনের মাধ্যমে বাসুদেব সার্বভৌমের সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করিলেন :

শ্রীকৃষ্ণ শচীসুত গুণধাম।
আমার এই ধ্যান এই জপ এই লব নাম।

এ ভাবে সন্ন্যাসী গৌর মূর্তির ভজন পূজন সমর্থন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনে তিনি এক দূরপ্রসারী শুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া যান।

রামদাস বাবাজী মহাশয় তখন কলকাতা এবং উত্তর শহরতলীর নানা অঞ্চলে বাস করিতেন। তাঁর ত্যাগ বৈরাগ্য, সাধননিষ্ঠা ও কীর্তনে আকৃষ্ট হইয়া একদল ভক্ত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাবাজীর কোনো স্থায়ী মঠ নাই, ফলে ভক্তেরা তাঁহার সঙ্গ সব সময়ে করিতে পারেন না, তিনি কখন কোথায় থাকেন সে সংবাদও অনেক সময় পাওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এজন্য সাময়িকভাবে দর্মাহাটায় একটি বাড়ি তাঁহারা ভাড়া করেন এবং এটি বাবাজী মহাশয়ের অবস্থান-কেন্দ্র রূপে গণ্য হয়।

একদল ভক্ত একটি স্থায়ী মঠ নির্মাণের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেন এবং এজন্য জমির সন্ধানও শুরু হয়। এ সংবাদ জানিতে পারিয়া রামদাস বাবাজী মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের বলিয়া দেন,

১ নামাচার্য রামদাস

"ছ্যাখো, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা নয় কোনো নূতন মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই তোমাদের টাকা দিয়ে কোনো ভাঙা মন্দির বা মহাপ্রভুর প্রাচীন লীলাস্থলের সংস্কার সাধন করা যায় কিনা, তাই করো।"

ভক্তেরা কিছুটা দমিয়া গেলেন বটে কিন্তু একেবারে নিরস্ত হইলেন না।

অমিয় নিমাই চরিত প্রণেতা, অমৃত বাজারের সম্পাদক শিশির-কুমার ঘোষ এসময়ে চৈতন্যপদস্পৃষ্ট বরানগর পাটবাড়ির উন্নয়নের জন্য দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বাবাজী মহারাজ স্মরণ রাখিয়াছেন একথা। ইহার কিছুদিন পরে আসে বরানগরের নিতাই-গৌর বিগ্রহের সেবা হস্তান্তরের প্রস্তাব। তৎকালীন অধিকারীরা ইহার খরচ চালাইতে না পারিয়া সংকটে পড়িয়াছেন। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীও এ সংবাদ পাইয়া বাবাজী মহারাজকে এবিষয়ে অনুরোধ জানাইতে থাকেন। অতঃপর বাবাজী মহারাজকে বরানগর পাটবাড়ির সেবা পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে হয়।

বরানগর পাটবাড়ির পুণ্যময়তা ও ঐতিহ্যগৌরব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিপটে অক্ষয় হইয়া আছে। প্রভু শ্রীচৈতন্যের পদস্পর্শে এই স্থানটি পবিত্রীকৃত।

ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে নবদ্বীপে সবেমাত্র শ্রীচৈতন্যের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এমন সময় সেখানে গিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হয় রঘুনাথ উপাধ্যায়। বর্ধমান জেলার এক নৈষ্ঠিক শাক্ত-ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। কিন্তু ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ শাস্ত্রেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। প্রবীণ বয়সে বরানগরের গঙ্গাতীরে নিভৃতে এক কুটির বাঁধিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন। ভাগবত অধ্যয়ন আর সদ্যপ্রাপ্ত দামোদর-গোপাল বিগ্রহের সেবায় তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে থাকে।

অতঃপর লোকমুখে রঘুনাথ উপাধ্যায় সংবাদ পান, নবদ্বীপে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া

বৈষ্ণবেরা বসাইয়াছেন এক চাঁদের হাট। রঘুনাথ উপাধ্যায় অচিরে ছুটিয়া যান নবদ্বীপে, শ্রীবাস অঙ্গনে প্রভুর চরণতলে লুটাইয়া পড়িয়া মাগেন তাঁহার পরমাশ্রয়। আলিঙ্গন দিয়া উপাধ্যায়কে শান্ত করেন প্রভু, সমর্পণ করেন তাঁহাকে প্রাণপ্রিয় সখা গদাধরের হস্তে।

গদাধর পণ্ডিতের নিকট হইতে উপাধ্যায় কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করেন এবং প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে বরানগরে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। গদাধরের আজ্ঞা হয় তাঁহার প্রতি—"গঙ্গাতীরে নিজ কুটিরে বসে কৃষ্ণভজন করো আর জনকল্যাণের জন্য রচনা করো ভাগবতের বাংলা অনুবাদ, কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিণী নাম দাও তার।"

প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গকে ছাড়িয়া যাইতে উপাধ্যায়ের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, কান্নায় তিনি ভাঙিয়া পড়েন। এ সময়ে গদাধর পণ্ডিত তাঁহাকে আশ্বাস দেন, "উপাধ্যায়, প্রভুর বিরহে তুমি অধীর হ'য়ো না, স্বস্থানে বরানগরে গঙ্গাতীরে বসে তাঁর লীলা অনুধ্যান করো। তাঁর দর্শন তুমি পাবে।"

পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ আশ্বাসবাণী সত্য হইয়া উঠে। ফুলিয়া, রামকেলী ও পানিহাটিতে অবস্থানের পর চৈতন্যপ্রভু নৌকাযোগে সেবার বরানগরে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রবেশ করেন ভক্তপ্রবর রঘুনাথের কুটিরে।

উপাধ্যায়ের ভাগবত পাঠ শুনিয়া প্রভু আনন্দে অধীর হইয়া উঠেন, অষ্টসাত্ত্বিক ভাব-বিকার তাঁহার দেহে প্রকাশ পায়, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পতিত হন ভূমিতলে।

সম্বিৎ পাইয়া প্রভু উপাধ্যায়কে পরম স্নেহে জড়াইয়া ধরেন, বলেন, "অপার আনন্দ দিয়েছো তুমি আমায়, তোমার ভাগবত পাঠ শুনিয়ে। আজ থেকে তোমার নাম হলো—ভাগবতাচার্য। ভাগবত-পাঠের সেবা দ্বারাই তুমি লাভ করবে রাধাকৃষ্ণের চরণ।"

শ্রীচৈতন্য প্রভুর চরণধূলি প্রাপ্ত ভাগবতাচার্যের এই পাটবাড়ি দীর্ঘদিন ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থ। কালক্রমে, এই পাটবাড়ির সেবার ভার আসিয়া পড়ে বরানগরের ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর

ওয়ারিশদের উপর। সেবাকর্মের গুরুদায়িত্ব পালনে অসমর্থ হওয়ায় এটি তাঁহারা রামদাস বাবাজীর হস্তে সঁপিয়া দেন।

এই প্রাচীন পাটবাড়ি যে একটি জাগ্রত স্থান, একথা স্থানীয় বৈষ্ণবদের অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। বাবাজী মহারাজের কাছে এটি হস্তান্তরিত হইবার পরও এই শ্রীপাটের অলৌকিকতার ঐতিহ্য হ্রাস পায় নাই। জনৈক শিষ্যের লেখায় পাই:

"শ্রীশ্রীপাটবাড়ির সেবাধিকার বাবাজী মহারাজ গ্রহণ করার পর গভীর রাত্রে নূপুর পায়ে নৃত্যের শব্দ, খড়ম পায়ে অলৌকিক গতায়াত ইত্যাদি নানারূপ অঘটন ঘটতে থাকে দিনের পর দিন। যুগল বিগ্রহের জন্য মাপের চেয়ে বড় ক'রে সোনার বালা তৈয়ার করা হয়, যাতে ভেলভেটের জামার উপরও পরানো যায়। কিছুদিন বাদে দেখা গেল, জামার উপর তো দূরের কথা, এমনিতেই তা অনেক ছোট হয়ে গেছে। অদ্ভুতভাবে হঠাৎ একদিন এক শালগ্রাম-শিলার আগমনও সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মন্দিরের সেবক একদিন হঠাৎ দেখতে পান, নারায়ণের সিংহাসনের নিচে রয়েছে এক মূর্তি-শিলা। শালগ্রামের উপরে নিচে চন্দন মিশ্রিত কাঁচা তুলসী ও গলায় রূপার পৈতা। এভাবে দিনের পর দিন বহুতর বস্তুর সমাবেশ অলৌকিকভাবে হতে থাকে[১]।"

বরানগর পাটবাড়ির বিগ্রহ সেবার সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে রামদাস বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী। বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষকদের কাছে এ দুটির মূল্য অপরিসীম। নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী, অপ্রতিগ্রাহী রামদাস বাবাজী মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

বাবাজী মহারাজের মাধ্যমে রামদাস বাবাজী মহারাজের আর এক শ্রেষ্ঠ গঠনধর্মী কর্ম পুরীর হরিদাস মঠের সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মঠের সংস্কার সাধন। ইহার ফলে প্রভু শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার

১ নামাচার্য শ্রীরামদাস

প্রিয় পার্ষদ নামাচার্য হরিদাসের স্মৃতির সংবাহক এই পবিত্র সমাধি মন্দিরটি ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া আরো কয়েকটি মঠ ও পুণ্যস্থানের রক্ষণে বাবাজী মহারাজকে সক্রিয় হইতে দেখা গিয়াছে এবং এইসব স্থানকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছে বৈষ্ণবীয় সাধনা ও সংস্কৃতির উজ্জীবন। এই মহনীয় সংরক্ষণ কর্মগুলি রামদাস বাবাজীকে দেশ ও সমাজের কাছে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

গুরুদেব চরণদাস বাবাজীর নির্দেশ অনুসারে রামদাসজী সেবার হঠাৎ কলকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। উঠেন গুরুভাই কুঞ্জ মল্লিকের বাড়িতে।

ঐ বাড়িতে তখন মহা সংকট। কুঞ্জবাবু গুরুতর পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিলেন, এবার ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। মৃত্যু তাঁহার শিয়রে। কিন্তু দেখা গেল, ডাক্তারদের ধারণাকে উল্টাইয়া দিয়া কুঞ্জবাবু হঠাৎ কোন্ এক অলৌকিক কৃপা বলে সুস্থ হইয়া উঠেন, এ যাত্রা রক্ষা পাইয়া যান।

শরীর তখনো খুবই দুর্বল, কিন্তু রামদাস বাবাজীর পুণ্যময় সঙ্গে রোগী সত্বর উজ্জীবিত হইয়া উঠিতে থাকেন।

একদিন তিনি বাবাজী ম'শায়কে বলিলেন—"দাদা! কতদিন নামসংকীর্তন শুনতে পাই নি। কাল একটু শোনাবেন না?"

"দেখা যাক্ নিতাই চাঁদের করুণায় আপনাকে কীর্তনানন্দ দিতে পারি কিনা"—উত্তরে বলেন বাবাজী মহারাজ।

"শ্রীগুরু-সুখ-তাৎপর্য স্বভাবের মূর্তবিগ্রহ এক স্বভাব বৈরাগী যুবকের করুণায় বিশিষ্ট ধনী ও সমাজের প্রখ্যাত কুঞ্জ মল্লিক মহাশয় আরোগ্য লাভ করেছেন। সেই যুবকেরই নেতৃত্বে কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের বাড়িতে সেদিন বৈকালে নামসংকীর্তন হবে।—এ সংবাদে বিস্মিত চমকিত কলকাতার ইংরেজ-ঘেঁষা যত ধনীগোষ্ঠী ও কুঞ্জবাবুর আত্মীয়স্বজন সব এসেছেন। আর সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে এসেছেন

কাঁসারিপাড়ার তারক প্রামাণিকের পৌত্র আশুবাবু, প্রখ্যাত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বেনেটোলার গোস্বামী প্রভু, স্বদেশী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল, মহাকবি ও প্রেমিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিশেষ চিহ্নিত, প্রিয় পরিকর, মহেন্দ্র গুপ্ত (শ্রীম), পণ্ডিত গিরিশ বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, এঁড়েদহবাসী ভাগবত পাঠক, তারক চট্টোপাধ্যায়, এইরূপ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

"...বাবাজী মশায় সকালে স্নান আহ্নিক সেরে চলে গিয়েছেন, রামবাগান হয়ে সিঁথি। ফিরলেন বৈকালে, সঙ্গে জনা কুড়ি সঙ্গী, তাঁরা মৃদঙ্গবাদন ও দোহারকী করবেন। যথাসময়ে বৈষ্ণবোচিত দণ্ডবৎ প্রণতি জানিয়ে, বাবাজী মশায় ঐ জমাটি আসরে এসে বসলেন।

"এদের প্রথম দর্শনেই সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ। তারপর, মুদিত নয়ন, বাবাজী মশায়ের মধুকণ্ঠের সংকীর্তন, চোখে মুখে জলের প্লাবন, অঙ্গে পুলকাবলী, মাঝে মাঝে সেই অবস্থায় তাঁর দেহখানি বসার স্থান থেকে প্রায় একহাত উঁচুতে উঠছে আর নামছে। পরবর্তী অবস্থা আরও উন্মাদনাময়। বাবাজী মশায় অলৌকিক ছন্দে উদ্দণ্ড নৃত্যসহ কীর্তন করছেন। সে কি নৃত্যভঙ্গিমা! তাঁর চোখের জল ছিট্‌কে ছিট্‌কে গিয়ে ঐ সভাস্থ ব্যক্তিদের দেহের স্থানে স্থানে পড়ছে।

"এহেন সময়ে অকস্মাৎ মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয় উন্মাদের ভঙ্গীতে টলতে টলতে হাতে তালি দিতে দিতে বাবাজী মশায়ের কাছে কাছে অনুনৃত্য করতে লাগলেন। গিরিশবাবু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মহা আবিষ্টের মতো দাঁড়িয়ে। আর সবার চোখে মুখে জল, কারো বাহ্যস্মৃতি নেই। বাহ্যস্মৃতি ফিরে এলে সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন,—গণসহ বাবাজী মশায় আসর থেকে চলে গিয়েছেন।"[১]

বাবাজী মহারাজের সেদিনকার সংকীর্তন অনুষ্ঠানটি যেন ছিল ঈশ্বর-আদিষ্ট, এ কীর্তনের অলৌকিকী শক্তি অচিরে ছড়াইয়া পড়িল কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে।

পুলিন মল্লিক মহাশয় বাবাজী মহারাজকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা

১ রামদাস প্রতিভা : রামকিঙ্কর দাস।

করিতেন, ভালবাসিতেন। বিপ্লবীদের পুলিনবাবু টাকা সাহায্য দিয়াছেন, এই সন্দেহে পুলিস তাঁহাকে কিছুটা নিগৃহীত করে। তাই সেদিন কথা প্রসঙ্গে বাবাজীকে তিনি প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা দাদা! দেশকে ভালবাসা কি অপরাধ ?"

"দশ ছেড়ে দেশকে ভালবাসা কি রকম ?" সহাস্যে উত্তর দিলেন, বাবাজী মহারাজ। ক্ষণপরে আরো পরিষ্কার ভাষায় উপস্থাপিত করিলেন তাঁহার নিজস্ব বক্তব্য। কহিলেন,—"ভাইয়ে ভাইয়ে যদি বিরোধ লাগে, তবে বাড়ির ওপর টান কি রকম ?"

বাবাজী মহারাজের বক্তব্যের তাৎপর্য, দেশ মানে ভৌগোলিক দেশ নয়, এই দেশে যারা বাস করে তাহারা প্রকৃত 'দেশ'। তাহাদের ভালবাসাকেই বলে দেশকে ভালবাসা।

"ভাইদের ভালবাসা ঠিকই আছে, বিদেশী শত্রুরাই ভাইদের মনকে বিষিয়ে রেখেছে। ওরা চলে গেলেই আবার ভাইএ ভাইএ ঠিক মিল হয়ে যাবে।" উত্তর দিলেন পুলিনবাবু।

বাবাজী মশায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"স্বদেশ বলতে কতটুকু ?"

"কেন ? সমগ্র ভারত।"

"ধরুন যদি তাই হয়, তবে সমগ্র ভারতের মন কি একা ইংরেজ জাতি বিষিয়ে রাখতে পারে ? মুসলমানেরা বদনার জল খাইয়ে আমাদের জাত নিয়ে নেয়, এও কি ইংরেজের জন্য, না আর কিছু ? পশ্চিমের হিন্দুরা বাঙালীর ঘরের অন্ন খেলে জাত যায়, এও কি ইংরেজের জন্যে ? সমস্ত ভারত জুড়ে যে এত জাতপাঁত ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার, এও কি ইংরেজের জন্যে ? আচ্ছা! ওরা এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেই কি সব এক হয়ে যাবে ? তারপর, যে দেশে কেউ মারা গেলে পর্যন্ত তার দেহটার জাত বেঁচে থাকে, ভিন্ জাত ছুঁলে সেই মৃতদেহটারও জাত যায়, যে ছোঁয় তারও।—এও কি ইংরেজের জন্যে ?"

অন্তরাত্মায় যেন প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়াছে বাবাজী মহারাজের। ভাবাবেগের সঙ্গে বলিয়া চলিলেন, "ভেবে দেখুন দেখি, ইংরেজ

আমাদের পরাধীন করেছে না আমরা সেধে যেচে এগিয়ে গিয়ে হাতে পায়ে বেড়ী পরে পরাধীন হয়ে বসেছি। আরও শুনুন,—ছোট জাত বলে যাদের ঘৃণা করি তাদের হাতের পয়সা নিতেও পর্যন্ত আমাদের মনে সঙ্কোচ আসে। সে পয়সা মাটিতে রাখিয়ে জল দিয়ে ধুয়ে নিই, এও কি ইংরেজ ক'রে দিয়েছে? শুধু কি তাই, ছোট জাতের বাড়িতে 'নারায়ণ শিলা' গেলে তাঁরও জাত যায়, আর সেই জাত-যাওয়া নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালে উঁচু জাতের জাত যায়।"

পুলিনবাবু এই উদার, জনদরদী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বৈষ্ণবের দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

বাবাজী মহারাজের বক্তব্যের নির্যাস: নিতাই গৌরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই বাংলাই একদিন আগামী দিনের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ স্থাপন ক'রে গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তরে আজও তা দিক্-দর্শন হিসাবে ধরা আছে।

"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি কোথা বা ছিল এ রঙ্গ—গৌর প্রবর্তিত নাম সংকীর্তনে ঈর্ষা, দ্বেষ, জাতপাঁতের বিভেদ আদি মুছে গিয়ে প্রেমের উদয় হয়। ক্রমে মানুষের অন্তরে বিস্মৃত কৃষ্ণ-স্মৃতি জাগে। তারপর দেখে বিশ্বজুড়ে সবই, সবাই কৃষ্ণদাস। তখন নিখিল বিশ্বের সব কিছুই 'আমার প্রভুর' এ বোধ আসবে। বিশ্ব বৈষ্ণবের সেবা ক'রে ধন্য হবে, সুখী হবে।"

সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা, আত্মিক সাধনায় সদা আগ্রহী, অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় সেবার বরিশাল হইতে বাবাজী মহাশয়কে এক পত্র লিখেন:

প্রিয় রামদাস!

দীর্ঘ দিন কাটিয়া গেল, সেই কাশিমবাজারের উৎসবের পর আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। সর্বদা প্রার্থনা করি, প্রভুর কৃপায় তোমার সর্বত্র কুশল। আজ একটি গুরুতর প্রস্তাব-সহ তোমার নিকট

একখানা সংবাদপত্রের অংশ বিশেষ পাঠাইলাম। তুমি শ্রীনিত্যানন্দের অশেষ কৃপাভাজন। শ্রীমান্ হুশেন্ আলিকে তোমার নিকট শীঘ্রই পাঠাইতেছি। শ্রীনিত্যানন্দের আদর্শ স্মরণ করিয়া তাহাকে তুমি আশীর্বাদ করিও। অত্রস্থ কুশল। প্রভুর ইচ্ছায় তোমার সান্নিধ্য শীঘ্রই ঘটিবে বলিয়া মনে করি। ইতি—অশ্বিনীকুমার দত্ত

দত্ত মহাশয়ের দাগ দেওয়া বরিশাল হিতৈষীর অংশটি ভক্তেরা বাবাজী মহারাজকে পড়িয়া শুনাইলেন:

'বরিশালের বাটাজোড় নিবাসী এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান হুশেন আলি তাহার স্বজাতীয়ের নিকট হইতে নানাভাবে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতেছেন। হুশেনের অপরাধ, সে হিন্দুদের হরিনাম করে। এই হরিনাম করা অভ্যাস তাহার বাল্যাবধি। প্রথম প্রথম বাড়িতেই মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ধমক দিয়া এই অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করা, কীর্তন করা, বৈষ্ণবের সঙ্গ করার অভ্যাস তাহার বৃদ্ধি পায়। ফলে ধমক ছাড়িয়া প্রহার, পরে অত্যাচার উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলে। এখন তাহার জীবন-সংশয় উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছে। দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছে, একটি চক্ষু পুরাপুরি নষ্ট হইতে চলিয়াছে। কোনো মুসলমান তাহাকে সামান্য আশ্রয় ভরসাও দেয় না, আর কোনো হিন্দুও তাহাকে রক্ষা করিবার সাহস পান না। পুলিস আসিয়া শুধু মজা দেখিয়া যায়। আমরা, উদারচেতা বৈষ্ণবদের নিকট আবেদন জানাইতেছি, ভারত ধন্যকারী ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ ও যবনকুলজাত শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সংমিলিত বৈষ্ণব ধর্মের উদার পন্থা অনুসরণ করিয়া এই হুশেন আলি নামক বৈষ্ণবের দেহ মনকে রক্ষা করুন।'

পড়া হইলে দেখা গেল রামদাস বাবাজী মহারাজের দেহে মনে করুণার প্লাবন বহিতেছে। চোখ দুটি অশ্রু-সজল, সারা অঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। অনুচ্চস্বরে বার বার ধ্বনি দিতেছেন,—জয় নিতাই, জয় দয়াল নিতাই।

কিছুদিন পরের কথা। বাবাজী মহারাজ শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গায় বার্ষিক উৎসবে যোগ দিয়াছেন। "চাঁদের হাটের মতো গণসহ বাবাজী সেখানে বিরাজিত। শ্রীখণ্ডের রাখালানন্দ ঠাকুর, বসন্তকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়, নবদ্বীপ মল্লিক মহাশয় প্রভৃতি আছেন, এবং বাংলা ও উড়িষ্যার খ্যাতনামা অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব ও গোস্বামীবৃন্দও আছেন, গৌর-নরহরির রসাল প্রসঙ্গে সে স্থানটি মশগুল। এমন সময় এক আগন্তুক এসে সবার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন।

"প্রায় একশত হাত দূর থেকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করতে করতে ৩৫।৩৬ বৎসর বয়স্ক এক মুসলমান দরবেশ এলেন—পরনে ছেঁড়া চট্। তিনি তাঁদের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর দু-চোখে জলের ধারা, অঙ্গ ঘন ঘন কম্পিত। নিকটে এসে, চোখের জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে ভগ্ন স্বরে রামদাস বাবাজীর কাছে আত্মপরিচয় দিলেন[১] :

"আমি পাপিষ্ঠ হুশেন-আলি। দীন-দয়াল অশ্বিনীবাবুর সাহায্যে প্রথমে নবদ্বীপে যাই, সেখানে আপনাকে না পেয়ে, সখীমার কৃপায়, আজ এখানে আসতে পেরেছি?—বলেই দ্রুত ছুটে এসে বাবাজী মশায়ের শ্রীচরণে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

"তারপর সে কি এক হৃদয় বিদারক ক্রন্দন! বিরাট মেলা। আবার সময়টি দিবাভাগ। তাই অল্প সময়ের মধ্যে স্থানটিতে বহু জনসমাগম ঘটল। বাবাজী মশায় ও সেখানে যাঁরা সমাগত সকলের চোখেই জল। বাবাজী মহাশয় থরথর ক'রে কাঁপছেন। একটু স্থির হ'লে, আমাদের ভাইদের মৌন ইঙ্গিতে জানালেন,—একে নাও।

"অনুভবী ভ্রাতৃবৃন্দ সেই হুশেন আলিকে ভ্রাতৃস্নেহে প্রথমে নরহরির প্রাণগৌরকে দেখালেন, পরে বাৎসল্যে প্রসাদ পাওয়ালেন, তারপর ক্ষৌরকার্য ও স্নান সারিয়ে তাঁর দ্বাদশ অঙ্গে তিলক রচনা দিলেন গোপীদা। হুশেন, এখন আমাদের গোষ্ঠীর জন। দু'দিন পরে কলকাতায় ফেরা। পরদিনই নবদ্বীপ। সাথে সাথে ভক্তপ্রবর হুশেন আলিও আছেন।"

১ শ্রীরামদাস প্রতিভা : রামকিঙ্কর দাস।

রামদাস বাবাজীর পূতজীবন বিপুল অলৌকিক শক্তি এবং কারুণ্যে ভরপুর। কত পাষণ্ড ও পাপাচারী মানুষ যে তাঁহার স্পর্শে ও নয়ন-সম্পাতে উদ্ধার পাইয়াছে, দিব্য জীবনের স্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, তাহার অবধি নাই। তখন তিনি নবদ্বীপ সমাজ বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। এ সময়কার এক বিচিত্র ঘটনা[১] :

"সেদিন তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ায় এক পাঁড় মাতাল। বাবাজী মহাশয় এগিয়ে এসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠীর সাথীরাও। মাতালটি বাবাজীমশায়ের দিকে এক অদ্ভুত ধরনের চাউনির সঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করল,—'আ—প—নি—রা—ম—দা—স বাওজী ?'

"বাবাজীমশায় মৃদুহেসে বললেন,—'হ্যাঁ, লোকে তাই বলে।' মাতালটি মদের বোতল ছ'টোকে আরও শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে বললে,—'আমি মানকুণ্ডুর উ—পে—ন দত্ত। মেলাই খুন ক'রেছি। এই দেখুন পিঠে কত ছোরার দাগ।'

"বলেই পিছন ফিরে দাঁড়াল। তারপর সামনে ফিরে নত হ'য়ে আরও সম্মুখে, বাবাজীমশায়ের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ব'ললে,—'আপনি রামদাস বাওজী? ঠিক তো ? এই গোসাঞি বাওজীরা ! ইনি রামদাস বাবাজী ?'—বলেই এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে বিহ্বল আবেগে টলতে টলতে তাঁর চরণে পড়ার জন্য ঝুঁকতেই, তার বগলের বোতল ছ'টি হুম্ হুম্ আওয়াজে পড়ে ভেঙে গেল। বিকট মদের গন্ধে চারদিকটা ভরে গেল। সখীমা, গোস্বামীবৃন্দ ও আর আর সবাই ছিটকে পড়ার মতো স'রে গেলেন। কিন্তু করুণ নয়নে দাঁড়িয়ে রইলেন বাবাজীমশায়।

"মাতালটা সেই মদ আর ধূলা মাখানো মাটিতে টান্ টান্ হ'য়ে শুয়ে পড়ল। এক আশ্চর্য ধরণের বেদনা ও আর্তিভরা স্বরে চিৎকার ক'রে সে বললে, "আপনি রামদাস বাবাজী তো ? আপনি রাম-দা' বাওতো ? আপনি আমায় উদ্ধার ক'রতে পারবেন ? আমি উপেন দত্ত। আপনি রামদাস বা—।" তারপর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

১ রামদাস প্রতিভা : ঐ

কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্থানটিতে এক ভিন্ন ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি হ'লো। ভক্তেরা কেউ কেউ সম্ভবত পুলিসে খবর দেবার ব্যবস্থার জন্য চলে গেলেন।

"বাবাজী মশায়ের দুই চক্ষু বেয়ে দরদর ধারে জল পড়ছে। হাতের জপের মালাঝোলাটি গলায় নিয়ে কি যেন ভাবছেন, আর থরথর ক'রে কাঁপছেন। চরণ দুটিতে ছড়ানো মদ এসে লেগেছে। সে এক বিচিত্র দৃশ্য।

"সবাই সরে গিয়েছেন, কেবল উনিই যান্ নি মাতালকে ছেড়ে। অকস্মাৎ 'হা নিতাই' বলে হুঙ্কার ক'রে, সেই মাতালটিকে টেনে তুলে সোজা ক'রে দাঁড় করালেন। মাতালটি বাবাজী মশায়ের বুকে এলিয়ে পড়ল। কয়েক পা বাবাজী মশায়ের সঙ্গে এসেই আবার প'ড়ে গেল। তখন বাবাজী মশায় তার ভ্রূ দু'টির মাঝখানে, ডান হাতের বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে কি যেন জপ করলেন। মাতালটি নিথর হয়ে শুয়ে রইলো।

"এতক্ষণে ভক্তেরা কিছুটা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কারো সাহস হচ্ছে না যে বাবাজী মশায়কে ওখান থেকে সরিয়ে আনে।

"বাবাজী মশায়ের সেই জপের পরেই মাতালটি ঝিমুনি চোখে এদিক ওদিক তাকালো। এবার বাবাজী মশায় তার কপালের উপর ডান হাতের তালুটি কিছু সময় চেপে ধরলেন। বিড়বিড় ক'রে কি যেন বললেন। মাতাল উঠে বসলো। বাবাজী মশায় তখনও হাঁটু মুড়ে বসে। তারপর তিনি মাতালের পিঠের দিকে বাম বাহু দিয়ে চাপ দিতেই মাতালটি দাঁড়াল। বাবাজী মশায় মাতালকে বামদিকে ধ'রে মরমী বন্ধুর ভঙ্গীতে চলতে লাগলেন।

"উভয়ে মঠের গেট পার হলেন। শ্রীবাস অঙ্গনের ঘাটের দিকে চলেছেন। এ দৃশ্য দেখে মঠবাসীরা বিস্মিত অথচ মৌন। সখীমার মৌন ইঙ্গিতে মাষ্টারদা পিছনে পিছনে গেলেন। আবার কয়েক পা যাবার পরই বাবাজী মশায়ের আদেশ না পেয়ে ঐভাবে ফিরে

এলেন। সখীমার তখনো প্রসাদ পাওয়া হয় নি। কারণ, বাবাজী-মশায় প্রসাদ পান নি। তিনি ঘন ঘন 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলতে বলতে আশঙ্কায় বিষণ্ণ হয়ে এদিক ওদিক করতে লাগলেন।

"সন্ধ্যার আরতির পর বাবাজীমশায় ফিরে এলেন, পিছনে সেই মাতাল। তার গলায় তখন বাবাজী মশায়ের নিজের পাঁচকণ্ঠী মালার দু'কণ্ঠী; বিনয় নম্র অপরাধী সেবকের মতো আমাদের 'উপেন-দা' ফিরে এলেন।"

কলকাতার পাটুয়াটোলায় বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে কীর্তন। কীর্তন সমাপ্ত হওয়ার পরে, বাড়ির মালিক রায়বাহাদুর মহাশয় অনুরোধ জানান বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গীদের, "এবার তাহলে একবার সবাই ওপরে চল।"

রায়বাহাদুর বাবাজীর পূর্বপরিচিত ব্যক্তি, দীর্ঘদিন উভয়ে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। উপরে গিয়া দেখা গেল প্রচুর ভোজনের আয়োজন।

—"রামদাস! কিছু প্রসাদ নাও ভাই" রায়বাহাদুরের 'রায়'। সেবক সঙ্গীগণ চঞ্চল হলেন। তাঁদের সঙ্গে যে ঠাকুর এসেছেন! এঁদের ঠাকুর যে বন্ধুর মত চিত্র বিগ্রহ হ'য়ে কাছে কাছে ফেরেন। তাঁর মুখে না দিয়ে এঁরা কেমন ক'রে অন্য বাড়িতে প্রসাদ পাবেন? তাঁরও তো স্বতন্ত্র সেবা চাই? এই কারণেই প্রসাদ পেতে এঁদের সঙ্কোচ এসেছে। সে কথা এঁরা বিনীত স্বরে জানাতে······তাঁদের অসমাপ্ত আবেদনে রায় বাহাদুরের ব্রাহ্মণ্য সত্তা অধীর হয়ে উঠলো। বান্ধব-প্রীতির-ডুরি বুঝি ছিঁড়ে গেল। রায় বাহাদুরের ঘুমন্ত সংস্কার জাগ্রত হলো।

—'আজ্ঞে, আমাদের সঙ্গে ঠাকুর আছেন······'

—এটি বাবাজী মশাইর শিষ্য সন্তানগণের অসমাপ্ত আবেদন। জোড়করে জানালেন তাঁরা।

বাবাজীমশায় উদাস নেত্রে নীরবে মালা জপিয়া চলিয়াছেন। আর

ভক্ত শিষ্যেরা এ সংকটে একে অপরের দিকে চাহিতেছে। বাবাজী মহারাজ কি সিদ্ধান্ত নিবেন তাহা তিনিই জানেন।

ইতিমধ্যে রায়বাহাদুরের চোখ মুখ অভিমানে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলিয়া উঠেন, "তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়, ব্রাহ্মণবাড়ি, নারায়ণের নৈবেদ্য! এ প্রসাদ নেওয়া চলবে না কেন? আর ঐ যত সব অজাত কুজাত ন্যাড়া শিষ্যের ভোগ দেওয়া হ'লেই ভক্তি ক'রে খাবে…।"

ভক্তসেবকেরা বিমূঢ় অবস্থায় বাবাজীর দিকে চাহিয়া আছেন। আর বাবাজীর গৃহী-ভক্তদের দু'চারজন মহা উত্তেজিত, গুরুর ইঙ্গিত পাইলেই রায়বাহাদুরের উপর হানিবেন প্রচণ্ড আঘাত। বাবাজী মহারাজ কিন্তু অসীম ধৈর্য নিয়া অপেক্ষমাণ।

রায়বাহাদুর এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়েন, দৃপ্তস্বরে বলেন, "এরা তোমায় কেষ্ট বিষ্টু যাই ভাবুক, রামদাস, আমি জানি তুমি 'রাধিকা গুপ্ত।' ছত্রিশ জাতের গুরু হয়েছ, লোকে তোমায় পূজা করে। এত দম্ভ তোমার?—যাও যাও, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে। ফল, নৈবিদ্দি আমি কুকুরকে খাইয়ে দেব।"

"বাবাজীমশায়ের সজল করুণ চোখের ইঙ্গিতে ধনী গৃহী ভক্তবৃন্দ স্তব্ধ শান্ত। তারপর তিনি রায়বাহাদুরকে বল্‌লেন, 'কৃপা করুন, আমার অযোগ্যতায় আপনি ব্যথা পেয়েছেন, দুর্দৈবের দাস আমি।'

ক্ষণপরেই দেখা গেল এক বিস্ময়কর পটপরিবর্তন। 'কি হলো কি হলো' বলে উত্থিত হলো কোলাহল। রায়বাহাদুর মূর্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, আর তাঁর মাথাটি রয়েছে বাবাজী মহারাজের চরণতলে।

বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয়ের বর্ণিত একটি ঘটনায় তাঁহার পতিতপাবনী রূপটি উদ্‌ঘাটিত হইতে দেখা যায়। উর্মিলাদাসী নামে একটি পতিতা রমণী বাবাজী মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি ছিলেন মধ্য বয়সী, গায়ের রং ও

চোখ-মুখ দেখলে মনে হয়, যৌবনকালে রূপ ছিল তাঁহার অসামান্য, গর্ব করার মতো। ঢাকার এক ধনী ব্যবসায়ীর প্রাক্তন রক্ষিতা ছিলেন এই রমণী। বাবাজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণের পর হইতে এই শিষ্যার জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। গুরু নির্দেশিত ভক্তি সাধনার পথটি ধরিয়া নিষ্ঠাভরে তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন।

নবদ্বীপ সমাজ বাড়ির সখিমারও খুব স্নেহভাজন ছিলেন ঊর্মিলা দাসী। এখানকার পূজা-উৎসবে, কীর্তনে, ভোগরাগে সর্বদা তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে দেখা যাইত, সাধু বৈরাগীদের নানা অনুষ্ঠানে তিনি সহায়তা করিতেন।

সে-বার রামদাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপ সমাজবাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। একদিন ঊর্মিলা দাসী তাঁহার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত। বাবাজী মহারাজের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তিনি কহিলেন, "বাবা, আমার একটি বাসনা আপনাকে পূরণ করতে হবে।" বলিতে বলিতে ভাবাবেগে তাঁহার সারা দেহ কাঁপিতে থাকে, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতে থাকে নয়নাশ্রু।

প্রসন্ন গম্ভীর বদনে বাবাজী মহারাজ উত্তর দিলেন, "নিতাই চাঁদের ইচ্ছা।"

উপস্থিত সবাই ভাবিলেন, অন্যান্য বারের মতো এবারও ঊর্মিলা হয়তো কোনো বড় উৎসব ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করিবেন এবং আশ্রমে দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিতে থাকিবে।

পরের দিনই একটি বড় এবং ভারী স্যুটকেশ হাতে নিয়া ঊর্মিলা মঠের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ান।

অন্য দিনকার মতো স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক নয় তাঁহার এই আগমন। মঠের বিগ্রহ ও সাধুদের যথাক্রমে প্রণাম নিবেদন না করিয়া নীরবে নতমস্তকে তিনি দণ্ডায়মান। কয়েকজন মঠবাসী কৌতূহলী হইয়া উঠেন, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ঘিরিয়া দাঁড়ান তাঁহাকে।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, "কি ব্যাপার দিদি, এভাবে এখানে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে কেন?"

উত্তরে তিনি কহিলেন, গুরু রামদাস বাবাজীর কাছে তিনি তাঁর একটি বাসনা পূরণের জন্য আবেদন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যই এখানে এ সময়ে তাঁহার আসা।

"কি আপনার বাসনা?" এই প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন, "সে কথা ভেঙে বলবো বাবার কাছে। তাঁকে একবার খবর দিন।"

সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামদাস বাবাজী তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইয়া আসেন। কিছুক্ষণ ঊর্মিলা দাসীর দিকে গম্ভীর বদনে তাকাইয়া থাকিয়া বাবাজী মঠের গেটটি বন্ধ করার ইঙ্গিত দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা গেটে তালা লাগাইয়া দিল, হঠাৎ কাহারো ভিতরে ঢুকিবার সম্ভাবনা রহিল না।

বাবাজী মহারাজের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিতা হইয়া প্রণাম জানাইলেন ঊর্মিলা। তারপর দুই হাত দিয়া স্যুটকেশটি তুলিয়া ধরিয়া আনন্দের আবেগে গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "বাবা, কয়েক মাস আগে কৃপা ক'রে স্বপ্নে আপনি আমায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যা গেছে তা যাক্। তুই আর ওখানে থাকিসনে।"

তাই বাবা এবার আমার পুরনো আশ্রয় ছেড়ে চলে এসেছি। আমার যা কিছু বিত্ত সম্পদ আছে, তা সবই রয়েছে এই স্যুটকেশের ভেতর। আপনি কৃপা ক'রে এগুলো অঙ্গীকার করুন, আর আপনার রাতুল চরণে আমায় স্থান দিন।"

বাবাজী মহারাজের চোখ-মুখ এবার অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর হইয়া উঠে, চিত্রার্পিতের মতো স্থিরনেত্রে তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে মঠের দুইটি ভক্ত ঊর্মিলা দাসীর হাত হইতে স্যুটকেশটি নিয়া উহার ডালা খুলিয়া ফেলেন। দেখা যায় এক অদ্ভুত দৃশ্য! সোনা ও জড়োয়ার অজস্র সেটের গহনা স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে ঐ স্যুটকেশে, আর সূর্যকিরণে সেগুলি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

ঊর্মিলার সারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নিহিত রহিয়াছে এই স্বর্ণ ও হীরা জহরতের বহুমূল্য অলংকারসম্ভারে। এগুলি গুরুদেবের চরণে অর্পণ করিয়া তিনি ভারমুক্ত হইতে চান, মুক্তি পাইতে চান মোহ-

বন্ধনের হাত হইতে। এই সঙ্গে পূর্বেকার ধনী প্রেমিক ও আশ্রয়-দাতার সমস্ত কিছু সংস্রব ত্যাগ করিয়া বাবাজীর নির্দেশ মতো যাপন করিতে চান বৈরাগিণীর ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া রামদাস বাবাজী এতক্ষণ ঊর্মিলার দিকে তাকাইয়া ছিলেন। এবার তাঁহার সারা দেহে ভাবাবেশে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তারপর একটা বিস্ফোরণের মত তিনি ফাটিয়া পড়েন। দৃঢ় কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠেন, "এখানে নয়, এখানে নয়। এ সব নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও।"

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে বাবাজী মহারাজ সে স্থান ত্যাগ করিলেন। ঊর্মিলার দুই চোখ বাহিয়া নামিল অশ্রুর প্লাবন। আবেগভরা কণ্ঠে বার বার সখিমার কাছে কহিতে লাগিলেন, "আমায় স্থান দিন, আমি বড় দুঃখিনী। আমি আপনাদেরই।"

বাবাজী মহারাজের এই বজ্রকঠোর রূপে সঙ্গে মঠের সকলেরই পরিচয় আছে। তাঁহারা ভক্ত ঊর্মিলাকে সস্নেহে বুঝাইতে থাকেন, এই বৈরাগী মহাপুরুষের মুখ হইতে একবার যে কথা বাহির হইয়াছে তাহা ফেরানোর উপায় নেই। তুমি এসব বহুমূল্য অলংকার নিয়ে এখনি স্বস্থানে চলে যাও।

ঊর্মিলাকে আরো বুঝানো হইল, "বাবাজী মহারাজের অলৌকিকী প্রজ্ঞা, সিদ্ধান্ত নিবার বেলায় কখনো ভুল করে না। ঊর্মিলা তুমি আর দেরি না ক'রে এ স্থান ত্যাগ করো।"

পরের দিন সংবাদ পাওয়া গেল, ঊর্মিলা দাসী তাঁহার নিজের বাসভবনে পৌঁছিয়াই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। একেবারে শয্যাশায়িনী। মঠ হইতে প্রতিদিন তাঁহার জন্য প্রেরিত হইতে থাকে ঔষধ এবং পথ্যাদি। তাঁহার শুশ্রূষার সমস্ত ব্যবস্থাও এই সঙ্গে করা হয়।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। ঊর্মিলাকে দেখা গেল মঠের প্রাঙ্গণে, বাবাজী মহারাজকে শেষ দেখা দিতে তিনি আসিয়াছেন। অজস্র ফুলে পাতায় সুসজ্জিত একটি শবাধারে তাঁহার মৃতদেহটি শায়িত।

গলায় প্রসাদী মালা। কপালে ব্রজরাজের তিলক চিহ্ন। হরিধ্বনি দিয়া বাহকেরা তাঁহাকে নিয়া চলিল শেষ কৃত্যের জন্য।

"উর্মিলা তুই আর ওখানে থাকিসনে" বলিয়া যে স্বপ্নাদেশ বাবাজী মহারাজ দিয়াছিলেন, তাঁহার মর্ম এবার বুঝা গেল। নির্মোহা, বৈরাগ্যব্রতী বৈষ্ণবী উর্মিলাকে গুরু প্রেরণ করিলেন তাঁহার সত্যকার স্বধামে।

প্রায়শ দৈবাদেশে এবং দৈব যোগাযোগের মাধ্যমে রামদাস বাবাজী তাঁর পতিত-উদ্ধারের কাজ সম্পন্ন করিতেন, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িত নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে।

সে-বার আরামবাগ শহরের ভক্তেরা অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার অনুবর্তীদের সাদর আহ্বান জানাইয়াছেন। শ্রাবণ মাস, ঘোর বর্ষাকাল। প্রায় ত্রিশ মূর্তি সঙ্গে নিয়া বর্ধমান স্টেশন হইতে শুরু হইয়াছে বাবাজীর পদযাত্রা।

আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, বৃষ্টিও ঝরিতেছে অবিরল ধারে। ক্ষেত্রের পিচ্ছিল আলপথ দিয়া সন্তর্পণে সবাই চলিয়াছেন, কিন্তু খোল বাদ্য এবং কীর্তনের বিরাম নাই। ক্রমে প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়, রাস্তা ক্ষেত জুড়িয়া সব কিছু হয় জলে জলাকার। এদিকে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলা দায় হইয়া উঠিয়াছে।

এভাবে হাঁটুজল ভাঙিতে ভাঙিতে আর কীর্তন করিতে করিতে সবাইর দৃষ্টি পড়ে অদূরস্থিত একটি লণ্ঠনের আলোর দিকে, একটি ক্ষুদ্র চালাঘরে নিরিবিলি উহা জ্বলিতেছে এবং আরামবাগ শহরের উপান্তে এই নিভৃত স্থানটি। বৃষ্টি তখনো অবিরলধারে ঝরিয়া চলিতেছে এবং সত্বর থামিবার কোনো আশাও নাই। আপাতত এই ক্ষুদ্র চালাঘরেই আশ্রয় নেওয়া যাক্, ভাবিয়া সবাই ঐ চালাঘরের বারান্দায় উঠিয়া পড়িলেন।

বাড়ির মালিক ষাট বৎসরের এক বৃদ্ধা। "এসো বাবা এসো, এখানে বসে তোমরা একটু জিরিয়ে নাও," বলিয়া বাবাজী মহারাজ

ও তাঁহার ভক্তদের সে অভ্যর্থনা জানায়। বৃদ্ধার ধারণা, এই কীর্তনিয়ারা শহরে গানের বায়না পাইয়াছে, কিছুটা বিশ্রামের পরই সেদিকে যাত্রা করিবে।

বারান্দার পাশে ছোট্ট একটি উনুনে আগুন জ্বলিতেছিল, ভেজা খোলগুলি সেই আগুনের তাপে কিছুটা শুষ্ক করিয়া নিয়া সবাই আবার কীর্তন শুরু করিলেন। ক্রমে এ কীর্তন জমাট বাধিয়া উঠিল।

এদিকে আরামবাগের উদ্যোক্তারা বাবাজী মহারাজের সন্ধানে সদলবলে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সঙ্গে কতকগুলি হ্যাসাক বাতি ও হারিকেন লণ্ঠন।

বৃদ্ধার অঙ্গনে পৌঁছিয়া কীর্তনরত বাবাজী মহারাজের সম্মুখে তাঁহারা অপেক্ষা করিতে থাকে। এবার বাবাজীর দলটিকে পথ দেখাইয়া শহরে নিয়া যাওয়া হইবে।

বাবাজীর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা জানাইয়া দেন, তিনি কীর্তনে এমন মত্ত হইয়া আছেন যে, এ সময়ে তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিতে বলা কাহারো সাহসে কুলাইবে না।

কি জানি কি ভাবিয়া আরামবাগের উদ্যোক্তারা বৃদ্ধার এই অঙ্গনেই অষ্টপ্রহর কীর্তনের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। জলকাদার মধ্যেই বিরাট সামিয়ানা টানাইয়া ফেলা হইল। আলোর সুব্যবস্থা করিতেও দেরি হইল না। বৃদ্ধার অঙ্গন পরিণত হইল এক পুণ্যময় কীর্তনস্থলীতে। পরের দিন শহরের ভক্তেরা আসিয়া সোৎসাহে সেখানে যোগ দিলেন। শুরু হইল দুই দিন ব্যাপী কীর্তনের মহোৎসব।

বৃদ্ধা প্রায় তিনদিন যাবৎ উপবাসী, বাবাজীর সান্নিধ্য আর ভক্ত বৈরাগীদের এই কীর্তন যজ্ঞে আপনাকে সে যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। তরুণ বয়সে সে ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজচ্যুত, দীর্ঘ এতগুলি বৎসর তাঁহার বাড়িতে উচ্চবর্ণের লোকেরা পদার্পণ করে নাই। আজ তাহার গৃহটিই বাবাজী মহারাজের প্রসাদে হইয়া উঠিয়াছে এক পুণ্যতীর্থ।

কৃপালু রামদাস বাবাজী এই বৃদ্ধাকে সানন্দে নামদীক্ষা দিলেন।

নামকরণ করিলেন, সত্যদাসী। আনন্দে ও ভাবাবেগে অধীর হইয়া সত্যদাসী বাবাজীর ভক্তদের চরণ ধরিয়া বার বার বলিতে থাকে আপনারা এখান থেকে আমায় নিয়ে চলুন আপনাদের সাথে, নইলে আমি কিন্তু প্রাণে বাঁচবো না।"

কোনো সান্ত্বনা বাক্যেই সে আর প্রবোধ মানিতে চায় না, বাবাজী মহারাজের কাছ হইতে দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে চিত্ত তাহার উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বা কোনো পুণ্যতীর্থে আশ্রয় নিতে না পারিলে সে নিশ্চয় মাথা খুঁড়িয়া মরিবে। অবশেষে স্থানীয় কয়েকটি ভক্ত সত্যদাসীর একটা সুব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার জমিজমার স্বত্ব গ্রহণ করিয়া একজন তাঁহাকে দেড় হাজার টাকা দিয়া দিলেন। অতঃপর এই টাকা বৃন্দাবনের মদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরে জমা দিয়া সেখানে আজীবন সত্যবালার খোর-পোষের ব্যবস্থা করা হইল।

এমনিভাবে সেদিনকার দুর্যোগের রাতে বাবাজী মহারাজের আগমন সমাজে অপাংক্তেয় পথভ্রান্তা ভ্রষ্টা নারীর সত্যবালার জীবনে বহাইয়া দিল ভক্তিময় জীবনের অমৃতপ্রবাহ।

কয়েকমাস পরে রামদাস বাবাজী ভক্তগণসহ বৃন্দাবনে গিয়া উপস্থিত হন। এসময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ভক্তিমতী শিষ্যা সত্যবালার। বাবাজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য, প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "আরামবাগের সেই বুড়ীকে দেখতে পেলাম। তখন তাঁর নাম সত্যদাসী। দেখেই সে আমাদের চিনলে। তার আবাসে আমাদের একদিন নিমন্ত্রণ করেছিল শ্রীমদনমোহনের প্রসাদ পেতে। দেখলাম গোঁসাই বাড়ির অন্দরে সত্যদিদির সম্ভ্রম খুব। তিনি প্রত্যহ একলক্ষ নাম জপ করেন। প্রতিটি ব্রত নিরম্বু উপবাস করেন। গোঁসাই বাড়ির পাশে একটি ঘর পেয়েছেন। সেটা তাঁর ভজন কুটির। বৌঝিরা সত্যদিদিকে পিসিমা বলে ডাকেন।"

স্বগণসহ বাবাজী মহারাজ সেদিন পুরীধামের পুণ্যময় রথ-উৎসবে

যোগদানের জন্য চলিয়াছেন। হাওড়া স্টেশনে ভক্তদের পঙ্‌ক্তি-ভোজন শেষ হইল। সবাই রিজার্ভ কামরায় উঠিতে যাইবেন, এমন সময়ে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। নন্দ বাবাজীর কাছে একটি সুটকেশ ছিল, তার উহাতে রক্ষিত ছিল রথ উৎসব উপলক্ষে তোলা ভিক্ষা—প্রায় দুই হাজার তিনশত টাকা। ভদ্রবেশী এক দুর্বৃত্ত এটি অপহরণ করে এবং নিশ্চিন্ত আরামে পাশের প্ল্যাটফরম স্থিত একটি ট্রেনে উঠিয়া বসে। কিছুক্ষণ পরে সি-আই-ডি পুলিস নন্দ বাবাজীকে সঙ্গে নিয়া হাতে নাতে ঐ সুটকেশ চোরকে ধরিয়া ফেলে।

গোড়ার দিকে যথেষ্ট বিক্রম দেখানোর পর ভদ্রবেশী চোরটি শেষটায় নীরব ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, পুলিস বেষ্টিত অবস্থায় তাহাকে প্ল্যাটফরম দিয়া নিয়া যাওয়া হয়। চারিপাশে তখন উৎসুক জনতার ভিড়।

ভক্তেরা মনে প্রাণে চাহিতেছিলেন যে এ দৃশ্যটি বাবাজীর চোখে না পড়ে, তাঁহার মনঃপীড়ার কারণ না ঘটে। কিন্তু পুলিস ও স্টেশনকর্মীরা সরবে চোরটিকে তাঁহার সম্মুখ দিয়াই হাঁটাইয়া নিয়া যাইতে থাকে।

পুলিস বেষ্টিত অপরাধীটি কাছ দিয়া যাওয়ার সময় বাবাজী মহারাজ তাঁহার এক গুরুভাইকে কহিলেন, "তুমি ওঁকে জিজ্ঞেস করো, ওঁর বোধহয় কোথাও যাওয়ার জন্য একটি পয়সাও হাতে নেই। কিছু টাকা ওর হাতে দাও। কষ্ট খুবই হয়েছে ওঁর।"

বাবাজী মহারাজের অশ্রুসজল চোখ ও বেদনাভরা কণ্ঠ শুনিয়া সবাই বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে সুটকেশ চোরটির কি জানি কি হইল থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাবাজী মহাশয়ের চরণতলে লুটাইয়া পড়িল।

জপমালা হস্তে বাবাজী মহারাজ প্রস্তরমূর্তির মতো দণ্ডায়মান, দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। স্টেশন মাস্টার, পুলিস চীফ এবং সঙ্গীয় প্যাসেঞ্জারেরা সবাই এই করুণার্দ্র দেবমানবের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিয়াছেন।

অল্পক্ষণ পরেই অবস্থাটি স্বাভাবিক হইয়া আসিল, বাবাজী মহারাজ সদলবলে ট্রেনে চাপিয়া বসিলেন, সুটকেশ অপহরণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কেহ আর সেখানে রহিল না।

এ ঘটনার দুইমাস পরে, বাবাজী মহারাজ পুরীতে হরিদাস নির্যাণ উৎসবে মত্ত হইয়া আছেন। হঠাৎ হাওড়া স্টেশনের সেদিনকার সেই সুটকেশ অপহরণকারী লোকটি দীনহীন কাঙাল বেশে আসিয়া তাঁহার চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করে, আত্মানুশোচনা এবং আত্মশুদ্ধির আগুনে ইতিমধ্যে সে নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে।

স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বাবাজী মহারাজ তাহাকে সেই দিনই দীক্ষা দান করিলেন। নব নামকরণ হইল—নরহরিদাস। কিছুদিন পরে বেশাশ্রয় করাইয়া ভেক দেওয়া হইলে ব্রজমণ্ডলের রাল্ নামক গ্রামে গিয়া সাধক নরহরি ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন যাপন করিতে থাকেন, বহু বৈষ্ণব গুরুভাইর শ্রদ্ধা আকর্ষণে তিনি সক্ষম হন। উত্তরকালে ঐ রাল্ গ্রামেই ভজনরত অবস্থায় ঘটে তাঁহার দেহাবসান।

সে-বার কাটোয়ার এক ভক্তের আহ্বানে রামদাস বাবাজী মহারাজ কীর্তন করিতে আসিয়াছেন। সঙ্গে বত্রিশজন ভক্ত এবং শিষ্য। ভাব বিহ্বল হইয়া বাবাজী মহারাজ কীর্তনের অধিবাস সমাপ্ত করিলেন, তাঁহার আর্তি ও সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া শ্রোতারা মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া গেলেন।

পরের দিন মঙ্গল আরতির পরে অখণ্ড নামকীর্তন শুরু হইতে যাইতেছে, এমন সময়ে এক দুস্তর বাধা আসিয়া উপস্থিত। বাবাজী দু-তিনজন সেবক সহ এক বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন, আর দোহার ও বায়েন সহ মূল কীর্তনকারী দলটি রহিয়াছে অপর একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে।

হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল, ঐ ভাড়াটিয়া বাড়িটি বাহির হইতে

কে বা কাহারা একটি বৃহৎ তালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে, দলের লোকদের বাহিরে আসার কোনো উপায় নাই।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা স্থানীয় ভক্তটি তো মহা বিপদে পড়িলেন। তালা ভাঙিয়া ভক্তদের বাহির করিতে গেলে ফৌজদারী মামলায় জড়ানোর আশঙ্কা আছে, তদুপরি রহিয়াছে স্থানীয় কোনো কোনো বিরোধীদলের হাঙ্গামার আশঙ্কা। কি করিয়া এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে, কেহ ভাবিয়া পাইতেছেন না।

এ সংবাদটি বাবাজী মহারাজের কানে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর তিনি একটি ঘোড়ার গাড়ি ডাকাইলেন, দুইজন শিষ্যসহ সরাসরি উপস্থিত হইলেন শহরের থানায়।

বড় দারোগা তখন থানার ভিতরে নিজস্ব কোয়ার্টারে ঘুমাইয়া আছেন। সংবাদ পাইয়া ত্রস্তেব্যস্তে সসঙ্কোচে তিনি বাবাজী মহারাজের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ভাব বিহ্বল দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া দারোগাবাবু তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। তারপর একটু সুস্থ হইয়া জোড়হস্তে নিবেদন করিলেন, "আপনি দয়া ক'রে বাড়ির ভেতরে আসুন।"

বাবাজী মহারাজ ভিতরে প্রবেশ করিলে দারোগাবাবুর স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা একে একে তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

এবার বাবাজীর সঙ্গীরা তাঁহাদের থানায় আসার কারণটি প্রকাশ করিলেন। তদুত্তরে দারোগা গৃহিণী কহিলেন, "কি আশ্চর্য, উনি তখন ঘুমিয়ে রয়েছেন, কনেস্টবল এসে ওঁকে ডাকতেই ঘুম জড়িত অবস্থায় উনি বলে উঠ্‌লেন, 'অ্যাঁ। বাবাজী! বাবাজী!' আমার ধারণা উনি এই বাবাজী মহারাজকেই স্বপ্নে দেখছিলেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন, 'হ্যাঁগো, একটা আশ্চর্য স্বপ্ন এতক্ষণ আমি দেখছিলাম। দিব্যকান্তি এক বাবাজী যেন আমায় ডেকে বলছেন,—বিভূতি! চল যাবে না? স্বপ্নে দেখা সাধুর ঠিক এমনি চোহারা, হাতেও এমনি হরিনামের মালা, ঝোলা। আমি অবাক

হয়ে এই বাবাজীর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌ছি,—উনি স্বপ্নে দেখা বাবাজীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে এঁর হুবহু মিল রয়েছে।”

দারোগা গৃহিণীর কথা শুনিয়া বাবাজী মহারাজ কোনো মন্তব্য করিতেছেন না, শুধু শুধু মুচকি মুচকি হাসিতেছেন।

বাবাজী মহারাজকে সসম্মানে নিজের কোয়ার্টারে বসাইয়া রাখিয়া দারোগাবাবু তৎক্ষণাৎ থানার জমাদারকে পাঠাইয়া তালা ভাঙার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গৃহে আবদ্ধ ভক্তেরা মুক্ত হইয়া আসিয়া সানন্দে কীর্তন শুরু করিয়া দিল।

পরের দিন দেখা গেল, দারোগাবাবু সাগ্রহে বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা নিয়াছেন। তাঁহার ললাটে তিলক রেখা, গলায় তুলসীর পবিত্র মালা, আর হাতে নামজপের ঝোলা।

ছয়মাস পরে শোনা গেল, এই দারোগা বিভূতিবাবু ঘর সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়াছেন, আর স্ত্রী এবং পুত্রকন্যারা আশ্রয় নিয়াছেন তাঁহার শ্বশুরালয়ে। তাঁহার স্ত্রী বাবাজী মহারাজের কাছে আসিয়া যুক্তকরে অকপটে কহিলেন, “আমার স্বামীর প্রকৃত মঙ্গল আর শান্তি যাতে হয়, তাই আপনি করুন।”

ইহার তিন বৎসর পরে বাবাজী মহারাজ একবার বৃন্দাবন ধামে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে গেলে সে সংবাদ চারদিকের ভক্তমহলে, সারা ব্রজমণ্ডলে, ছড়াইয়া পড়িত। তাঁহার আগমন সংবাদ বৈরাগী সাধক বিভূতিবাবুর কানেও গিয়াছিল। অবিলম্বে তিনি বাবাজী মহারাজের চরণ দর্শন করিতে আসিলেন। জানাইলেন, বেশাশ্রয়ের পর তাঁহার নাম হইয়াছে বৈষ্ণবচরণ দাস। ব্রজের গ্রামে পর্ণকুটির বাঁধিয়া তিনি একান্তমনে ভজন সাধন করেন, আর দিনান্তে রুখা-শুখা যাহা কিছু জোটে মাধুকরী করিয়া আনেন। এইভাবে কৃচ্ছ্রময় ভজনে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন।

দর্মাহাটার ভাড়াটে মঠ বাড়িতে বাবাজী মহারাজ মাঝে মাঝে

আসিয়া অবস্থান করেন, আবার স্বেচ্ছামতো অপর কোথাও চলিয়া যান। সে-বার মঠবাড়িতে প্রবেশ করিয়াই গম্ভীর স্বরে বাবাজী ভক্তদের কহিলেন, "প্রসাদ পাওয়ার পর পাতা যেন বাইরে না ফেলা হয়। আর বাইরের কাউকে প্রসাদ না দেওয়া হয়।"

হঠাৎ এ আদেশের তাৎপর্য কি, ভক্তেরা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতেছেন।

বাবাজী আরো জানাইয়া দেন দৃঢ় স্বরে, "গেটে তালা দাও। সকাল সন্ধ্যায় তালা দেওয়া থাকবে। কেউ এসে ডাক্‌লে দেখে শুনে যেন খোলা হয়। নূতন কাউকে ঢুকতে দেবে না।"

এত কড়াকড়ি হঠাৎ কেন? কেউ কেউ বলিলেন, হয়তো বাইরে রাজনৈতিক হৈ-হুল্লোড় থেকে সরে থাকার জন্যই বাবাজীর এই ব্যবস্থা।"

পরদিন বাবাজী মহারাজের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় ভক্তেরা লক্ষ্য করেন, গেটের বাহিরে একটি তরুণী বৈষ্ণবী দাঁড়াইয়া আছে। বয়স আঠার বিশ বৎসরের বেশী নয়। দেহের সৌন্দর্য ও নিটোল স্বাস্থ্য সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েটির গলায় একছড়া তুলসীর মালা, কপালে গোপীচন্দনের তিলক অঙ্কিত। ছোট দুটি করতাল কণ্ঠদেশে ঝুলিতেছে, হাত দুটি জোড় করিয়া নির্নিমেষে সে বাবাজী ও তাঁহার ভক্তদলের দিকে তাকাইয়া আছে। কি যেন সে নিবেদন করিতে চায়, কিন্তু ভয়ে ও সঙ্কোচে তাহা বলিতে পারিতেছে না। বাবাজী ও তাঁহার সঙ্গীরা নীরবে নবীনা বৈরাগিণীর সম্মুখ দিয়া গঙ্গার পথে চলিয়া গেলেন।

সঙ্গী ভক্তেরা সবাই সানন্দে গঙ্গাস্নানে রত, কিন্তু বাবাজী মহারাজের সেদিন যেন বড় ত্বরা। চট্‌পট স্নান সারিয়া তিনি মঠে ফিরিয়া আসিলেন, দ্রুত হস্তে গেটটি বন্ধ করিয়া দিয়া অপেক্ষমাণ রহিলেন গঙ্গায় স্নানকারী ভক্তদের জন্য। তাহারা ফিরিয়া আসিলে নিজ হাতে গেট খুলিয়া দিলেন, তারপর নির্দেশ দিলেন, "এটি বন্ধ করে রাখো। আর দেখো, প্রসাদ পাওয়ার পর পাতা বা এক কণা

অন্নপ্রসাদ যেন বাইরে না যায়। সব জড়ো ক'রে রাখো বাড়ির ভেতরে ঐ কয়লার পাশে।"

আবার কহিলেন, "এ ব্যবস্থা দিনে রাতে সমানভাবে চলবে। আমি চলে গেলেও এভাবেই চলবে।"

মঠের সচ্ছলতা তেমন নাই বটে, কিন্তু অতিথি অভ্যাগতদের জন্য চিরদিনই অবারিত দ্বার। কিন্তু এবার এমন কি ঘটিল যাহার জন্য দরজা বন্ধ করা সম্পর্কে, প্রসাদের পাতা সম্পর্কে, বাবাজীর এত সতর্কতা? ভক্তেরা স্বভাবতই মহা কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছেন। যাই হোক, বাবাজীর নির্দেশে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চলিতে থাকে এবং কয়েকটি মাস এভাবে অতিবাহিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে আবার পূর্ব ব্যবস্থা ফিরিয়া আসে, গেট সবারই জন্য খুলিয়া রাখা হয়। প্রসাদের পাতাও ফেলিয়া দেওয়া হয় মঠের বাহিরে পূর্বেকার নির্দিষ্ট স্থানে।

ইতিমধ্যে প্রায় এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সেদিন অনেক রাত্রে বাবাজী মহারাজ হাওড়ায় অনুষ্ঠিত এক কীর্তন সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তখনো মঠের কাহারো প্রসাদ পাওয়া হয় নাই। বাবাজী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দোতলার ঘর হইতে নিচে নামিয়া আসিলেন। ব্যগ্রস্বরে এক ভক্তকে কহিলেন, "তাড়াতাড়ি একটা পাতায় কিছু অন্ন ডাল তরকারী মেখে নিয়ে এসো।"

আদেশ পালিত হইলে ভক্তটিকে নিয়া দ্রুতপদে তিনি মঠের বাহিরে আসিলেন, সম্মুখের রাস্তা দিয়া বেশ কিছুটা অগ্রসর হইয়া গেলেন। তারপর সম্মুখে দেখা গেল, একটি দীন দরিদ্রা রমণী রাস্তার ধারে অসাড় হইয়া শুইয়া আছে। বাবাজী ভক্তটিকে নির্দেশ দিলেন, "পাতাটি ওর সামনে রেখে দাও।"

একটু লক্ষ্য করিতেই সঙ্গী ভক্তটি চিনিতে পারিলেন মেয়েটিকে। এ সেই বৈরাগিণীর বেশধারিণী যুবতী, দিনের পর দিন যে বাবাজীর মঠের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আশ্রয় ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াও মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারে নাই। বুঝা গেল, এই যুবতী যাহাতে

মঠে কোনো ছলছুতায় প্রবেশাধিকার না পায়, সেজন্যই বাবাজীর সেদিন সতর্কতার অন্ত ছিল না।

যুবতীটি কঙ্কালসার হইয়া গিয়াছে, নিজে সে মুমূর্ষু, আর কোলের কাছে রহিয়াছে সদ্য মৃত এক শিশু।

করুণাঘন নয়নে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া, বাবাজী তাঁহার শিয়রে গিয়া দাঁড়াইলেন, জপ করিতে লগিলেন মহানাম।

রামদাস বাবাজী মহারাজ একবার স্থানীয় ভক্তদের আমন্ত্রণে বরিশালের ভোলা শহরে যান। অখণ্ড নামযজ্ঞ সারাদিন সেখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভোরবেলায় স্বগণসহ বাবাজী নিকটস্থ খালে স্নান করিতে গিয়াছেন, সেখানে, কয়েকটি উচ্ছৃঙ্খল ধরনের যুবকের সঙ্গে দেখা। একটি যুবক ইয়ারকির ঢঙে বলিয়া উঠে, "কি বাবাজীরা, আপনারা তো সব যুগল-উপাসক, আপনাদের যুগল সাধনা। তা সঙ্গের নেড়ীগুলো কোথায়?"

তার এই বিদ্রূপের আমোদ সঙ্গী যুবকেরা উপভোগ করে, উচ্চ রবে তাহারা হাসিতে থাকে।

বাবাজী মহারাজ নীরবে ডেঁপো ছেলেটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আছেন, প্রশান্ত বদনে ফুটিয়া উঠিয়াছে মৃদু হাস্যের রেখা।

কি জানি কি ভাবিয়া দুষ্ট যুবকের দল অতঃপর বাবাজী ও তাঁহার ভক্তদের আর বেশী ঘাঁটায় নাই, সেখান হইতে ধীরে ধীরে তাহারা সরিয়া পড়ে।

কয়েক মাস পরের কথা। বাবাজী মহারাজ তখন কলকাতায়। পবিত্র রথযাত্রা উৎসব আসন্ন, এ উপলক্ষে তিনি দলবল নিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন।

স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। এক বিরাট লোহার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে সেখানকার তরুণ মালিক উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "জয় নিতাই! ও বাবাজীমশায়, এদিকে আসুন।"

বাবাজী সদলে দোকানে গিয়া উঠেন, দেখেন, এ যে সেই বরিশাল ভোলার উদ্ধত যুবকটি। ফিটফাট বাবু, গদিতে বসিয়া এই দোকান চালাইতেছেন। তাড়াতাড়ি গদি হইতে নামিয়া যুবকটি কহিলেন, "বাবাজী মশাই, চিনতে পারেন আমায়? ভিক্ষায় বেরিয়েছেন? এই নিন্ কিছু ভিক্ষা।

একটি দশ টাকার নোট বাবাজীর হাতে দিয়া আবার ভক্তিভরে প্রশ্ন করিলেন, "এ বছর বরিশালের দিকে আর যাবেন না?"

"ঠাকুরের ইচ্ছে হলেই যাওয়া হবে।" উত্তর দেন বাবাজী মহারাজ। তারপর দলবল নিয়া আবার পথ চলিতে থাকেন।

বাবাজী মহারাজের চেলারা এ সময়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে থাকেন, ভোলা শহরের সে উদ্ধত যুবকটি কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। বাবাজী মহারাজের কৃপা-দৃষ্টিপাত হয়েছে, না জানি ইহার অদৃষ্টে কি পরিণতি লেখা রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। হুগলীর ঘুঁটেবাজারে রামদাস বাবাজী এক অখণ্ড নামযজ্ঞে যোগ দিতে আসিয়াছেন। তিন দিন পরে অনুষ্ঠান সাঙ্গ হইয়া গেল। সেদিন বিকেলবেলায় বাবাজী মহারাজ আহ্নিকে বসিয়াছেন, এ দিকে অঙ্গনে বহু লোকের ভিড়। প্রসাদ বিতরণের আয়োজন চলিতেছে। হঠাৎ আহ্নিকের আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া বাবাজী মহারাজ অন্দর মহলের দরজা দিয়া বাড়ির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হন, ধাবিত হন দ্রুতপদে। সঙ্গী কয়েকজন ভক্ত এ দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারাও করেন বাবাজীর অনুসরণ।

প্রত্যক্ষদর্শী কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর মহাশয় এদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা উজ্জীবন পত্রিকায়, 'সঙ্গে ও প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন:

গঙ্গার ধারে বড় রাস্তা। সেখানে গিয়ে বাবাজী মশায় থামলেন। অদূরে কতকগুলি বালক একটা গোলমালের সৃষ্টি করেছিল। বাবাজী মশায়কে দেখেই তাদের কতকগুলি সরে গেল এবং একটা লোক

চীৎকার করতে করতে ছুটে এল বাবাজী মশায়ের কাছে। সে ব্যাকুল স্বরে বলছে—বাবা! বাবা! এরা আমায় মারছে, এই দেখনা বাবা, আমার পিঠটা ফাটিয়ে দিয়েছে। এরা আমায় পাগল বলছে। বাবা, এদের তুমি মারো।'

বলেই, নিরাপদ আশ্রয়ের মতো বাবাজী মশায়ের সম্মুখে সে দাঁড়াল। আর সেই বালকদের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

লোকটির একমাথা উস্কখুস্ক চুল, গায়ে কিছুই নাই, পরনে একটা ছেঁড়া ভোট কম্বল, পা দুটি খালি। এক মুখ খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। বাবাজী মশায় পরম গম্ভীর। চোখ দুটিতে জলের ধারা।

—বাবাজী মশায়কে কিছু বলতে হলো না। ছেলের দল শান্ত হয়ে একে একে সরে পড়লো। বাবাজী মশায়ের ইঙ্গিতে সেই পাগলটি আমাদের সঙ্গে এল। তাকে প্রথমে প্রসাদ পাওয়ানো হলো। তারপর তাকে যখন গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে মুখ মাথা কামিয়ে স্নান করিয়ে আনা হলো, তখন সকলে সবিস্ময়ে চিনলেন, ইনিই বরিশালের সেই উদ্ধত যুবক, হরেন, কলকাতার ধনী লৌহ ব্যবসায়ী। উঃ কি বিচিত্র তার পরিণাম।

—শ্রীগুরুদেব সেইদিনই তাঁকে আর এক 'পাগল' আমাদের পরম-গুরুদেবের নবদ্বীপের আশ্রমে, প্রখ্যাত সমাজবাটীতে পাঠিয়ে দিলেন। ক'দিন পরেই বাবাজীমশায় ঐ শ্রীধামে গেলেন, তখন তাঁকে দীক্ষা দেওয়া হলো। প্রায় মাসখানেক পরেই নন্দকাকা তাঁকে ভেক (বেশাশ্রয়) দিলেন, নাম হলো, হরিদাস।

—ইনি নিত্য করতাল বাজিয়ে শ্রীনবদ্বীপে ভিক্ষা করতেন। প্রায় এক বৎসর নবদ্বীপে থাকার পর শ্রীবৃন্দাবনে যান। সেখানে গিয়ে দিনান্তে একবার মাধুকরী, রুখা-শুখা রুটি ভিক্ষা ক'রে জীবনযাপন করতেন। আর সর্বদা নামকীর্তন করতেন, তাঁর চোখ মুখে সব সময় অশ্রুর প্লাবন বয়ে যেতো। বেশ কয়েক বছর ব্রজে কাটিয়ে সেখানেই দেহরক্ষা করেন।

বৈরাগ্যে ও অনুরাগে, ত্যাগ দৈন্যে ও সিদ্ধির প্রদীপ্ত প্রভায়, কারুণ্যে ও বীর্যে, পূর্ণ ছিল বাবাজী মহারাজের বৈষ্ণবীয় মহাজীবন। প্রভু জগদ্বন্ধু ও শক্তিধর সিদ্ধ বৈষ্ণব চরণদাস বাবাজীর কৃপায় যে সাধনবীজ তাঁহার জীবন-আধারে উপজিত হইয়াছিল, উত্তরকালে তাহা হইয়া উঠিয়াছিল পুষ্পিত ও ফলিত। শত শত ভক্ত সাধকের আলোক-দিশারীরূপে রামদাস বাবাজী অধিকার করিয়াছিলেন এক অনন্যসাধারণ ধর্মনেতার স্থান।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বৈচিত্র্যময় পরম মধুর মরজীবনের উপর নামিয়া আসে চিরবিরতির যবনিকা। আপ্তকাম মহাপুরুষ নিতাই-গৌরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রয়াণ করেন তাঁহার বহু-আকাঙ্ক্ষিত অপ্রাকৃত ব্রজধামে।